২৪ জানুয়ারি ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

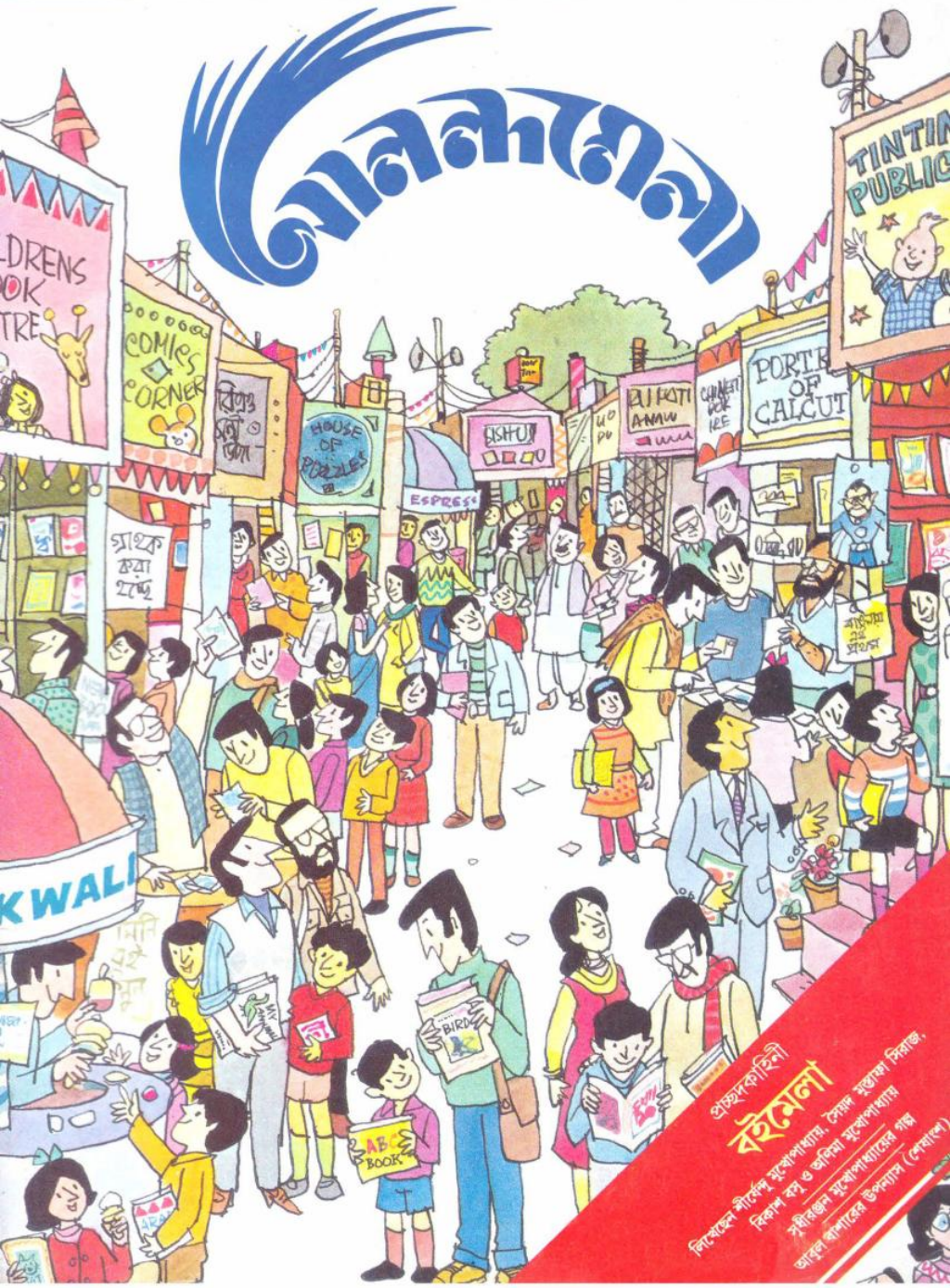

প্রচ্ছদকাহিনী
বইমেলা
লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,
বিকাশ বসু ও অণিমা মুখোপাধ্যায়

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গল্প

আবুল বাশারের উপন্যাস (শেষাংশ)

আপনার রঙরূপের বয়েস কি আপনার আসল বয়েসের চেয়েও বেশী দেখাচ্ছে?

আপনার রঙরূপের জৌলুষ কাল কেমন থাকবে, তা নির্ভর করে, আজ আপনি তার কিভাবে দেখাশোনা করছেন, তার ওপর। কারণ, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে ত্বকের আর্দ্রতা কমে যেতে থাকে—তাই, দরকার, জনসন্স বেবী লোশন-এর ময়েশ্চারাইজিং-এর গুণ। এ পাবেন আপনার বেছে নেওয়ার মত দুটি ফর্মুলেশনে—লোশনটি ত্বকের গভীরে ঢুকে কাজ করে, আর এর বিশেষ ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বকে পুষ্টি যোগায়—আর, আপনার ত্বক অপূর্ব কোমল ও তরতাজা ক'রে রাখে, ফলে আপনার রঙরূপেও যেন চির-বসন্তের ছোঁওয়া লাগে!

রেগুলার
শুষ্ক ত্বকের জন্যে এক বিশেষ ময়েশ্চারাইজারযুক্ত উপাদানের মিশ্রণ

লো অয়েল
তেলতেলে ত্বকের জন্যে হাল্কা, সূক্ষ্ম ফর্মুলা

জনসন্স বেবী লোশন

কারণ, নরম ও মোলায়েম ত্বক আপনার বয়স গোপন রাখে।

জনসন্স অ্যান্ড জনসন

OBM/4573 BEN

এল এইবেলা মজার নতুন খেলা...

ফ্রিসবী

বিনামূল্যে

ফ্রিসবী !
প্রতি ৫০০ গ্রামের চকলেট
কমপ্লান টিনের সঙ্গে

কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

নীল, সবুজ, হলদে,
লালে,চমৎকার সব রঙে
ফ্রিসবী মেলে। বন্‌বন্
বেগে, শন্‌শন্ ছোঁড়ো
কমপ্লান ফ্লাইং ফ্রিস্‌বী।
বর্তমানে নির্ধারিত
বাজারগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে।

GL/13C/224BEN

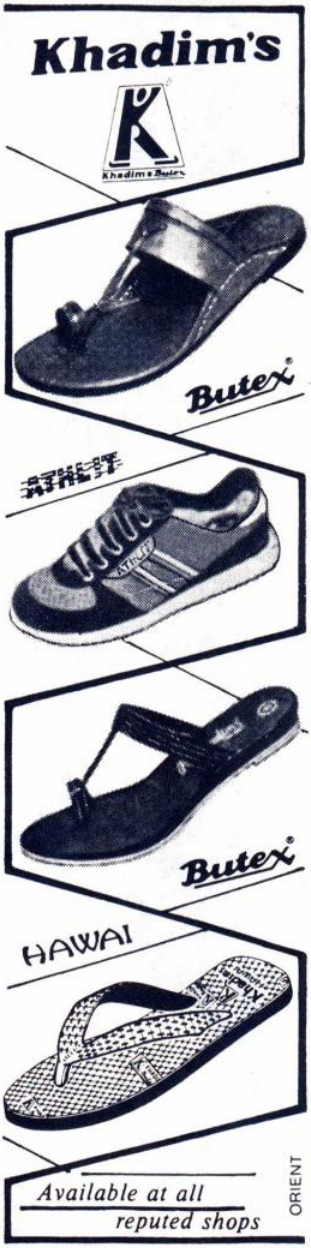

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
হালুম হলেই বাঘ হয় না আবুল বাশার ৭৭

গল্প
রুমুর কান্না সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩২
হারিয়ে যাওয়া অনীশ দেব ৬০

প্রচ্ছদকাহিনী
বইমেলা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৪
বইমেলা মানে পিকনিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৬
বইয়ের কথা বিকাশ বসু ১৮
বিখ্যাত বইয়ের উৎস···২১
ছাপা বইয়ের আগে অণিমা মুখোপাধ্যায় ২৫

ধারাবাহিক উপন্যাস
উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৯১
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ২৮

কমিক্স
টারজান ৩১, **রোভার্সের রয়** ৫৭, **গাবলু** ৬৯, **টিনটিন** ৮৭, **ব্যাটম্যান** ৮৯

কবিতা
বইমেলা, মেলা বই সাধনা মুখোপাধ্যায় ৭
বই-চোর ভূত রতনতনু ঘাটী ৭

বিজ্ঞান : গবেষণা
চরম বুদ্ধির বিকাশ···সুনির্মল রায় ১২

কেরিয়ার গাইড
স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষা অমর দাশ ৫৩

বিদ্যালয়-পরিচিতি
সেন্ট টমাস' গার্লস স্কুল গৌতম ঘোষদস্তিদার ৭৪

ভ্রমণ
অপরূপা মাণ্ডু কবিতা রায় ৭০

খেলাধুলো
শেষ পর্যায়ে বিশ্বকাপ তরুণ রায় ৪০
ইতালির এক ডজন স্টেডিয়ামে···অরুণাভ গুপ্ত ৪১
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪২
নতুন তারকা এখন এমেকা কিশোর রায় ৪৪
খেলার খবর ৪৫
এক প্রবীণকে ঘিরে···সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৪৬
লক্ষ্যে স্থির ভারতীয় তীরন্দাজরা শ্যামল রায় ৪৭
বিবেক রাজদান ৪৯, সঞ্জয় মজুরেকর ৫০

নিয়মিত বিভাগ
চিঠিচাপাটি ৬, **কুইজ** ৮, **বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে** ১১, **অনুষ্ঠান** ৩৪, **আকাশ চেনো** ৩৮, **কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস** ৪৮, **বাইরের জানালা** ৫২, **ডাকটিকিট** ৫৪, **নিজের হাতে বানাও** ৫৬, **চেনা না-চেনা** ৫৯, **আকাশে ওড়ার কথা** ৬৭, **শব্দসন্ধান** ৮৫, **কে প্রথম.** ৯২, **বিশ্ববিচিত্রা** ৯৫, **নানারকম** ৯৬, **বইয়ের খবর** ৯৮

প্রচ্ছদ
দেবাশিস দেব

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

৭০

মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে বিন্ধ্যাচলের শেষ ভাগে মাণ্ডু। মাণ্ডুর অপরূপ প্রকৃতি ও স্মৃতিসৌধগুলির কথা লেখা হয়েছে এবারের ভ্রমণকাহিনীতে। জামা মসজিদ, আশরফি মহল,

১৪

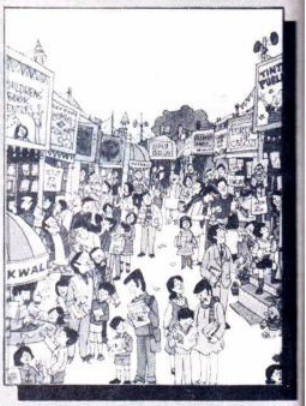

বইয়ের মেলা বইমেলা। হরেক মেলার মধ্যে এই মেলাও যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। কবে বইমেলা বসবে, তার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে সব বয়সের মানুষ। বিশেষ করে শিশু ও কিশোররা। মেলার একটি প্রাঙ্গণেই দেশ-বিদেশের এমন সব বই সংগ্রহ করা যায়, যা আর কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে বইমেলা সম্পর্কে নিজেদের চিন্তাভাবনার কথা লিখেছেন প্রখ্যাত দুই লেখক। কীভাবে প্রথমে বই তৈরি হয়েছিল, 'ইনকুনাবলা' কী—এ ধরনের নানা বিষয় নিয়েও আছে একটি লেখা। আছে বই নিয়ে নানা গল্প।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

রূপমতী মহল, নীলকণ্ঠ মন্দির, হিন্দোল মহল—এ সবই ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। বাজবাহাদুরের প্রাসাদে গেলে দেখা যাবে আফগান স্থাপত্যের সূক্ষ্ম নমুনা। মাণ্ডুতে আছে এরকম আরও অনেক দ্রষ্টব্যস্থান।

১২

মানব মস্তিষ্ক কীভাবে বোঝে, শোনে, মনে রাখে, শেখে, জীবনধারা পরিচালনা করে এবং পরিবেশজাত তথ্যাদির সমন্বয়সাধন করে মূল লক্ষ্যে পৌঁছয়, তা ভালভাবে জানতে পারলে কম্পিউটারে সেই বোধ প্রোগ্রামের সাহায্যে তৈরি করা যায়। এই নিয়ে আছে নিবন্ধ।

৩২

আমেরিকায় বসে রুমু ভেবেছে, দেশে ফিরে রাধির মুখে সে হাসি ফুটিয়ে তুলবে। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গল্প।

৪৪

নাইজিরিয়ার তরুণ ফুটবলারটির নাম এমেকা এজুগো। কলকাতার মাঠে বছর-কয়েক আগে আবির্ভাবের সময় যতটা না হইচই ফেলেছিলেন, তার চেয়েও বেশি সাড়া জাগিয়েছেন পুনরাবির্ভাবে। এমনকী, বুদ্ধিদীপ্ত খেলার চমকে এমেকা হয়তো চিমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

আগামী সংখ্যায়

সুভাষ চক্রবর্তীর প্রচ্ছদকাহিনী

সুপারহিরো ব্যাটম্যান

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ

হিমানীশ গোস্বামীর গল্প

শিবতোষ ঘোষের সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

সাধুচরণের বাগাল

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

Disproportionate Returns for SMALL INVESTMENTS
&
What more &
Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:
1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?
ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT
in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

জাপান থেকে কানাডা যেতে হলে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে

আনন্দমেলা ১৫ নভেম্বর সংখ্যায় শ্যামসুন্দর বসুর 'ভূর্ভটক রামনাথ বিশ্বাস' লেখাটি পড়লাম। তিনি লিখেছেন, 'সীমান্ত শহর আন্ডুং হয়ে কোরিয়ায় ঢুকে পড়লেন। তারপর জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাপান পৌঁছলেন। জাপান পরিক্রমা শেষ করে অতলান্তিক পেরিয়ে আমেরিকা যেতে চাইলেন।' কোরিয়া, জাপান ও কানাডার মানচিত্র লক্ষ করলে দেখা যাবে যে কোরিয়া থেকে জাপান যেতে হলে, কোরিয়া প্রণালী বা জাপান সাগর বা পীত সাগর পাড়ি দিয়ে জাপান যেতে হবে। কোরিয়া থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাপান যাওয়া যায় না। আবার জাপান থেকে কানাডা যেতে হলে অতলান্তিক মহাসাগর নয়, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে।

শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস
গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-৩১

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

লেখকের উত্তর : কোরিয়া থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাপানে যাওয়া যায় না—কথাটি ঠিক নয়। আপনি শুধু জাপানের পশ্চিম দিকটাই দেখলেন! জাপানের পূর্ব দিকটার কথা ভেবে দেখুন। বাস্তবে রামনাথের যাত্রাপথ ছিল এরকম—কোরিয়ার পুসান থেকে কোরিয়া প্রণালী অতিক্রম করে সোজা পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ প্রবেশ করে। ওখান থেকে ওই প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে ইয়োকোহামার পাশে কোবে বন্দরে অবতরণ করেন।
তবে জাপান থেকে কানাডা পাড়ি দিতে হলে অতলান্তিক নয়, প্রশান্ত মহাসাগরই পাড়ি দিতে হবে। আসলে, পরবর্তী সফল কানাডা তথা আমেরিকা যাত্রায় আফ্রিকার কেপটাউন থেকে অতলান্তিক পাড়ি দিয়েছিলেন রামনাথ। আমার লেখায় ভুলবশত অতলান্তিক হয়ে গেছে।

প্রথম সংখ্যার মলাট কেমন ছিল

আমরা প্রথম সংখ্যা থেকেই 'আনন্দমেলা' পড়ে আসছি। এ-পর্যন্ত অনেক আকর্ষক বিষয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি বিষয়ে লেখা প্রকাশের জন্য প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। যেমন—বেতার, কাগজ ছাপার কলাকৌশল, ভাবতের বিস্তীর্ণ সমুদ্রতট, জাহাজ, বন্দর, পৃথিবীর বিমান বন্দর, মানুষের স্নায়ুতন্ত্র। যদিও মানুষের স্নায়ুতন্ত্র বিষয়টি খুবই জটিল, তা হলেও-এর আগে মানুষের মস্তিষ্ক, জোনাকিগাছ, মানুষের প্রতিরূপ, জিন ইত্যাদি জটিলতর বিষয়কে যথাসম্ভব সহজ করে আপনারা প্রকাশ করেছেন। তাই আপনাদের কাছেই এই স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে লেখাটির জন্যে অনুরোধ রাখা যায়। এ ছাড়া যদি সম্ভব হয় 'আনন্দমেলা'র প্রথম সংখ্যাটির একটি ছবি ছাপুন। প্রথম সংখ্যার মলাট কেমন ছিল ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে।

দেবজিৎ সেনগুপ্ত
কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

আনন্দমেলা : প্রথম সংখ্যার মলাট

বেশির ভাগ লেখাই ভাল লাগে

আমার 'আনন্দমেলা' খুব ভাল লাগে। ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় অমর দাশের লেখা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে হলে পড়ে খুবই খুশি হলাম। আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ বি· এড·সংক্রান্ত একটি পরামর্শ যদি 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগে প্রকাশ করেন, খুব ভাল হয়।

রাজকুমার সরকার
মোক, ধানবাদ

'আনন্দমেলা' ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'এপকট সেন্টার' খুব ভাল লাগল। এই সঙ্গে যে ছবিগুলি ছাপা হয়েছে সেগুলিও সুন্দর। ভাল লাগল 'গ্যালারি থেকে' বিভাগে 'মায়ের স্নেহে ভরা' এই ছোট্ট লেখাটি। এ ছাড়া 'বিজ্ঞানে নোবেল : ১৯৮৯' এবং চিত্রা দেবের লেখা ইতিহাসের গল্প 'দেবপুত্র কণিষ্কের কথা' পড়ে সম্রাট কণিষ্কের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম।

সমিত ঘোষ
বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর

অনেকদিন থেকেই 'আনন্দমেলা' পড়ে আসছি। অন্য কিশোর পত্রিকাগুলির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। এখন খেলার খবর, কেরিয়ার গাইড, হাতে-কলমে বিভাগগুলি খুব ভাল হচ্ছে। এর থেকে ছোটরা অনেক শিখতে পারে ও জানতে পারে।

চিত্রা সেনগুপ্ত
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

জোনাকিগাছ তৈরি হয়েছে একাধিক বিজ্ঞানীর চেষ্টায়

নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি, খুব ভাল লাগে। ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'এপকট সেন্টার' ও 'জোনাকিগাছে'র কথা আমার খুব ভাল লেগেছে। কল্যাণকুমার দে'র 'জোনাকিগাছ' পড়ে নতুন অনেক কথা জানতে পারলাম। কিন্তু এই গাছটির আবিষ্কর্তার নাম এবং কোন দেশে এটি তৈরি করা হয়েছে—জানতে পারলাম না। যদি সম্ভব হয় তা হলে এর উত্তর জানাবেন।

শুভব্রত ভক্ত
অষ্টম শ্রেণী, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাতা-৩২
অরুণেন্দ্র চক্রবর্তী
অষ্টম শ্রেণী, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, কলকাতা-১৯

লেখকের উত্তর : 'জোনাকিগাছ' কোনও একজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার নয়। একাধিক বিজ্ঞানীর যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এই জোনাকিগাছ। যেসব বিজ্ঞানীর এই কাজে মুখ্য ভূমিকা ছিল, তাঁরা হলেন—D. W. OW, J. R. de Wet, D. R. Helinski, S. H. Howell, K. V. Wood এবং M. Deluca. এঁরা প্রত্যেকেই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত।

বইমেলা মেলা বই

সাধনা মুখোপাধ্যায়

বইমেলা মেলা বই আছে রকমারি
আসছে টেম্পো ভরে রাখা ঝকমারি
এই তাকে বিজ্ঞান ও-তাকে ভ্রমণ
সবাই উলটে দেখে দিয়ে খুব মন
কোথাও ডিটেকটিভ কোথাও কমিকস
বুলটু পড়ছে স্কুলে হল ক্লাস সিক্স
ভাল লাগে টিনটিন আর ব্যাটম্যান
মহাকাশে তারাদেরও আছে তার জ্ঞান
উলটে-পালটে দেখে পত্রিকা নানা
দেশ-বিদেশের কথা আছে তার জানা
টুম্পার ভাল লাগে সেলাই ফোঁড়াই
রঙদার ছবি দেওয়া নকশাটা চাই
বিদেশী কাগজগুলো রঙিন রঙিন
টুম্পার কেটে যায় তাই দেখে দিন
ভুল্লু ডিটেকটিভে মেটায় যে ক্ষুধা
ওর প্রিয় নায়কেরা তোপসে ফেলুদা
শুধু তো ছোটরা নয় বড়রা আসেন
কিনতে পড়তে বই ভালই বাসেন
তাঁদেরই তো হাত ধরে আসছে মেলায়
দুপুরে বিকেলে আর সন্ধ্যাবেলায়
হলুদ সবুজ জামা ছোট ছেলেমেয়ে
খুশি মনে বাড়ি ফেরে বই হাতে পেয়ে
বইমেলা মেলা বই বাছা মুশকিল
রাশি রাশি বই আর ছবির মিছিল
মনে হয় এটা কিনি মনে হয় ওটা
কিনে নিলে ভাল হত মেলাই পুরোটা
তার থেকে বেছে বেছে কয়েকটা কেনা
এ যেন সাগর থেকে ছেঁকে তোলা ফেনা
বুলটু টুম্পা আর ভুল্লুরা ভাবে
কখন মেলার বই সব কেনা যাবে।

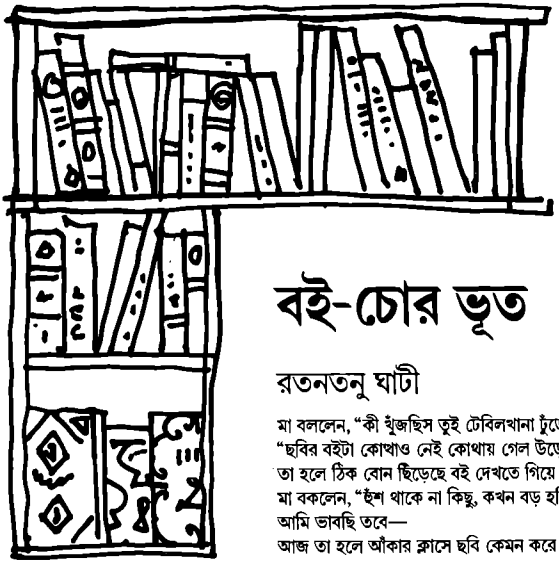

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বই-চোর ভূত

রতনতনু ঘাটী

মা বললেন, "কী খুঁজছিস তুই টেবিলখানা চুঁড়ে ?"
"ছবির বইটা কোথাও নেই কোথায় গেল উড়ে ?
তা হলে ঠিক বোন ছিঁড়েছে বই দেখতে গিয়ে ছবি—"
মা বকলেন, "হুঁশ থাকে না কিছু, কখন বড় হবি ?"
আমি ভাবছি তবে—
আজ তা হলে আঁকার ক্লাসে ছবি কেমন করে হবে !

সেদিন হঠাৎ অঙ্ক-বইটা হারিয়ে গেল স্কুলে
মিস বললেন, "সারা ক্লাসটাই দাঁড়িয়ে থাকো টুলে।"
আমার সঙ্গে বই-চোর ভূত করছে মজা বুঝি
তবুও কেবল এতোলবেতোল ব্যাগটা শুধু খুঁজি।
যদি কোথাও থাকে—
নাই যদি পাই ভূতের কথাই বলব গিয়ে মাকে।

বাড়িতে ফিরেই মাকে বললাম, "মজার কথা জানো,
বই-চোর ভূত নামের একটা ভূত আছে কি মানো ?"
মা ও বাবা যেই হাসলেন শুনে হাসল দিদি খুব
মনে হল অতল দিঘির জলে এক্ষুনি দিই ডুব।
এতে হাসির কী যে—
বইগুলো তো হচ্ছে চুরি ঠিক বুঝতে পারি নিজে।

সেদিন দেখি বইয়ের টেবিল গোছানো হয়ে আছে
অঙ্ক-বইটা ঘুমিয়ে একা ছবির বই কাছে।
মাকে বললাম, "এক্ষুনি এই পড়ার ঘরে এসো,
বই-চোর ভূত আছে কিনা দেখে তখন তুমি হেসো !"
মা বললেন, "কই,
এই টেবিলেই খাতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বই।"

কিন্তু আমার সন্দেহ হয় এরম কার কাজ ?
বইয়ের মেলায় গিয়ে আমার ইচ্ছে হল আজ
সবাই যে-যার বই কিনে নিক মেলাটা হোক ফাঁকা
আমি একা সমস্ত বই নিয়ে ভর্তি করি ঝাঁকা !
কতরকম বই—
দোষটা কী হয় বই-চোর ভূত তখন যদি হই।

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গীত

যে সব মহৎ সঙ্গীত সমস্ত পৃথিবীর মানুষের প্রতিবাদী চেতনায় সাড়া জাগিয়েছে, কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল 'উই শ্যাল ওভারকাম'। উই শ্যাল ওভারকাম গানটি শুরু হয়েছিল ধর্মীয় সঙ্গীত এবং সমবেত ঐকতান হিসেবে। পরবর্তীকালে চারজন গীতিকার একে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার অর্জনের গণসঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন। সঙ্গীতের সূরটি সম্ভবত ১৭৯৪ সালের প্রার্থনাসঙ্গীত 'ও স্যাক্টিসিমা' বা 'সিসিলিয়ান নাবিকদের প্রার্থনা' থেকে নেওয়া হয়েছে, যদিও গানের কিছু অংশ অপেক্ষাকৃতভাবে আধুনিক। 'আই শ্যাল ওভারকাম সামডে' শব্দগুলি প্রথম দেখা যায় মিঃ অ্যালবার্ট টিওলে এবং যাদক এ· আর· শকলাই রচিত 'নতুন সুসমাচার-সঙ্গীত' (১৯০০)-এর এক প্রার্থনার গানে। সুরটা কিন্তু আদৌ আজকের মতো ছিল না। ১৯৪৫ সালে এইসব শব্দ এবং সুর একত্রিত হল 'আই শ্যাল ওভারকাম সামডে গানে। গানের অবশিষ্ট শব্দগুলি লিখেছিলেন আট্রিন টুইগ, কেনেথ মরিস সঙ্গীতের সুরটি পরিমার্জনা করে নতুনভাবে তৈরি করেন। শিকাগোর জনৈক সুসমাচার-গায়ক রবার্টা মার্টিন গানটির আর-একটি অনুবাদ করেন। এই গানের শেষ বারোটি মাত্রা বর্তমান উই শ্যাল ওভারকাম সামডে গানের অংশ।

টেনেসি রাজ্যের মন্টিগল-এ 'হাইল্যাণ্ডার ফোক স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠাতার পত্নী জিলফিয়া হর্টন এই গানটি প্রথম শুনেছিলেন ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে। একটি গল্পে বলা হয়, এক শীতের সকালে জিলফিয়া দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাজ্যের চার্লসটন শহরের শিল্প সংগঠন কংগ্রেসের খাদ্য ও তামাক বিভাগের ধর্মঘটরত কর্মচারীদের পিকেটিং-এ অংশ নেন এবং তখনই তিনি এই গানটি শোনেন। আর-একটি গল্প থেকে জানা যায়, পিকেটিংরত দুই ধর্মঘটী শ্রমিক জিলফিয়ার স্কুলের একটি শ্রমিক শিক্ষাপ্রকল্পে এসে তাঁকে ওই গানটি গেয়ে শোনান। যে ঘটনাটিই সত্যি হোক না কেন, আমরা জানি জিলফিয়া গানটি শুনেছিলেন এবং একে একটি সমবেত সঙ্গীতে পরিণত করেছিলেন। পরে তিনি এই গানটি বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী পিট সিগারকে শেখান। তিনি নিজেও রাজ্যের উত্তরাংশে এই গানটি গেয়ে শোনান, এবং গানে আরও পঙক্তি যোগ করেন ('উই উইল ওয়াক হ্যাণ্ড ইন হ্যাণ্ড' এইসব পঙক্তিগুলির মধ্যে একটি)। গানটিকে জনপ্রিয় করেন গণসঙ্গীত গায়ক ফ্রাঙ্ক হ্যামিল্টন। যে সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র 'শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য' লেখা রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে এই গানটি শোনান শ্বেতাঙ্গ গণসঙ্গীত গায়ক গ্য কারাভন।

জো গ্রেজার এবং এল্ম সিটি ফোর দল এই গানটি প্রথম রেকর্ড করে ১৯৫০ সালে। রেকর্ডটি বের হয় শিল্প সংগঠন কংগ্রেসের শিক্ষা ও গবেষণা দফতর থেকে। ১৯৬০ সালে গানটি প্রকাশিত হওয়ার পর চারজন গীতিকারই গানটিকে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধিকার অর্জন আন্দোলনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ঠিক হয়, রেকর্ড বিক্রির যাবতীয় লভ্যাংশ আন্দোলনে দান করা হবে। গানের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুবাদটির স্বত্ব রয়েছে হর্টন, হ্যামিল্টন, কারাভন এবং সিগারের নামে।

'উই শ্যাল ওভারকাম কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গান। মানুষ এর শক্তিশালী, সম্মোহক সুরকে তীব্র আবেগের সঙ্গে গাইত। একজন গানটির নেতৃত্ব দিত, আর অন্যরা একে অন্যের হাত ধরে ক্রমান্বয়ে একবার এগোত, একবার পিছিয়ে যেত, গানের অনুচ্ছেদগুলির পুনরাবৃত্তি করত।

জুনিয়ার মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন, এই গান স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্য এনে দিয়েছে। ১৯৬৫ সালে, আলাবামাতে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মী, শ্বেতাঙ্গিনী শ্রীমতী ভায়োলা লুৎসিওকে খুন করা হয়। মরতে মরতে ভায়োলা গাইছিলেন, উই শ্যাল ওভারকাম। ১৯৬৫ সালের ১ এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকায় যোহান্সবার্গ-এর জেলখানায় ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জন হ্যারিসও এই গানটি গেয়েছিলেন। তারপর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই গানটি গাইতে দেওয়া হয় না।

এই গান বাংলায় গেয়েছেন কলকাতার ধর্মঘটী শ্রমিকরা, চিনা ভাষায় গেয়েছেন তিয়েনানমেন স্কোয়ারের ছাত্ররা, ফরাসিতে গেয়েছেন পরমাণু যুদ্ধবিরোধী নাগরিকরা। এই মহৎ সঙ্গীতের মাধ্যমে সবাই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

ওরা গায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার গান

কুইজ

প্রশ্ন

(১) পৃথিবীতে কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশি সাইকেল চলে ? **সুজাতা সাঁই,** বারাসত ।
(২) চার্লি চ্যাপলিন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মার্ক টোয়েন ও টমাস আলভা এডিসন—এঁদের মধ্যে মিল কোথায় ? **সেখ আব্বাস আলি,**বর্ধমান ।
(৩) 'চায়নাম্যান' কী ধরনের বল ? **সঞ্জয় ও কেকা মালাকার,** পলাশি ।
(৪) পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নাম কী ? **রানা বসু,** জুলিয়েন ডে স্কুল ।
(৫) স্তালিনের গোপন পুলিশ-বাহিনীর নাম কী ? **সেখ আবদুর রব,**বর্ধমান ।
(৬) ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম ফুটবল-ক্লাব কোন্‌টি ? **কৌশিক সিংহ,** কান্দি ।
(৭) রাশিয়ার মুদ্রার নাম কী ? **পার্থপ্রতিম পাল,** কলকাতা-৬ ।
(৮) ইয়ার মুলকো কী ? **উজ্জ্বলকান্তি গুহ,** জলপাইগুড়ি ।
(৯) নামগিয়াল ওয়াংডি কী নামে জগদ্বিখ্যাত ? ডোডো **দাশগুপ্ত,** কলকাতা-১৪ ।
(১০) CH_3COOH এটি কোন যৌগের সঙ্কেত ? **শুভজিৎ মুখার্জি,** কলকাতা-৪৫ ।

(১১) এ-বছর স্মিতা পাটিল পুরস্কার কাকে দেওয়া হয়েছে ? **মানবেন্দ্র কুণ্ডু,** নদীয়া ।
(১২) বেগমপেট বিমানবন্দর কোথায় অবস্থিত ? **পার্থসারথি ঘোষ,** কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয় ।
(১৩) কে শকুনিকে বধ করেছিলেন ? **তন্ময় দত্ত,** বালুরঘাট ।
(১৪) প্রথম বিশ্বকাপ হকি কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ? **সেখ মনিরুল আলম,**রসুলপুর ।
(১৫) কোন্ বাঙালি সাহিত্যিক প্রথম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান ? **অনীককুমার সাঁই,** বর্ধমান ।
(১৬) কোন্ গ্রন্থ সবচেয়ে বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ? **সৃজন বসু,** কলকাতা-২৭
(১৭) এনা কী ? **মিতা দে,** চেতলা ।
(১৮)'পথের পাঁচালী'কোথায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ? **অর্ণব মুখোপাধ্যায়,** কান্দি রাজ কলেজ ।

(১৯) কোন্ ভারতীয় প্রথম লেনিন শান্তি পুরস্কার পান ? **শোভনা রায়চৌধুরী,** আসানসোল ।
(২০) পুরুষদের ৩০০০ মিঃ দৌড়ের বিশ্বরেকর্ডটি কার ? **সৌমেন দাস,** বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ, মেদিনীপুর ।
(২১) সোমালিয়ার রাজধানীর নাম কী ? **শতানীক সরকার,** দেবপাড়া চা বাগান ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) স্টেরয়েড গ্রুপ ।
(২) নিউজিল্যান্ড ।
(৩) জাহাঙ্গিরনগর ।
(৪) ১৯৬১ সালে ।
(৫) গ্ল্যামারগন ।
(৬) মাইকেল জ্যাকসনের ।
(৭) Computer Aided Design.
(৮) জামাইকা ।
(৯) Commander-in-Chief.
(১০) রুড গুলিট (হল্যান্ড) ।
(১১) পূর্ব সাগর ।
(১২) কাশ্মির ।
(১৩) বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ।
(১৪) ইংল্যান্ডের কলিন কাউড্রে ও পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ ।
(১৫) ইংল্যান্ডের বব টেলর ।
(১৬) মহাশ্বেতা দেবী ।
(১৭) ষাঁড়ের লড়াই ।
(১৮) ডন কিং ।
(১৯) DZONGKHA.
(২০) খুশবন্ত সিংহ ।
(২১) তাইল্যান্ড ।

কাজী নজরুল ইসলাম

মাইকেল জ্যাকসন

রুড গুলিট

জাভেদ মিয়াঁদাদ

খুশবন্ত সিংহ

কুইজ

বিষয় : শ্রীলঙ্কা

(১) শ্রীলঙ্কার প্রধান দুটি ভাষা কী কী ?

(২) দন্তমন্দির কোথায় অবস্থিত ?

(৩) কলম্বো এই দ্বীপের সর্বপ্রধান বন্দর । দ্বিতীয় প্রধান বন্দর কোনটি ?

(৪) কোন ভারতীয় রাজা সমগ্র দক্ষিণ ভারত জয় করে শ্রীলঙ্কার উত্তর-মধ্যাঞ্চলেও তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন ?

আকাশ থেকে কলম্বো

(৫) শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের পৃথিবীজোড়া খ্যাতির কারণ কী ?

(৬) স্বাধীন শ্রীলঙ্কার প্রথম প্রধান মন্ত্রীর নাম কী ?

(৭) শ্রীলঙ্কায় কোন প্রকার বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করা হয় ?

(৮) এই দ্বীপের মূল্যবান রত্নসামগ্রীর উৎস কোন শহর ?

(৯) অশোকের কোন্ পুত্র এবং কন্যা শ্রীলঙ্কার রাজসভায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন ?

(১০) 'স্ট্রিং-হপার' দিয়ে শ্রীলঙ্কায় কী করা হয় ?

(১১) কার ডাকনাম দেওয়া হয়েছে 'সোর্ড' (তরবারি) ?

(১২) শ্রীলঙ্কার কোন্ প্রধানমন্ত্রী আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন ?

(১৩) কোন্ ইউরোপীয় দেশের সরকারের ধাঁচে শ্রীলঙ্কার সংবিধান রচনা করা হয়েছে ?

(১৪) এস-এল-এফ-পি-র সম্পূর্ণ নাম কী ?

(১৫) শ্রীলঙ্কার জাতীয় পতাকায় কোন গাছের পাতা দেখতে পাওয়া যায় ?

(১৬) শ্রীলঙ্কার প্রধান শস্য কী ?

(১৭) সরকারিভাবে স্বীকৃত টেস্ট ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার প্রথম অধিনায়ক কে ?

(১৮) রাবণের লঙ্কার রাজধানী কে নির্মাণ করেছিলেন ?

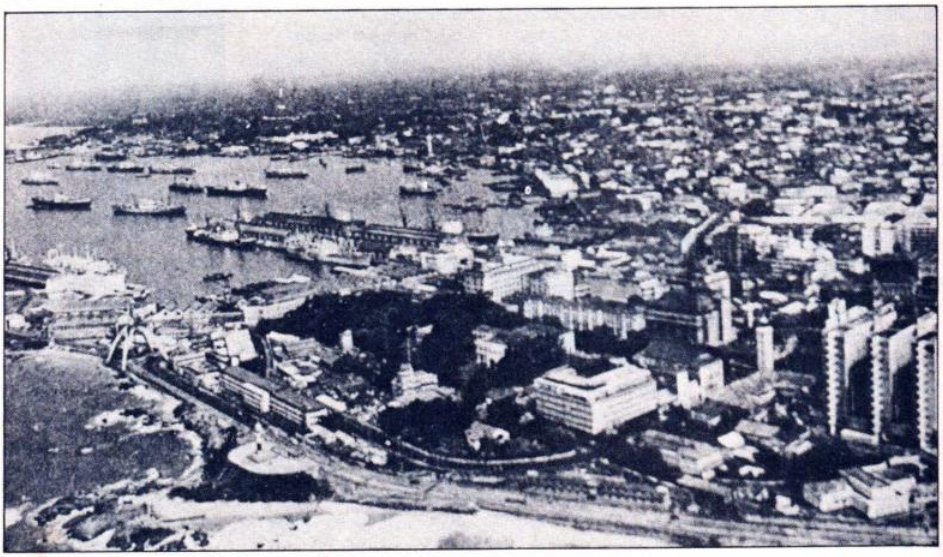

(১৯) শ্রীলঙ্কার একটি বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গের নাম 'আদমেরশিখর'। এই নামের কারণ কী ?

সিরিমাভো বন্দরনায়েকে

উত্তর : (১) সিংহলী ও তামিল।(২) কাণ্ডি । এখানে বুদ্ধদেবের একটি দাঁতের পবিত্র অবশেষ সংরক্ষিত আছে । (৩) ত্রিঙ্কোমালি । (৪) চোল রাজবংশের মহান রাজারাজ চোল । (৫) ১৯৬০ সালে তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন । (৬) ডন স্টিফেন সেনানায়কে । (৭) হীনযান । (৮) রত্নপুরা । এই নামটির অর্থই হল রত্নের শহর । (৯) মহেন্দ্র (পুত্র) এবং সংঘমিত্রা (কন্যা) । (১০) খাওয়া হয় । ময়দা দিয়ে তৈরি লম্বা সেমুই জাতীয় খাদ্য । অনেকটা চাউমিনের মতো । (১১) এস-ডব্লু-আর-ডি বন্দরনায়েকে । শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী এবং সিরিমাভো বন্দরনায়েকের স্বামী, (১২) এস- ডি ডব্লু- আর-ডি- বন্দরনায়েকে । (১৩) ফ্রান্স । (১৪) শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি । (১৫) বো গাছ । (১৬) চাল । (১৭) বন্দালা ওয়ারনাপুরা । (১৮) বিশ্বকর্মা । (১৯) লৌকিক বিশ্বাস, স্বর্গোদ্যান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর আদম এই পর্বতশিখরে দুশো বছর ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন ।

কম্পিউটার গ্রাফিক্সে নতুন দিগন্ত

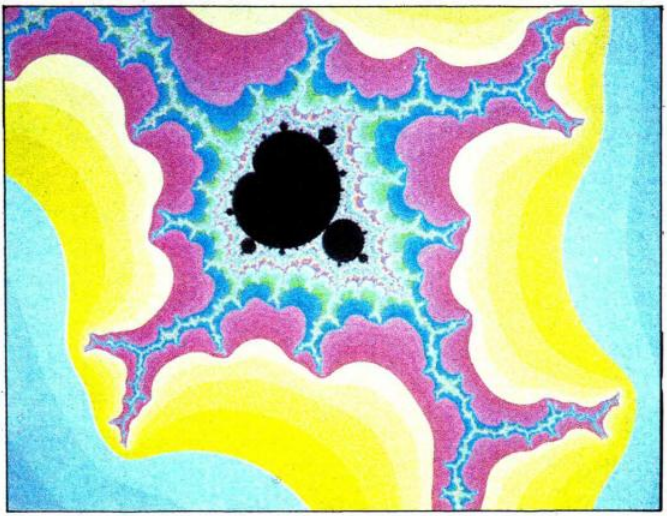

আমাদের দৈনন্দিন কাজে অথবা জীবনযাত্রায় কম্পিউটার গ্রাফিক্স বা কম্পিউটার সিম্যুলেশন ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানই হোক আর ভিডিও গেমসই হোক, কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রযুক্তিতে লাভবান হয়েছে দুটো ক্ষেত্রই। যেমন, কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাহায্যে একটি 'গাড়ি' চালিয়ে সরাসরি কোনও 'দেওয়াল-'এ ধাক্কা মারা সম্ভব। এই গ্রাফিক্স-চিত্র পরীক্ষা করে অটোমোটিভ এঞ্জিনিয়ারেরা বুঝতে পারেন কোনও সরাসরি সংঘর্ষে গাড়ির যাত্রীদের কতখানি ক্ষতির আশঙ্কা। তার ওপর নির্ভর করে তাঁরা গাড়ির নকশার রদবদল করতে পারেন চলচ্চিত্র নির্মাতারা যেসব বিশেষ কায়দায় অভিনব দৃশ্য পরদায় ফুটিয়ে তোলেন, তার মূলেও রয়েছে সেই কম্পিউটার গ্রাফিক্স। ছবিতে গ্রাফিক্সের কয়েকটি আধুনিক নমুনা দেখানো হয়েছে। এই গ্রাফিক্সগুলো তৈরি করতে নতুন একটি আই-সি চিপ ব্যবহার করা হয়েছে, যার নাম 'ভেক্টর প্রসেসর'।

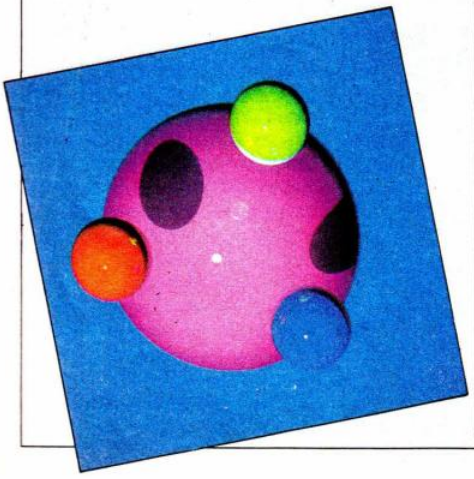

বেনজিন দূষণ রুখতে নতুন ব্যবস্থা

গাড়িতে নিয়মিতভাবে যে-জ্বালানি ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ পেট্রল, তাতে কিছু পরিমাণ বেনজিন থাকে। কার্বন ও হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি এই যৌগ যে আমাদের শরীরে ক্যান্সারের কারণ হতে পারে তার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এমনকি, বেনজিনের ক্ষতিকারক ক্ষমতা সিসের চেয়েও বেশি। মার্কিন রসায়নবিদেরা গবেষণা করে দেখেছেন, পেট্রলপাম্পের যে-কর্মী গাড়ির ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরেন তার শরীরে বেনজিন দূষণের পরিমাণ গাড়ির চালকের তুলনায় আড়াই গুণ। আমাদের পরিবেশে বেনজিনের মোট যা পরিমাণ তার প্রায় শতকরা তিরিশ ভাগই আসে পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি থেকে। সুতরাং বেনজিনের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক খতিয়ে দেখার পর বিজ্ঞানীরা পেট্রলপাম্পে ব্যবহার করার জন্য

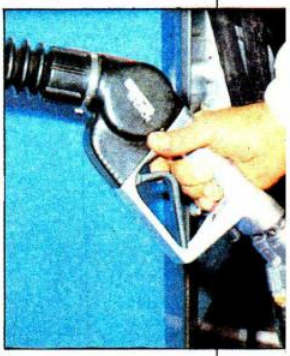

এক নতুন ধরনের হোস নজলের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই নজল্ ব্যবহারের ফলে পেটলের বাষ্প আর নল বা ট্যাঙ্কের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে না। এতে পাম্পকর্মীর স্বাস্থ্যক্ষয় হবে না, বেঁচে যাবেন চালকও।

অনুসন্ধানী

চরম বুদ্ধির বিকাশ আর বেশি দূরে নয়

দেখা-শোনার সঠিক তথ্য জানাতে হবে কম্পিউটারকে

সুনির্মল রায়

মানুষের মস্তিষ্ক এবং কম্পিউটারের মস্তিষ্ক নিয়ে আলোচনা আজকাল অনেক জায়গাতেই শোনা যায়। মানুষের মস্তিষ্ক বড়, না, কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বড়! কম্পিউটার কি কখনও মানুষের সমান হতে পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-প্রশ্নের উত্তর এখনই সঠিকভাবে দেওয়া যাবে না। তবে একটা কথা ঠিক, এখনও কম্পিউটার মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের সমান হয়নি বা তাকে ছাড়িয়ে যায়নি।

মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত জটিল। এক-একটা অনুভূতি মাথার এক-এক জায়গায় প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় বিদ্যুৎতরঙ্গের আকারে। মস্তিষ্কের যোগাযোগও এই বিদ্যুৎতরঙ্গের আকারেই হয় স্নায়ুর মাধ্যমে। অসংখ্য স্নায়ুকোষ আছে আমাদের মস্তিষ্কে।

মানবিক বোধবুদ্ধির গোড়াপত্তন আর মস্তিষ্কের পদ্ধতির অনুসরণ করেই চরম কৃত্রিম বুদ্ধির বুনিয়াদ তৈরি করা সম্ভব।

মানবমস্তিষ্ক কীভাবে বোঝে, শোনে, মনে রাখে, শেখে, জীবনধারা পরিচালনা করে এবং পরিবেশজাত তথ্যাদির সমন্বয় সাধন করে মূল লক্ষ্যে পৌঁছয় তা ভাল করে জানতে পারলে এবং কম্পিউটারে এই বোধ প্রোগ্রামের **সাহায্যে** তৈরি করা গেলে কম্পিউটারও মানুষের মস্তিষ্কের মতো নিজস্ব চিন্তাধারা প্রয়োগ করে, নিজে-নিজেই মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। আর কম্পিউটার থেকে যে ফলাফল পাব তা হবে মানবমস্তিষ্ক প্রসূত ফলাফলের চেয়েও নিখুঁত। কারণ মানুষ ভুল করতে পারে। কিন্তু কম্পিউটারে সে ভুল হবে না। আজকাল তাই কম্পিউটারে চিকিৎসা অনেক নিখুঁতভাবে হচ্ছে। একই লক্ষণযুক্ত অনেক রোগ হতে পারে। লক্ষণগুলি কম্পিউটারে দিলে কম্পিউটার বলে দেবে (রেখাচিত্রের সাহায্যে) কোন্ রোগটি হয়েছে। এবং রেখাচিত্রের সাহায্যেই কম্পিউটার বলে দেবে কোন্ ওষুধ কীভাবে খেলে সবচেয়ে কম সময়ে রোগীর রোগ সারানো যাবে। অবশ্যই এর জন্য কম্পিউটারে প্রোগ্রাম দিতে হবে। এই প্রোগ্রাম ইতিমধ্যেই বের করা সম্ভব হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আরও অনেক প্রোগ্রাম করা সম্ভব হয়েছে,যার সাহায্যে কম্পিউটার অনেক কম সময়ে অনেক কঠিন-কঠিন কাজ করতে পারে। যুদ্ধবিজ্ঞানেও এর ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। কোনও দেশের যোগাযোগ-ব্যবস্থা যদি রেখাচিত্রে প্রকাশ করা হয় তবে কম্পিউটারে প্রোগ্রাম দিয়ে বলা যায় সেই দেশের যোগাযোগের কোন্ কোন্ অংশ দুর্বল (দুর্বল অর্থে সেই অংশটি বিচ্ছিন্ন হলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে), কীরকম **ব্যবস্থা করতে পারলে** সেই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা দৃঢ় হবে (দৃঢ় অর্থে সেই দেশের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হবে)। এই তথ্য আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত, চিন, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশের ক্ষেত্রে বের করা সম্ভব হয়েছে।

এভাবে রেখাচিত্রের সাহায্যে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে কম্পিউটার

শুধু যুদ্ধবিজ্ঞান নয়, যে-কোনও যোগাযোগ - ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, যেমন টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রেও এর **সুষ্ঠু** প্রয়োগ হতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থা কীরকম হলে সবচেয়ে কম খরচে দেশের প্রতি জায়গার সঙ্গে প্রতি জায়গার যোগাযোগ হতে পারে এবং সবচেয়ে ভাল যোগাযোগ হতে পারে তাও বের করা সম্ভব হয়েছে। স্ট্রাকচারাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেও সম্ভব হয়েছে এর ব্যাপক প্রয়োগ। যে-কোনও যৌগের রাসায়নিক গঠনও বের করা যায়। শুধু তাই নয়, মোট কতরকমের বিভিন্ন রাসায়নিক গঠন থাকতে পারে সেই যৌগটির, তাও বের করা সম্ভব হয়েছে। এর সাহায্যে অনেক নতুন-নতুন যৌগ বের করা যাবে। অবশ্যই গঠন বের করার সময় দেখতে হবে সেই গঠনটি ইলেকট্রন বল ইত্যাদি বল বিবেচনা করে সাম্যাবস্থায় আছে কি না।

একই ধরনের কাজ বারবার করতে হলে কম্পিউটারের সাহায্যেই করা ভাল। এতে কাজও নিখুঁত হবে এবং সময়ও অনেক বাঁচবে। আগের আলোচনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কম্পিউটারে আমরা যেভাবে প্রোগ্রাম দেব অর্থাৎ যান্ত্রিক ভাষায় তাকে নির্দেশ দেব, সেইভাবেই সে কাজ করবে। এর জন্য দরকার উন্নত প্রোগ্রাম তৈরি করা। একটা শাখায় এই গবেষণা চলেছে। মানুষের মস্তিষ্ককে কত বেশি উন্নত করা যায় এবং সেই মস্তিষ্কের অনুরূপ মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট কম্পিউটার কীভাবে তৈরি করা যায়, তার কাজও চলছে।

প্রথম পদ্ধতির উন্নতির জন্য উন্নত প্রোগ্রাম, উন্নত অ্যালগরিদম্ এবং কোনও সমস্যার গ্রাফ থিওরেটিক রূপ অর্থাৎ রেখাচিত্র আঁকা দরকার। কীরকম রেখাচিত্র হলে সবচেয়ে কম সময়ে সেই সমস্যার সমাধান করা যায়। এবং রেখাচিত্র কীভাবে আঁকা **সম্ভব তা** দেখতে হবে। রেখাচিত্র জানা হয়ে গেলে, মানবমস্তিষ্কে সেরকম সংযোগ ঘটিয়ে রেখাচিত্র তৈরি করে অতি কম সময়ে

সেই সমস্যার সমাধান করা যায়। তবে মানবমস্তিষ্কের এই সংযোগ তৈরির জন্য মানসিক ব্যায়াম, ইলেকট্রো **এনসোগলো গ্রাফির** সাহায্য নিতে হয়, যেটা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তা ছাড়া মানুষের মস্তিষ্কের কোটি-কোটি স্নায়ুকোষের সামান্য অংশই সক্রিয় থাকে, বেশিরভাগ কোষই নিষ্ক্রিয় থাকে। নিষ্ক্রিয় কোষগুলিকে সক্রিয় করতে এবং সক্রিয় কোষগুলি আরও সক্রিয় করতে এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরির জন্য অনেক মানসিক ব্যায়ামের দরকার, মস্তিষ্কে বিদ্যুৎতরঙ্গ পাঠানো, আই-কিউ বাড়াবার চেষ্টা অর্থাৎ অনেক সময় লাগবে।

সবচেয়ে ভাল হয়, যদি সেই রেখাচিত্রের মতো সংযোগ-ব্যবস্থা (তারের সাহায্যে) কম্পিউটারে করা হয়। এটা কম্পিউটার তৈরির সময় করলেই চলবে। এই বিশেষ কম্পিউটারে এই ধরনের সমস্যা সবচেয়ে কম সময়ে করা যাবে। শুধু মানুষের চেয়ে কম সময়ে নয়, যে-কোনও **কম্পিউটারে** (ভবিষ্যতে যতই উন্নত হোক) **চেয়ে** কম সময়ে সমাধান করতে পারবে সেই সমস্যা এই বিশেষ কম্পিউটার। অবশ্য এ-ধরনের কম্পিউটার এখনও তৈরি হয়নি।

এভাবে অধিকাংশ সমস্যারই সেরা প্রোগ্রাম তৈরি সম্ভব। তবে সব সমস্যার সমাধান এভাবে হতে পারে না। পরিস্থিতি অনুসারে, পূর্ব অভিজ্ঞতা বোধশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সেই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, তা মানবমস্তিষ্ক জানে। কিন্তু সেরকম পরিস্থিতি অনুসারে পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সেই সমস্যা সমাধানের মূল লক্ষ্যে কম্পিউটার কিন্তু এখনও পৌঁছতে সক্ষম হয়নি।

অনেক নতুন-নতুন উন্নত কম্পিউটার তৈরি হয়েছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের থিংকিং মেশিন করপোরেশনের তরুণ বিজ্ঞানী ডানিয়েল হিলিস তৈরি করেছেন কানেকটিং মেশিন। তৈরি হয়েছে বর্তমানের দ্রুততম কম্পিউটার ক্রে-টু, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে তৈরি হয়েছে কসমিক কিউব ইত্যাদি। কিন্তু কোনওটাই মানবমস্তিষ্কের একেবারে অনুরূপ নয়।

মানবমস্তিষ্কের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কম্পিউটারের মস্তিষ্কে দেওয়া যায়, কিন্তু সৃজন এবং বোধশক্তির সাহায্যে লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষমতা কম্পিউটার অর্জন করতে পারেনি। পারেনি বলে যে কখনও পারবে না **এ-কথা** বলা ঠিক নয়। যন্ত্রেরও জীবের মতো নানা চেতনা আছে, ধর্ম আছে। সবচেয়ে বড় কথা, জড়ই হোক বা জীবই হোক, যে অবস্থায় থাকবে তার সবচেয়ে সুবিধা অর্থাৎ নিজের চাহিদা অনুসারে নিজের পরিবর্তন করার সে চেষ্টা করে। এ গুণও কম্পিউটারে থাকা সম্ভব। বিজ্ঞানীদেরও এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে কম্পিউটারকে। মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতা ভালভাবে **কম্পিউটারের** দিতে হবে, বোধশক্তি মানবমস্তিষ্কে যে প্রক্রিয়ায় হয় সেই আংশিক প্রক্রিয়া জেনে তা প্রোগ্রাম মারফত কম্পিউটারে দিতে হবে এবং কম্পিউটারকে সেই ধাঁচে তৈরি করতে হবে। **তা হলেই** কম্পিউটার এবং সেইসঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধন হবে।

তবে মানবমস্তিষ্কের মতো কম্পিউটার মস্তিষ্ক তৈরি করার সময় মানবমস্তিষ্কেরও চরম বিকাশ সাধন করতে হবে। আগেই বলেছি, আমাদের মস্তিষ্কের কোটি কোটি স্নায়ুকোষের একটা সামান্য অংশই সক্রিয় থাকে, বাকিটা থাকে নিষ্ক্রিয়। সুতরাং চেষ্টা চালানো হচ্ছে, এই নিষ্ক্রিয় কোষগুলিকে কী করে সক্রিয় করা যায় এবং সক্রিয় কোষগুলিকে কী করে আরও সক্রিয় করা যায়। এর জন্য মস্তিষ্কের যোগাযোগ-ব্যবস্থাও ভাল করতে হবে।

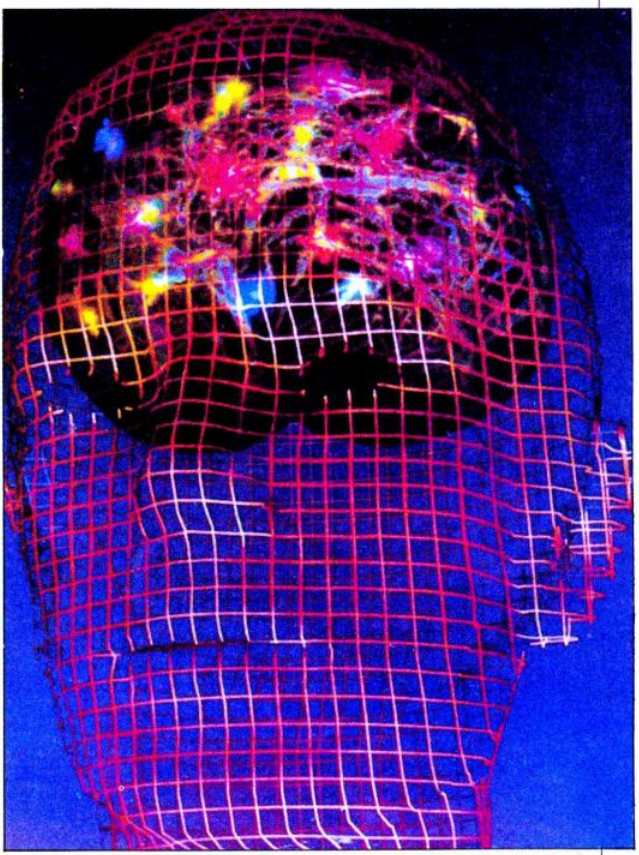

মানবিক বোধবুদ্ধির গোড়াপত্তন আর মস্তিষ্কের কাজকর্মের পদ্ধতি অনুসরণ করেই চরম কৃত্রিম বুদ্ধির বুনিয়াদ তৈরি করা সম্ভব।

ফোটো : 'ডিসকভার' ও 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর সৌজন্যে

হরেক মেলার মধ্যে ইদানীং নতুন আর-এক মেলা সংযোজিত হয়েছে। বইমেলা। এই বইমেলাকে ঘিরে সব বয়সের মানুষের, বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের, উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ নেই। বইয়ের মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রশস্ত অঙ্গনে প্রবেশের নিমন্ত্রণ আসে তাদের কাছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

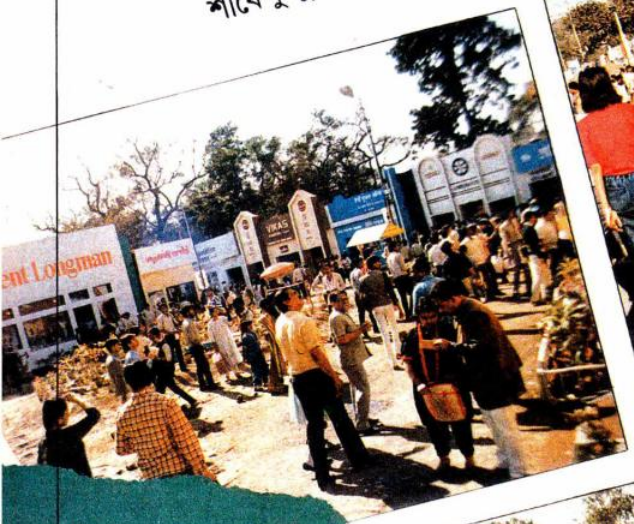

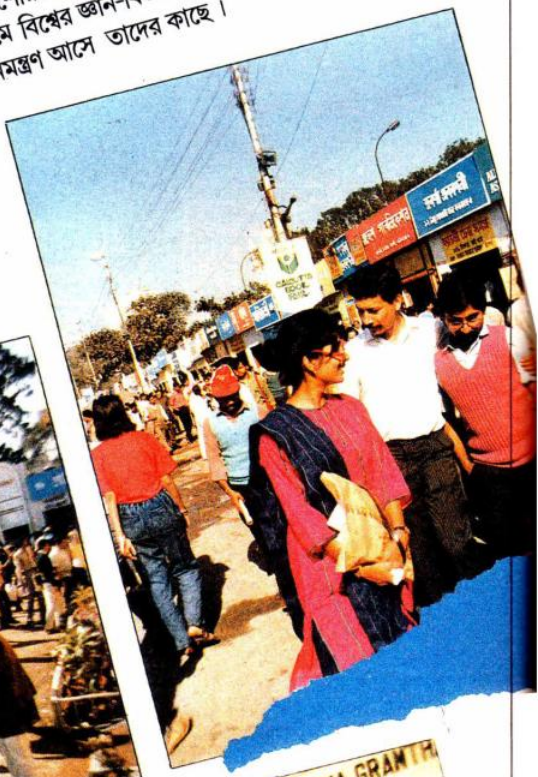

বইমেলায় উৎসুক ক্রেতাদের ভিড়

ফোটো : সন্তোষ দত্ত

আমি যখন নিজে কচি বয়সের ছেলে ছিলাম, তখন বই ছিল আমার স্বপ্নের জগতের দরজা। গল্পের মধ্যে ডুব দিয়ে কোন তেপান্তরের মাঠে রাক্ষক-খোক্কসের জগতে, পরিদের, ভূতের, পক্ষিরাজের রাজত্বে পৌঁছে যেতাম। বই তখন ছিল আমার এক দুর্লভ প্রাপ্তি। এখনকার মতো সহজ, সুলভ প্রাপ্তি তখন আমাদের ভাগ্যে ঘটত না। গল্পের বই ছিল দুর্লভ বস্তু। অনেক ঘ্যানঘ্যান করে, অনেক দিনের চেষ্টায়, এমনকি, চোখের জল ফেলে একখানা বই আদায় করা যেত। আর সে বইখানা হাতে পেলে কতবার যে পড়তুম তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সেই তুলনায় এ-যুগের বালক বা কিশোররা অনেক ভাগ্যবান। গল্পের বইয়ের সংখ্যাও বেড়েছে, আর অভিভাবকরাও মুক্ত হস্তে বই কিনে দেন।

এখনকার শিশুদের কাছে আরও সুখবর হচ্ছে বইমেলা। বইমেলা শুধু বই বিকিকিনির জায়গা নয়, এ হল বইয়ের উৎসব। এ হল বই নিয়ে আনন্দ। বই যে আমাদের কত বড় বন্ধু, বইমেলা সেই সত্যকেই প্রকাশ করে। আমি যদি শৈশবে এরকম বইমেলা পেতুম, তা হলে মনে হয় জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যেত।

বইমেলায় সবচেয়ে আনন্দিত, সবচেয়ে কৌতূহলী আগন্তুক হল শিশুরা। তারা হরেকরকমের বই দেখে। ছোঁয়, ঘাঁটে, কেনে। তারপর বইয়ের প্যাকেট বগলে নিয়ে যখন বাড়ি ফেরে তখন তার হাতের মুঠোয় এক আশ্চর্য জগতের চাবিকাঠি। আমার তো মনে হয়, শিশুদের কাছেই বইমেলার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি।

এ-যুগের শিশুদের ভাগ্য ভাল যে, তাদের আমলে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বেশি প্রকাশিত হয়। এখনকার ছাপা-বাঁধাইও ভাল। আর ছবিও অনেক ঝকঝকে। এইসব বই দেখলে আমার নিজের আবার বাচ্চা ছেলে হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আবার বড়দের হাত ধরে বইমেলার দুটি বিস্ময়-মাখা চোখ নিয়ে, দুটি সাগ্রহী কচি হাত নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, আর বুকে চেপে ধরি বই আর বই।

এখন আমার ছেলে ও মেয়ের মধ্যেই আমি নিজেকে খুঁজে পাই। আমার ছেলে-মেয়েও বইয়ের পোকা, তবে ওরা যেরকম টিনটিন বা আরও সুন্দর সুন্দর নানা রকমের কমিক্স হাতে পায়, তা তো আমি পেতুম না। আমাদের ছেলেবেলায় কমিক্স খুব সামান্যই ছিল। এখন শিশুদের দিকে অনেক বেশি নজর দেওয়া হয়। জাপান বা

বইয়ের খোঁজে

আমেরিকায় শিশুরা পায় সবচেয়ে বেশি মর্যাদা এবং মনোযোগ। আমার নিজেরও কেমন যেন মনে হয়, যে-কোনও সমাজে শিশুদের প্রতিই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আমি বাচ্চাদের জন্য যখন লিখি, তখন সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই। আর, এইসব গল্প-উপন্যাসের ভেতরে ভারমুক্ত মনে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারি। লেখার যে একটু কষ্ট আছে, সেটা তখন বুঝতেই পারি না। সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই যখন কচি হাতের লেখা খুদে পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি আসে।

বইয়ের স্টলে

বইমেলা মানে পিকনিক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সত্যি বলতে কি, এই রহস্যের জটটা ছাড়িয়ে দিয়েছে আমার ভাগনে শ্রীমান ডন।

মহা ধড়িবাজ বিচ্ছু ছেলে ডন। তার দুষ্টুমির কোনও তুলনা নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে সে অসাধারণ বুদ্ধিশুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তাক লাগাতেও ওস্তাদ।

রহস্যের সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে।

শীতের দুপুরে ছাদে বসে রোদের আরাম নিচ্ছি, এমন সময়ে ডন গিয়ে সোজা বলে দিল, "মামা, আজ বিকেলে আমাকে বইমেলায় নিয়ে যাবে।"

এদিন আমার এক বন্ধুর বউভাতের নেমন্তন্ন। তাই একটু বিরক্ত হয়ে বললুম, "বইমেলায় গিয়ে কী করবি?"

"টিনটিন কিনব।"

"তুই তো ইংরিজি পড়তেই পারিস না।"

ডন হাসল। "আমি বাংলা টিনটিন কিনব। বাংলায় টিনটিন বেরিয়েছে না?"

"বেশ তো। কিন্তু সেজন্য বইমেলায় যাওয়ার কী দরকার? বইপাড়া থেকে কিনে এনে দেব।"

ডন গোঁ ধরে বলল, "নাহ্। আমার বইমেলার টিনটিন চাই।"

"কী আশ্চর্য! বইপাড়ার টিনটিন আর বইমেলার টিনটিন কি আলাদা?"

"ইউ। এক্কেবারে অন্যরকম।"

অবাক হয়ে বললুম, "কী বলছিস তুই? বইপাড়া থেকে একই বই বইমেলায় গিয়ে অন্যরকম হয়ে যায় নাকি?"

"যায়।" ডন সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল। "তুমি রেডি থেকো কিন্তু।"

সে চলে যেতে পা বাড়িয়েছে, ডেকে বললুম, "ডন, শুনে যা।"

ডন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ঝটপট বলো!"

"গোঁয়ার্তুমি করিসনে। আজ বিকেলে আমাকে এক-জায়গায় যেতে হবে। বরং তোকে পরে বাংলা টিনটিন এনে দেব।"

"আমি নিজে কিনব।"

"বেশ। তা-ই কিনিস। কিন্তু....."

"কোনও কিন্তু-টিন্তু নয়। আমাকে তুমি আজই বইমেলায় নিয়ে যাবে।"

চটে গিয়ে বললুম, "বইমেলার টিনটিন আর বইপাড়ার টিনটিন তো একই বই রে!"

"কক্ষনো না।"

"না মানে?"

ডন ফিক করে হেসে বলল, "বাড়ির খাওয়া আর পিকনিকের খাওয়া কি এক? সেদিন পিকনিকে গিয়ে কত খেলুম বলো মামা! পেট ফুলে ঢোল।"

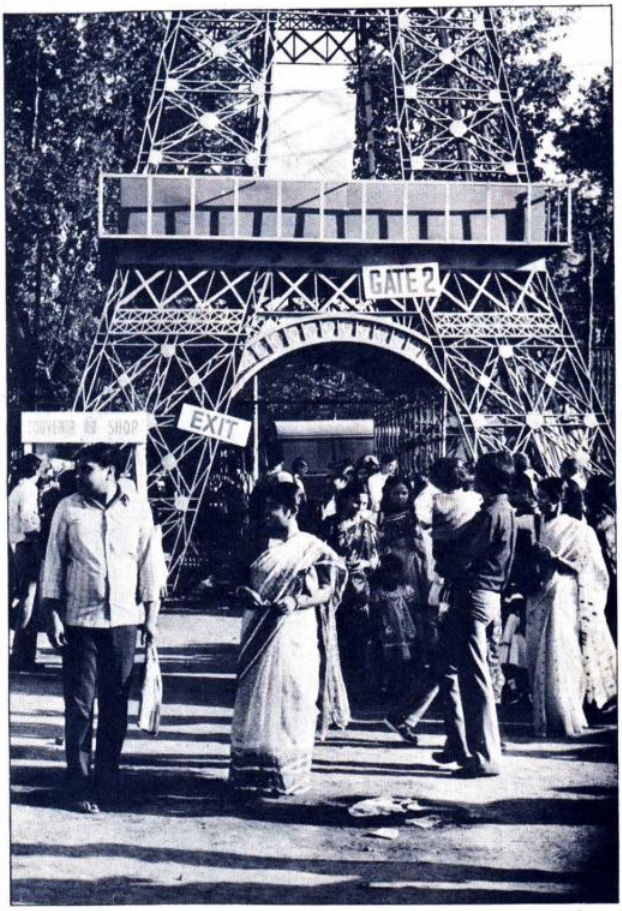

এরাই আসল ক্রেতা

বলে সে গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল। তারপর আমার চমক লাগল। তা-ই তো! দারুণ বলেছে তো শ্রীমান। বাড়িতে রোজ দু'বেলা যে ভাত খাই, পিকনিকে সেই ভাতেরই স্বাদ সত্যিই একেবারে অন্যরকম হয়ে ওঠে না কি? একই খাদ্য পিকনিকে কত সুস্বাদু মনে হয়।

হুঁ, শুধু বইমেলা কেন, মেলা ব্যাপারটার সঙ্গে পিকনিকের একটা চমৎকার মিল আছে বটে। দরকারি জিনিসপত্তর সবই তো বাজার-দোকানপাটে কিনতে পাওয়া যায়। অথচ সেইসব জিনিস যখন মেলায় গিয়ে কিনি, তখন কী একটা আনন্দও বাড়তি মিলে যায়। কেনাকাটারও যে বিশুদ্ধ একটা আনন্দ আছে, মেলা সেটা টের পাইয়ে দেয়।

মেলার কিন্তু আরও একটা মজার ব্যাপার আছে। সেখানে বিনি দরকারেও আমরা কিনি। মেলায় বেড়াতে গেলুম, অথচ কিছু কিনলুম না, তা কি হয়? যা হোক কিছু, যত তুচ্ছ হোক না কেন, কিনলেই মেলার সত্যিকার মজাটা পাওয়া যায়। মেলায় গিয়ে যে শুধু হল্লাজেল্লায় মাতল, একটা কিছু কিনল না, তার মতো বোকা আর কে আছে?

পিকনিকের সাধু বাংলা করা হয়েছে বনভোজন। বনবাদাড়ে আগের দিনে বাঘভাল্লুক থাকত। আজকাল বনবাদাড় কম। বাঘভাল্লুক আশ্রয় পেয়েছে অভয়ারণ্যে। তবে বনভোজন বলতে আসলে প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া। দু-চারটে গাছ। একটা নদী বা নিদেনপক্ষে জলা। সেখানে রেঁধেবেড়ে হুল্লোড় করে খাওয়ার আনন্দ আছে।

তেমনই মেলা ব্যাপারটাও যেন প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে আনন্দ লোটার একটা চেষ্টা। মেলার আদি ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, কোনও ধর্মস্থানের উৎসবকে কেন্দ্র করেই মেলা-র সূচনা। এখনও সব মেলা-ই সেই সুতো ধরে চলছে। কিন্তু বইমেলা একালের একেবারে টাটকা ঘটনা। একসময় কল্পনা করাও যেত না, নিছক বই কেনাবেচার জন্য মানুষ মেলা বসাবে এবং সেই মেলা হল্লাজেল্লায় কোনও অংশে কম যাবে না!

আমাদের দেশে গরিব আর নিরক্ষর বা লেখাপড়া-না-জানা মানুষের সংখ্যাই বেশি। লেখাপড়া-জানা মানুষ অধিকাংশ বাস করেন শহরে। তাই বইমেলা শহরেই বসছে। কিন্তু বইমেলাও তো আসলে সেই মেলা-ই। এ মেলাতেও একই কেনার আনন্দ। বইমেলায় গিয়ে অন্তত একখানা বই যে না কিনল, সে কী হারাল জানবে না। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটকে বইপাড়া বলা হয়। সেখানে বই কেনার মধ্যে খানিকটা থাকে প্রয়োজন, কিছুটা বাধ্যবাধকতার ব্যাপার। হাটে-বাজারে যেমনটি হয়। কিন্তু বইমেলায় গিয়ে বই কেনাটা অনেকখানিই যেন নিছক কেনার আনন্দ পেতে। আমার বিচ্ছু ভাগনে শ্রীমান ডন ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছে। সব বই-ই বইমেলায় গিয়ে অন্যরকম হয়ে ওঠে।

বইপড়ুয়া বা বইপাগল ছোটদের সামনে প্রতি বছর শীত ঋতুতে বইমেলা স্বর্গরাজ্যের দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে। আমাদের ছোটবেলার কথা ভাবলে দুঃখ হয়। তখন কতরকমের মেলা বসত। কিন্তু বইমেলা বলে কিছু ছিল না। তাই ভাবি, শ্রীমান ডনের বয়স ফিরে পেলে কী খুশি না হতুম! বই কেনার পয়সাকড়ি থাক বা না-ই থাক, কিছু যায়-আসে না! রকমারি ঝকমকে বইয়ের রাজ্যে ঢুকে অবাধে বই ঘাঁটাঘাঁটি করার মজাও তো কম নয়। কল্পরাজ্যের রংচঙে পরিবেশে অবাধ ভ্রমণ ঠেকায় কে?

আরও একটা ব্যাপার আছে। বইমেলার আসল ক্রেতা কিন্তু ছোটরাই। বড়রা অনেকেই বই কেনেন কেনার জন্য কিংবা ঘরের পরিবেশ গড়তে। বই কেনার বাতিকও থাকে অনেকের। বিখ্যাত লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের ঘরে অসংখ্য বই দেখে একজন জানতে চেয়েছিলেন, 'আপনি তা হলে অতসব বই পড়েছেন?' ফ্রাঁস মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'দশভাগের একভাগও পড়িনি। আমার মনে হয় না আপনার ঘরে যত দামি চিনেমাটির পাত্র আছে, সবই আপনি প্রতিদিন ব্যবহার করেন।' ছোটদের বেলায় কিন্তু এমনটি নয়। ছোটরা বই কেনে পড়ারই জন্য। আমার প্রিয় ভাগনে ডনের পড়ার ঘরে বইগুলোর দশা দেখে যত খারাপই লাগুক, বুঝতে পারি বইগুলোর দুর্দশার কারণ বারবার পড়া। একা-একা পড়া নয়, বন্ধুদেরও পড়ানো।

হুঁ, ছোটরাই সত্যিকার বইপড়ুয়া। বইমেলার যত বই ছোটরা কেনে, সবই পড়া হয়ে যায়। একবার নয়, বারবার। বইমেলা আসলে তাদের না পেলে জমে না। ডন বলেছে, পিকনিকে গিয়ে তার পেট ফুলে ঢোল হয়েছিল। বইমেলার বই এনে পড়া পিকনিকের সেই খাওয়ার মতো। বুদ্ধিশুদ্ধি ফুলে ঢোল হয়। মাথাটি ভালই খোলে। অতএব শ্রীমানকে নিয়ে বইমেলায় গিয়ে অন্যরকম টিনটিন কিনে দিতেই হবে।

ফোটো : অমিতাভ ভট্টাচার্য

বইয়ের কথা

বিকাশ বসু

বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে পাহাড়ের মসৃণ পাথরে, কিংবা পুরনো মন্দিরের দেওয়ালে কারা যেন নিজেদের নাম লিখে গেছে। ঠিক এটাই দেখা যেত বিলেতের 'বিচ' গাছের গায়ে। কারণ, বিচ গাছের মসৃণ ত্বক লেখালেখির পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কবি টমাস ক্যাম্পবেলের একটি কবিতা আছে। নাম 'বিচ গাছের আবেদন'। কবিতায় বিচ গাছ স্বগতোক্তি করছে, 'কত না ধূসর নামের পাণ্ডুলিপি আমার শরীরে।'

বস্তুত, যে-কোনও ধরনের পাণ্ডুলিপি ধরে রাখার আধার হিসেবে বিচ গাছের ওপরেই উপদ্রবটা হত বেশি। ঠিক যেমন, হরিণের মাংস সুস্বাদু বলেই তার দিকেই শিকারির নজর পড়ে বেশি। যাই হোক, এ হল বিলেতের অ্যাংলো-স্যাকসন যুগের কথা। বিচ গাছের স্যাকসনি নাম 'বোক'। ক্রমে উচ্চারণ পালটে এ থেকেই হয়ে গেল 'বুক' বা 'বই'।

ওদিকে, এর বহু আগেই জন্ম হয়েছে লাতিন ভাষার। লাতিন শব্দ 'ফোলিয়েজ' (অর্থ—গাছের পাতা) থেকে এসেছে 'ফোলিয়েজ', 'ফোলিও' (ভাঁজ করা পাতা), 'ফোলিও ভল্যুম' (বড় আকারের বই)। এরা যেন আমাদের 'ভূর্জপত্র' বা তালপাতার পুঁথিরই স্বগোত্র। লাতিনে অবশ্য 'বই' বোঝাতে আর একটা শব্দ আছে—'লিবার', যার থেকে লাইব্রেরি।

গ্রিসে দেখি আবার বিলেতের মতোই সেই গাছের ত্বক নিয়েই টানাটানি। অবশ্য এখানে বিচ গাছের বদলে প্যাপিরাস, পেপার-এর সঙ্গে যার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। গ্রিক শব্দটি হল 'বিবলোজ', অর্থ প্যাপিরাস গাছের ভেতরের ত্বক। সেই বিবলোজ থেকেই 'বাইবেল', 'বিবলিওগ্রাফি', 'বিবলিওফাইল' ইত্যাদি।

আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু বই বোঝাবার জন্য গাছের ত্বক নিয়ে টানাটানি করেননি। যদিও ভূর্জপত্রে ও তালপাতায় লেখালেখি করেছেন বিস্তর, তবু তাঁরা গাছপালার দিকেই যাননি। তাঁদের হাত থেকে পেয়েছি আমরা 'পুস্তক', 'পুঁথি' ও 'গ্রন্থ'।

গ্রন্থ ও পুস্তকের অর্থ একই—'বন্ধন'। অনেক 'ভূর্জপত্র' বা তালপত্র একসঙ্গে বেঁধে দিলে বা গ্রন্থিবদ্ধ করলে তবেই না তৈরি হয় একটি গ্রন্থ। গ্রন্থি, গ্রন্থনা তো সকলেরই জানা শব্দ। এদিকে পুস্তক ও পুঁথিও সেই বন্ধনই।

পুস্তকের মূলে 'পুস্ত', সংস্কৃত ভাষায় যার অর্থ 'বন্ধ'। আর পুঁথির উৎস সংস্কৃত শব্দ 'পুস্তী'। পুস্তী>পোথি>পুথি>পুঁথি—এইভাবে।

আমাদের আটপৌরে শব্দ বই। এর আদিতে আছে আরবি ভাষার 'বহি'। বহি শুধুই ধর্মপুস্তিকা। আরবিতে সাধারণ বই, যে-কোনও বই বোঝাতে আছে আর একটি শব্দ—'কিতাব' বা 'কেতাব'। এবার বই নিয়ে কিছু টুকরো কথা বলি।

ইনকুনাবলা

শুনে মনে হয় শব্দ নয়, অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি। যেন কেউ মজা করার জন্য খেলাচ্ছলে এটি তৈরি করেছে। কিন্তু তা নয়, রীতিমত অর্থবহ এই শব্দ।

লাতিনে 'ইনকুনাবুলাম' শব্দের অর্থ সদ্যোজাত শিশুর গায়ে জড়ানো বা ফিতের সাহায্যে বাঁধা তোয়ালে বা ঢিলে পোশাক। এর থেকেই আধুনিক ভাষাতেও যে-কোনও বস্তুর 'আদি অবস্থা' বোঝাতে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন ইংরেজিতে ডি কুইন্সির লেখায় আছে, 'ইনকুনাবুলা অব দ্য রেভোলিউশনারি স্পিরিট'।

এই শব্দকেই জার্মানরা দিয়েছেন এক বিশেষ অর্থ। ইনকুনাবিলা এখন জার্মান ভাষায় ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগে মুদ্রিত যে কোনও বই। এই অর্থে 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স'-এর ক্যাক্সটন সংস্করণ (১৪৭৮) এক বিখ্যাত ইনকুনাবুলা।

গ্রোলিয়ের বাঁধাই

শুধু অর্থ-মূল্যেই নয়, বইয়ের মর্যাদা অন্যভাবেও দেওয়া যায়। এ-ব্যাপারে এক বই-পাগলের নাম ইতিহাস হয়ে গেছে। ফরাসি দেশের অভিজাত পরিবারের এই ভদ্রলোকের নাম জঁা গ্রোলিয়ের (১৪৭৯-১৫৬৩)। বই সংগ্রহ ছিল তাঁর বাতিক। তিনি বইয়ের যত্নও করতেন খুব। প্রতিটি বই দামি চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে নিতেন। বাঁধাইয়ে লিখিয়ে নিতেন নিজের নাম। পরে যে-কোনও অভিজাত বাঁধাইয়ের নাম হয়ে যায় 'গ্রোলিয়ের বাঁধাই'। ১৬৭৫ সালে তাঁর বিখ্যাত সংগ্রহশালার সব বই বিক্রি

ঈশপের গল্পের ছবি : কাঠখোদাই পদ্ধতিতে ছাপা (১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ)

কাকে বলা হয় কোলোফন

প্রকাশনা সংস্থার নিজস্ব প্রতীক-চিহ্ন থাকে। 'চিহ্ন' না বলে তাকে 'চিত্র'ও বলা যায়। যেমন আনন্দ পাবলিশার্স-এর ত্রিপত্র, পেঙ্গুইনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো মানুষ-মানুষ চেহারার পেঙ্গুইন পাখি।

গ্রন্থ-প্রকাশনার আদিযুগে কিন্তু প্রকাশকের এরকম কোনও প্রতীকচিত্র বা প্রতীকচিহ্ন থাকত না। গ্রন্থের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় নীচের দিকে থাকত মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম-ধাম, পরিচয়লিপি। প্রকাশনার তারিখ ইত্যাদিও। এখন যেমন থাকে খবরের কাগজে, পুস্তিকায় বা ইশতেহারে ঠিক তেমনই। একে বলা হত 'কোলোফন'।

কোলোফন শব্দটা গ্রিক। অর্থ— 'চূড়া' বা 'সমাপ্তি'। অর্থাৎ— ছাপার অক্ষরে পরিবেশিত শেষ কথা। এখনকার ভাষায় একে বলা হয়ে থাকে 'প্রিন্টার্স লাইন'।

প্রকাশকের প্রতীকচিহ্ন বা চিত্র এল অনেক পরে— তখন প্রিন্টার্স লাইন চলে এসেছে বইয়ের শেষ থেকে একেবারে শুরুতে। সেখানেই দেওয়া শুরু হল গ্রন্থ প্রকাশন ও মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য। কিছুকাল পরে কোনও-কোনও প্রকাশক সেই তথ্যের সঙ্গে জুড়ে দিলেন তাঁদের নিজস্ব প্রতীকচিহ্ন বা চিত্র। এখন কোলোফন বলতে তথ্য ও চিত্র দুই-ই বোঝায়।

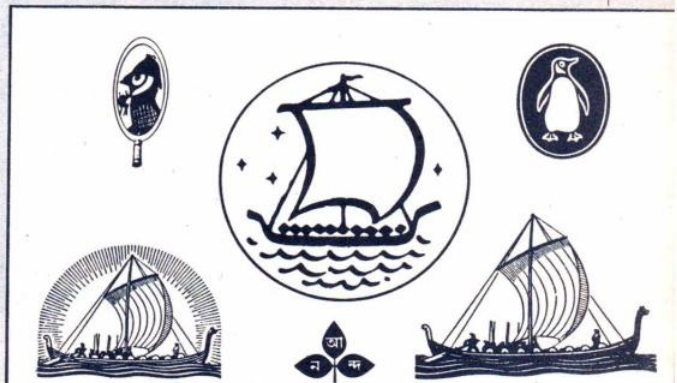

প্রকাশকদের এইরকম প্রতীক-চিহ্ন তাঁদের মুদ্রিত বইয়ে থাকে

সাধারণভাবে যে -কোনও ব্যবসায়ী সংস্থার নিজস্ব 'মার্ক' বা 'প্রতীক'কে বলে 'লোগো' (গ্রিক 'লোগোস' অর্থ 'শব্দ')। সেই হিসেবে প্রকাশকের প্রতীককেও বলা যায় লোগো।

কোলোফন বা প্রকাশকের প্রতীক নিয়ে একবার এক মজার ব্যাপার ঘটে। এখনকার 'ভাইকিং' প্রকাশনার প্রস্তাবিত নাম ছিল 'হাফমুন প্রেস'। সংস্থার প্রতীক চিত্রও হবে সেই অনুযায়ী— সব ঠিকঠাক। কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতীক হিসেবে শিল্পী রকওয়েল কেন্টকে ওই নামের তখনকার (১৯২৫) এক বিখ্যাত জাহাজের ছোট ছবি এঁকে দিতে বললেন। সে প্রতীকছবি যখন সংস্থার হাতে এল তখন— হাফমুন প্রেস জাহাজের সঙ্গে, এমনকি সেই সময়ের কোনও জাহাজের সঙ্গেই তার কোনও মিল পাওয়া গেল না। প্রতীকে যে ছবি এঁকেছেন শিল্পী, তা একটি পালতোলা 'ড্রাকার', যা একসময় ব্যবহার করত শুধু ভাইকিং বা জলদস্যুরা। কিন্তু ছবিটি দারুণ পছন্দ কর্তৃপক্ষের। তাঁরা ছবিটি ছাড়লেন না, তার বদলে ছেড়ে দিলেন সংস্থার প্রস্তাবিত নাম। হাফমুন প্রেস প্রকাশন সংস্থার নাম হয়ে গেল 'ভাইকিং'।

হয়ে যায়। গ্রোলিয়েরের নাম লেখা যে কোনও বইই এখন গ্রন্থ-সংগ্রাহকদের গর্বের বস্তু।

শুধু তাই? ১৮৮৪ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে গঠিত হয়েছে 'গ্রোলিয়ের ক্লাব'—উদ্দেশ্য 'গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের সৌকর্য বৃদ্ধি'। গ্রন্থের যত্নের ব্যাপারে যিনি ছিলেন আদি ও অগ্রগণ্য তাঁর প্রতি এই সম্মান।

গুটেনবার্গ বাইবেল

এই হিসেবে 'গুটেনবার্গ বাইবেল'ও ইনকুনাবুলার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু গুটেনবার্গ বাইবেল লেখার পর বন্ধনীর মধ্যে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিলেই বোধ হয় ভাল হয়। অথবা, ১৪৫০ সালে মুদ্রিত ও ১৭৬০ সালে কার্ডিনাল ম্যাজারিন-এর গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত ওই গ্রন্থকে 'ম্যাজারিন বাইবেল' নামও দেওয়া যেতে পারে। অনেকে তা দিয়েও থাকেন।

বহুকাল ধরে এরকম একটা ধারণা ছিল গুটেনবার্গ বাইবেলই ইউরোপের 'সচল হরফ' প্রথায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ (কাঠখোদাই পদ্ধতিতে নয়)। এদিকে তাঁর নামে প্রচলিত এই বাইবেল তাঁরই ছাপা কি না, সে নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া, এটি ইউরোপে সচল হরফে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম স্থান দাবি করতে পারে না এই কারণে যে, গুটেনবার্গ নিজেই এই বাইবেলের আগে একাধিক ছোট বই ছেপেছিলেন। এর ফলে অবশ্য বইটির ঐতিহাসিক মূল্য বা মর্যাদা কমেনি। ১৯৭৮ সালে আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় এই বইয়ের এক কপি কিনেছেন ২·৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের এখনও পর্যন্ত এটাই নাকি সর্বোচ্চ মূল্য।

কবির সম্মান

হেনরিক সিলেম্যান, প্রাচীন ট্রয় নগরী নতুন করে আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন হোমার-এর-ভক্ত। নিজের ছেলে ও মেয়ের নাম রাখেন আগামেমনন ও আন্দ্রোমেকি। আন্দ্রোমেকি হল ইলিয়াড কাব্যের নায়ক হেক্টরের স্ত্রী, আর আগামেমনন ট্রয় অভিযানে গ্রিক পক্ষের নির্বাচিত সেনাপতি।

সাধারণভাবে একজন খ্রিস্টানের সন্তানের জন্মের কিছু পরে তার মাথায় জর্ডন বা পবিত্র নদীর জল ছিটিয়ে ও মাথায় বাইবেল রেখে যাজক আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত বা 'ব্যাপটাইজ' করে থাকেন। হোমার-ভক্ত হেনরিক সিলেম্যান তাঁর ছেলে-মেয়েকে দীক্ষিত করেন তাদের মাথায় হোমারের 'ইলিয়াড' ছুঁইয়ে এবং ওই কাব্য থেকে নির্বাচিত শত পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে।

আলেকজান্ডারের হোমার

কিন্তু বইয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান ? সে এসেছে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ মানুষের হাত দিয়ে। গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নিত্যসঙ্গী ছিল হোমারের মহাকাব্যের এক বিশেষ সংস্করণ। এই বইটি তাঁর গুরু অ্যারিস্টটলের নিজের হাতে সংশোধিত। যুদ্ধক্ষেত্রেও এই বইটি তাঁর সঙ্গী। রাত্রে বইটি তিনি রাখতেন মাথার বালিশের তলায়, তাঁর সুবিখ্যাত তলোয়ারের পাশেই।

পারস্যরাজ দরায়ুসকে পরাজিত করে আলেকজান্ডার যখন লাভ করলেন মণিমাণিক্যখচিত এক স্বর্ণপেটিকা, তখন হোমারের মহাকাব্যের স্থান হল সেই পেটিকায়। অবশ্য যে সময় তিনি বইটি পড়তেন না, শুধু সেই সময়টুকুর জন্য। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, এই ব্যবস্থা। হোমারের মহাকাব্যের নিরাপদ সম্মানিত আশ্রয় ছিল আলেকজান্ডারের স্বর্ণপেটিকা।

মার্ক টোয়েন

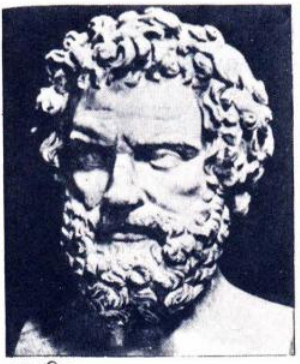
সোফোক্লিস

ইউজিন ও'নিল

চসার

বই ও বয়স

চসার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স' রচনা শুরু করেন ৫৪ বছর বয়সে। গ্রিক কবি হোমার ও লাতিন ভাষার কবি ভার্জিলের রচনার বিখ্যাত অনুবাদক ওগিল্‌ভি গ্রিক ও লাতিন জানতেন না তাঁর পঞ্চাশ বছরে পা দেওয়ার আগে।

এদিকে, কবি লঙফেলোকে জিজ্ঞেস করা হল, "এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি শিশুসুলভ আনন্দে এত কবিতা লিখে চলেছেন কী করে ?" তিনি উত্তর দিলেন, "গভর্নর এন্ডিকট-এর বাগানের পিয়ার গাছের বয়স হল ২০০ বছর, তবু সে কী করে আজও এমন পিয়ার ফলায় যার সুগন্ধ তরুণ গাছের ফলের চেয়ে কিছু অংশে কম নয় ?"

লেখকের বয়স সম্পর্কে বেশ মজার এক কাহিনী রয়েছে সোফোক্লিস ও তাঁর ছেলেদের নিয়ে। এই গ্রিক নাট্যকার ৯০ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

তাঁর অতি বৃদ্ধ বয়সে দেশের আদালত হঠাৎই হুকুমনামা দিয়ে আদালতে ডেকে পাঠাল তাঁকে। কী ব্যাপার ? তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ আছে—আর নালিশ করেছে তাঁর নিজের ছেলেরাই। তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তবু তিনি সম্পত্তি ধরে বসে আছেন। ছেলেদের আর্জি—পৈতৃক সম্পত্তির দেখাশোনার ভার যেন তাদেরই দেওয়া হয়।

নালিশ ও আর্জি শুনে বৃদ্ধ নাট্যকার সোফোক্লিস হাসলেন। বয়স ? তাঁর ? তা হলে শুনুন, মাননীয় বিচারক ও জুরিগণ। তিনি তাঁর জোব্বার পকেট থেকে বের করলেন তাঁর সদ্যসমাপ্ত নাটক 'কোলনে ইডিপাস'-এর পাণ্ডুলিপি। বলিষ্ঠ কণ্ঠে পড়ে গেলেন বেশ খানিকটা। মুগ্ধ জুরিরা একবাক্যে বললেন, "যাঁর কলম থেকে

জর্মন কাঠখোদাইয়ের নমুনা (১৫ শতকের)
বইয়ের নাম : ডাশ গোল্ডেন স্পিয়েল

এরকম জোরালো লেখা বেরোয়, তাঁর বিরুদ্ধে বার্ধক্যের নালিশ হাস্যকর। আমরা দুঃখিত, আপনার বিরুদ্ধে নালিশ গ্রাহ্য করার জন্য।"

উপযুক্ত প্রহরী দিয়ে আদালত সম্মানের সঙ্গে নাট্যকারকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

পরিমার্জনা

বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ও'নিল-এর নাটক 'আঃ উইল্ডারনেস' মঞ্চস্থ করা হবে। পাণ্ডুলিপি পড়ে রাসেল ক্রস ও'নিলকে বললেন, "নাটকটা আর একটু ছোট করে দেওয়া যায় না? মানে সময় লাগছে····"

ও'নিল বললেন, "আচ্ছা দেখব।"

তিনি তাঁর নাটকের একটি শব্দও কাটতে রাজি হন না। আজ তাঁর এ কী সুমতি (বা দুর্মতি)? রাসেল খুশিও হলেন, আবার অবাকও হলেন।

পরের দিনই ও'নিল ডেকে পাঠালেন রাসেলকে। পাণ্ডুলিপি রাসেলের হাতে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার সময় সংক্ষেপের কাজ হয়ে গেছে।"

"হয়ে গেছে?"

"অন্তত ১৫ মিনিটের মতো সময় বাঁচানো গেছে।" এতটা রাসেল নিজেও আশা করেননি। খুশি হয়ে বললেন, "কোনখানটা বাদ দিলেন?"

"চার অঙ্কের নাটক তো? মানে আপনাকে তিন বার বিরতি দিতে হচ্ছে। শেষ বারের বিরতিটা নাই বা দিলেন? ওটা না দিলে··· আপনার পাক্কা ১৫ মিনিট সময় বেঁচে যাবে।"

রাসেলও ও'নিলের হাসিতে যোগ দিলেন, কিন্তু খুশি হতে পারলেন না।

হাস্যপুরাণ

এক রবিবার ধর্মসূত্রের অতি মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা শোনবার পর মার্ক টোয়েন শ্রদ্ধেয় যাজককে বললেন, "চমৎকার লাগল আপনার ভাষ্য। কিন্তু আপনি যা বললেন তার প্রতিটি শব্দই আছে আমাদের বাড়ির একটি বইয়ে।"

তা কেমন করে হয়? ধর্মসূত্রের এই ব্যাখ্যা বা ভাষ্য তাঁর স্বরচিত। "অসম্ভব," বললেন, যাজকমশাই, "আমি ওই বইটি একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই।"

এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ডাক মারফত পেলেন এক নির্ভরযোগ্য অভিধানের অ-সংশোধিত সংস্করণ।

বিখ্যাত বইয়ের উৎস, উপাদান ও রচনার মডেল

নির্জন দ্বীপে নিঃসঙ্গ সেলকার্ক : শিল্পীর কল্পিত ছবি

বিক্ষুব্ধ নাবিক আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক। তাকে নিয়ে চলাই দুষ্কর। তাই তাকে ছোট্ট এক নির্জন দ্বীপে জোর করে নামিয়ে দিয়েছিলেন তার জাহাজের ক্যাপ্টেন। সেটা ছিল ১৭০৪ সাল। সেলকার্ক জনশূন্য সেই দ্বীপে নিঃসঙ্গ কাটিয়ে ছিলেন চার বছরেরও কিছু বেশি সময়। তারই বিবরণ ভিত্তি করে ডানিয়েল ডিফো লিখেছিলেন 'রবিনসন ক্রুসোর জীবন ও রোমাঞ্চ অভিযান'। বেরিয়েছিল ১৭১৯ সালে।

একেবারে সমসাময়িক ব্যাপার। অতএব কথা উঠতে দেরি হল না, লেখক ডিফোর সঙ্গে কি তাঁর কাহিনীর নায়ক চরিত্রের মডেল সেলকার্কের কোনওদিন মুখোমুখি দেখা হয়েছিল? অসম্ভব নয়। হতেই পারে যে, লণ্ডনের কোনও কফিহাউসে কিংবা বিস্টলের পানশালায় ডিফোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেলকার্কের। সেলকার্ক তখন তাঁর দ্বীপবাসপর্বের বিখ্যাত দাড়িগোঁফ ও ছাগচর্মের পোশাক ফেলে দিয়ে সস্ত্রীক বাস করছেন লণ্ডনের অভিজাত পাড়া পল ম্যালে। তাঁদের সাক্ষাৎকারের আনুমানিক সাল তারিখও হিসেব করে বের করে ফেলেছেন কেউ-কেউ। সম্ভবত এঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ হয় ১৭১৩ সালে।

ডিফো নিজে কিন্তু সব সময় এড়িয়ে গিয়েছেন এ-প্রসঙ্গ। শুধু বলতেন, "দ্যাখো, লোকটা এখনও বেঁচে রয়েছে এবং সে এখন বেশ নামকরা লোক। কোনও সন্দেহ নেই তাকেই আমি আমার গল্পের বিষয় করেছি। তার জীবনের সঙ্গে সবটা না হোক, বেশির ভাগটা মিলে যায়।"

রচনার মডেলদের সম্পর্কে এইটাই কথা। কখনও-কখনও সামান্যই মেলে, তবু বোঝা যায় কার আদলে কাকে গড়েছেন লেখক, আয়নায় কার ছায়া, কোন প্রতিমার খড়মাটি জোটানো হয়েছে কোথা থেকে।

যেমন রবিনসন ক্রুসোর মডেল অবশ্যই আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক। চার বছরের কিছু বেশি সময়ের নির্জন দ্বীপবাসের পর সেলকার্ককে উদ্ধার করেন অন্য এক জাহাজের কাপ্তেন রোজার্স। রোজার্সের নোটবুক থেকে জানা যায়, প্রথম বছরটা সেলকার্কের অবশ্যই মনমরা হয়ে কেটেছিল। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই তার মনের বিষণ্ণতা কেটে যায় এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে সে বেশ মানিয়েও নেয় নিজেকে। রোজার্স তাঁর নোটবুক ছাপিয়ে প্রকাশ করেন এবং ফলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে সেলকার্ক। তারপর ডিফোর গল্পের নায়ক।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচীর মডেল কিন্তু একাধিক। 'জয়হিন্দ' ধ্বনিতে মুখর ছিল আমাদের বাল্যকাল। আর বিপ্লবীবীর সব্যসাচীর উদ্দেশে নিবেদিত 'তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ। তাই দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না'—শরৎচন্দ্রের এই আবেগমথিত লাইন আমরা মিলিয়ে নিয়েছিলাম সুভাষচন্দ্রের অশেষ দুঃখভোগ ও আনন্দময় স্বার্থত্যাগের সঙ্গে। কেননা, সব্যসাচীর মতোই তাঁরও শেষজীবনের অভাবনীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ছিল ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া।

অপরিণত সেই বয়েসের ধারণায় মনে হত, সব্যসাচীর মডেল হয়তো-বা সুভাষচন্দ্র (পরে জেনেছি তা অসম্ভব), কেননা নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের কৃতিত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপার, আর শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৮ সালের আগে সুভাষচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যোগ

বলতে—সেখানকার কুখ্যাত ম্যাগুেলে জেলে তিনি কিছুকাল বন্দী ছিলেন মাত্র। তবে এ ক্ষেত্রে অনেকের মনে হবে—সাহিত্যজীবনের অনুসরণ না করে জীবন অনুসরণ করেছে সাহিত্যকে।

সে যাই হোক, সব্যসাচীর মডেল হিসেবে দাবিদার অনেক। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু—এঁরা দু'জন তো আছেনই। এঁরা শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই দেশের জন্য দেশ ছেড়েছিলেন।—একজন আমেরিকাকে করেন তাঁর কর্মকেন্দ্র, আর-একজন জাপানকে। মানবেন্দ্র রায় যিনি দেশসেবা দিয়ে শুরু করে পৌঁছন শেষে মানবসেবায়, এক-এক দেশে যাঁকে এক-এক ছদ্মনাম নিতে হয়েছে গুপ্তচর ও পুলিশের মোকাবিলায়, তাঁর সঙ্গে সব্যসাচীর সাহসিকতায়, ধীশক্তিতে বেশ মিল লক্ষ করা যায়। এই মানবেন্দ্র রায়ের দৃষ্টান্তও ছিল শরৎচন্দ্রের সামনে।

এদিকে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল আত্মীয় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সঙ্গে। এই বিপ্লবীর পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেবার বহুবিধ কলাকৌশলের সত্যিকাহিনীও তাঁর অজানা ছিল না। অতএব বিপিনবিহারীও সব্যসাচীর অন্যতম মডেল হতে পারেন। আসলে এ-ক্ষেত্রে এই 'অন্যতম' শব্দটাই আসল। আর সব্যসাচীর যাবতীয় কথা ও কাজের স্মরণীয় অসাধারণত্ব ? সে লেখকের কল্পনা প্রতিভারই সৃষ্টি—এরকমই মনে হয়। এমনকি, লেখকের বাল্যকালে দেখা ভাগলপুরের ডাকাতিয়া ছেলে রাজেন্দ্রনাথ (যাঁকে নিয়ে তাঁর শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ), সব্যসাচীর চরিত্রগঠনে তারও কিছু অবদান থাকা অসম্ভব নয়, কেননা বড় লেখকের কলম এভাবেই চলে।

শ্রীমতী হ্যারিয়েট স্টো তেমন বড় লেখক নন, কিন্তু তাঁর 'আঙ্কল টমস কেবিন' বইটি খুবই বিখ্যাত। তাঁর আঙ্কল টমের কিন্তু এক অবিসংবাদিত মডেল আছে। নাম জোসিয়া হেনসন। ইনি জন্মেছিলেন মেরিল্যাণ্ডে ১৭৮৯ সালে। লেখিকা স্টো-এর কলমে আঙ্কল টমের ছবি এইরকম :

সাদামাটা চালচলন, বিনীত আচরণ, সহনশীল সরল প্রকৃতির মানুষ। সেই সঙ্গে মানসিকতায় সম্ভ্রান্ত, উদার, পরম খ্রিস্টভক্তও। স্টো-এর গল্পের শেষে দেখা যায়—ক্যাসি ও এমলিন নামের দুই ক্রীতদাসীর গোপন আস্তানার ঠিকানা তিনি অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ মনিব সাইমন লেগ্রির কাছে কিছুতেই কবুল করেন না, অমানুষিক মারের মুখেও।

বই সবাইকে এই একটি জায়গায় মিলিয়ে দিয়েছে

এদিকে বাস্তবজীবনের টমকাকা-জোসিয়া হেনসন—আপন কর্মদক্ষতায় ক্রীতদাস হয়েও জীবনে অনেক অনেক বড়-বড় কাজ করেন। যেমন মনিবের হয়ে খামারের ওভারসিয়ার ও ম্যানেজারের কাজ। তবু একমাত্র ক্রীতদাস এই অপরাধেই শেষে কানাডায় পালাতে বাধ্য হন।

মুক্ত হয়ে হেনসন স্কুল পর্যন্ত গড়ে তোলেন, যে স্কুলের পড়ুয়ারা শুধু তাঁর মতো কালো মানুষই নয়, শ্বেতাঙ্গরাও।

সাহিত্যপাঠক হিসেবে হেনসনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অবশ্য এইখানেই যে, শ্রীমতী স্টো-র এই বিখ্যাত গ্রন্থটির উপাদান জুগিয়েছে তাঁর লেখা ৭৬ পৃষ্ঠার আত্মজীবনী।

ব্যক্তিগত জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা লেখিকার অবশ্যই ছিল, তবু তাঁর পক্ষে নিগ্রো ক্রীতদাসের নিগ্রহ লাঞ্ছনার স্বরূপ জানা সম্ভব ছিল না। হেনসনের পুস্তিকা পড়েই স্টো গড়ে তোলেন তাঁর মরমী কাহিনী।

কালো মানুষদের ওপর অত্যাচারের সে-কাহিনী পড়ে খামারের শ্বেতাঙ্গ কর্তব্যক্তিরা এমনই চটে যান যে, তাঁদের মধ্যে একজন স্টোকে এক ক্রীতদাসের কাটা-কান উপহার পাঠান। আবার দাস-প্রথার অবসানে যিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেই প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন শ্রীমতী স্টো-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে বিস্ময় আর আনন্দে বলে ওঠেন,"তা হলে এই সেই খুদে মহিলা যিনি উত্তর-দক্ষিণে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছেন ?"

'ক্রীতদাস প্রথা, অথবা নয়'—এই প্রশ্নে আমেরিকা উত্তর দক্ষিণে ভাগ হয়ে যায়। এই নিয়ে গৃহযুদ্ধের উৎস যদি হয় একটি বই (যেমন বলেছিলেন লিঙ্কন), তা হলে সেই বইয়ের উৎস একটি মানুষ—জোসিয়া

পত্র-পত্রিকার স্টলে

হেনসন ও তাঁর ৭৬ পৃষ্ঠার আত্মজীবনী।

টমকাকার কুটিরের কথা অনেকে জানে, তার চেয়ে কম লোক জানে এ-বইয়ের লেখিকা শ্রীমতী স্টো-এর কথা (তার চেয়ে ঢের কম লোক জানে হেনসন ও তাঁর আত্মজীবনীর কথা)।

লেখক জেমস ফ্যানিমোর কুপারের নাম যে জানে না সেও জানে তাঁর বিখ্যাত বই, 'দি লাস্ট অব দি মোহিকানস'-এর কথা। কেননা, এখন ওই নামটি শুধু ইংরেজি সাহিত্যেরই নয়, ইংরেজি ভাষারও সম্পদ। এখন ইংরেজিতে 'দি লাস্ট অব দি মোহিকানস' এই শব্দগুচ্ছের সাধারণ অর্থ হল 'বিলুপ্ত গোষ্ঠীর শেষ জীবিত প্রতিনিধি'। এমনই সফল ও প্রিয় ওই বই।

এদিকে মজার ব্যাপার হল এই যে—হাডসন নদীর উভয় পাড়ের যে মানবগোষ্ঠী মোহিকান বা মোহিগান—তাদের নিয়ে লেখা এই বই, তারা সত্যি সত্যি সবাই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ওই গোষ্ঠীর অন্তত প্রায় ৮০০ মানুষ এখনও টিকে আছে। তারা রয়েছে প্রধানত কানেকটিকাট ও ম্যাসাচুসেটস অঞ্চলে। টিকে আছে অবশ্য তাদের পুরনো জাতিবৈশিষ্ট্য হারিয়ে। তবু তারা যাকে বলে ডোডো পাখির মতো সত্যি সত্যি 'বিলুপ্ত' হয়ে যায়নি।

সাহিত্যিকের কলমের জোরের এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

কলমের জোর জিনিসটা আরও বোঝা যায় 'রোমাঁ আ ক্লেফ' গোত্রীয় উপন্যাস থেকে। ফ্রান্সে এই ধরনের বইয়ের বেশ একটা চল ছিল সপ্তদশ শতকে। পরবর্তীকালে সব দেশেই লেখা হয়েছে এই জাতীয় বই—যে বই পড়ে বোঝা যায় চরিত্রটি বা চরিত্রগুলো কে কার আদলে তৈরি। বিশেষ করে বুঝতেন যাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে তিনি। রোমাঁ আ ক্লেফ-এর অর্থ—'চাবি উপন্যাস'। অর্থাৎ বাস্তবের চরিত্রকে জানার চাবিকাঠি উপন্যাসের মধ্যেই দেওয়া আছে।

আমাদের দেশে দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী' নাটক পড়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ কি কবি মধুসূদন ? দীনবন্ধু বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন এই বলে—'মধু কি কখনও নিম হয় ?'

কিন্তু পিকবের 'নাইটমেয়ার অ্যাবি'তে যে বায়রন, শেলি ও কোলরিজের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছে এ-তথ্য তাঁর বইয়ের পাঠক মাত্রই জানতে পারে। অলডাস হাক্সলির, 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'-এ রয়েছেন ছদ্মবেশী ডি· এইচ· লরেন্স।

মবি ডিক : ক্যাপ্টেন আহাব মবি ডিককে লক্ষ্য করে হারপুন ছুঁড়ছেন

অনেকেই বাস্তবের চরিত্রকে এনে ফেলেন সাহিত্যে। হারমান মেলভিলের এদিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসেই এই ঝোঁক লক্ষ করা যায়। 'মবি ডিক' তো একেবারে বাস্তব সত্য। অবশ্য লেখকের কৃতিত্ব—তা, সত্য ঘটনার গল্পোপম বিবরণ মাত্র নয়, সত্যের আনন্দরূপ, খাঁটি সাহিত্য।

মেলভিলের কলমের গুণেই আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত তিমির নাম মবি ডিক। সে মেলভিলের ওই নামের বইয়ের অবিস্মরণীয় নায়ক। এদিকে তার একটি বাস্তব জুড়িও ছিল। এবং 'মোচা ডিক' নামের (নামটাও খুবই কাছাকাছি) এই সাদা তিমি সমুদ্রত্রাস হিসেবে মেলভিলের সৃষ্ট মবি ডিকের চেয়ে কিছু কম বিখ্যাত ছিল না। বস্তুত বাস্তবের এই তিমিকেই মেলভিল তাঁর গ্রন্থে অমর করে গেছেন।

মেলভিলের জন্মের বছরটিতে (১৮১৯) মোচা ডিক তার মানুষের বিরুদ্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে জয়ী হয়। আর সবসুদ্ধ এরকম ১০০টি যুদ্ধেও তাকে পর্যুদস্ত করা যায়নি—এরকমই তার খ্যাতি। মেলভিল যখন তাকে নিয়ে তাঁর বইটি লেখেন (১৮৫০) তখনও সে মানুষের উদ্যম কলাকৌশল ও প্রতিশোধস্পৃহার বিরুদ্ধে তার অমানুষিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

সেই সময়ের নাবিকেরা পরস্পরের সঙ্গে দিনের প্রথম সাক্ষাতে জলহাওয়ার প্রসঙ্গ না তুলে বলত, "মোচা ডিকের নতুন খবর আছে ?" এর থেকেই তার খ্যাতির পরিমাণ কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এমন অনন্য এক বাস্তব চরিত্র কাহিনীর নায়ক না হয়ে যায় ?

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায়, মোচা ডিকের দৈর্ঘ্য ছিল ১১০ ফুট, অর্থাৎ তিমি-শিকারি নৌকোর দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি। বুক-পেটের বেড় ৫৭ ফুট। শুধু চোয়ালের দৈর্ঘ্যই হবে ২৫½ ফুট। সে ঘায়েল করেছে ৭টা জাহাজ, ধ্বংস করেছে প্রায় ২০টা নৌকো, আর অন্তত ৩০ জন মানুষকে হত্যা করেছে। তার শৌর্য গল্পের মবি ডিকের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

সমুদ্রত্রাস এই শ্বেত তিমির শেষ জীবন বড় করুণ। ১৮৫৯ সালের অগস্টে শেষ দেখা যায় তাকে। ব্রাজিলের উপকূলে প্রায় বিনাযুদ্ধে তাকে পরাজিত করে মানুষ। সে তখন মৃতকল্প বৃদ্ধ, ডান চোখটি দৃষ্টিহীন, মাথায় বহুবিধ ক্ষতচিহ্ন, আটটি দাঁত নেই, এবং বাকি দাঁতগুলো থেকেও নেই, এমনি ক্ষয়ে গেছে।

কিন্তু কেউই মোচা ডিকের শেষ জীবনের চেহারা মনে রাখেনি। মেলভিলের কলমে আঁকা ছবিই তার প্রামাণ্য ছবি। সমুদ্রের প্রাণী হয়েও সে মানুষের মতোই বুদ্ধিতে শৌর্যে বীর্যে উদ্যমে অপরাজেয়।

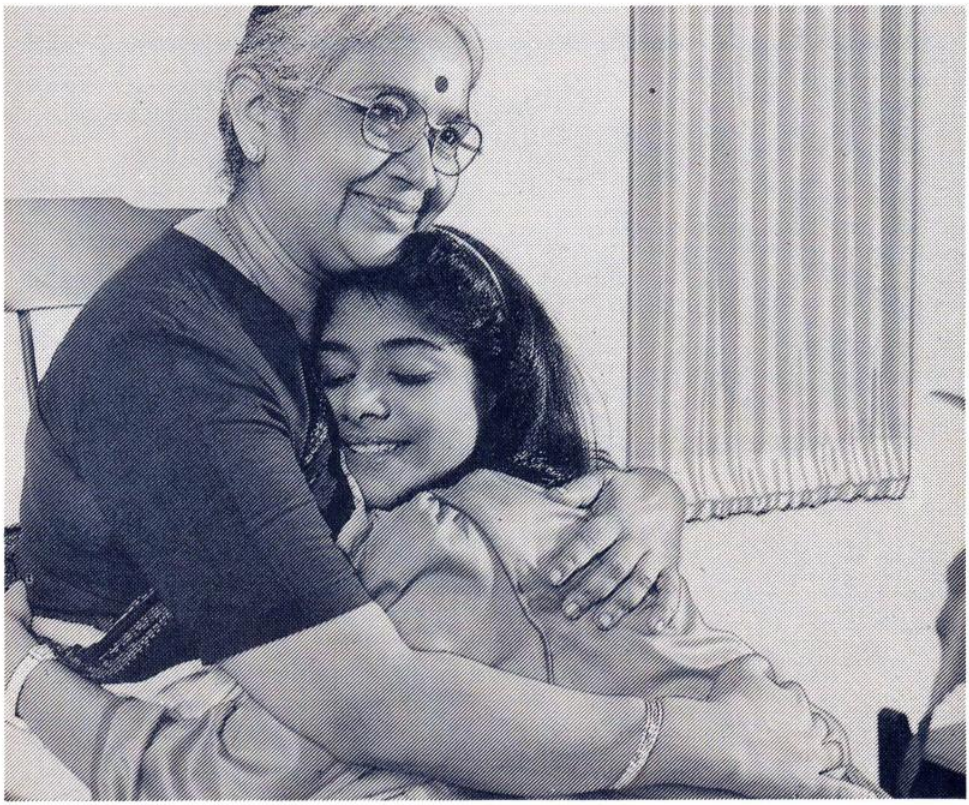

যখন ব্যথা করে, কার কথা মনে পড়ে?

অম্রুতাঞ্জন। প্রায় একশ বছর ধরে, মাথা-ধরা, পিঠে ব্যথা, মচকানো — শরীরের যাবতীয়া ব্যথা-বেদনায় অম্রুতাঞ্জন আরাম দিয়ে এসেছে। নির্ভরযোগ্য স্নিগ্ধ অম্রুতাঞ্জন সারা জীবন ধ'রে আপনার বিশ্বস্ত সেবক।

অম্রুতাঞ্জন
পেইন্ বাম

অম্রুতাঞ্জন লিমিটেড

O&M 1782 BEN

ছাপা বইয়ের আগে

অণিমা মুখোপাধ্যায়

ইংরেজরা এ-দেশে এসে এমন অনেক কিছুই করে গিয়েছে, যা আমাদের দেশে আগে ছিল না। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনে রাখবার বিষয় হল, ছাপার বই তৈরি। প্রথম দিকে কাঠের ওপর খোদাই করে অক্ষর লিখে তাতে কালি মাখিয়ে কাগজের ওপর ছাপ দিয়ে বই তৈরি আরম্ভ হয়। এইভাবে আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে যেদিন এ-দেশে প্রথম ছাপা বইটি তৈরি হল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেদিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই ছাপা বইটিই দ্রুত লেখাপড়ার জগৎটাকে আজকের এই অবস্থায় পৌঁছে দিতে পেরেছিল।

ছাপার হরফ আবিষ্কারের আগে হাতে লেখা পুঁথিগুলোই ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল। এই পুঁথি লেখা হত তালপাতা, ভূর্জগাছের ছাল, আর তুলট কাগজ নামে এক ধরনের হাতে তৈরি কাগজে। তখন ব্যাকরণই হোক, অঙ্কের বই হোক, অথবা কাব্য-নাটকই হোক লেখক কিন্তু নিজের হাতেই প্রথমে একটি পুঁথি লিখতেন। যাঁর প্রয়োজন হত, সেটি চেয়ে নিয়ে পড়ে আবার মালিককে ফেরত দিয়ে দিতেন। আর কারও যদি মনে হত সেই পুঁথিটি তাঁর নিজের কাছে রাখবেন, তবে মূল পুঁথিটি দেখে কাউকে দিয়ে নকল করিয়ে নিয়ে একটা নতুন পুঁথি তৈরি করে নিতেন। সেই সময় এইভাবে পুঁথি নকল করে দেওয়ার লোক পাওয়া যেত। তাঁদের বলা হত লিপিকর। এঁরা মূল পুঁথিটি একেবারে হুবহু নকল করে ফেলতেন, তারপরে মূল পুঁথিতে যে রচনাকালবাচক তারিখ অথবা লিপিকাল দেওয়া থাকত তাকে 'আদর্শ' পুঁথির তারিখ হিসেবে উল্লেখ করে, পরে নিজের অনুলিখনের সমাপ্তিকালটি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এইভাবে কোন পুঁথিটি কোন সময়ের তা সহজেই জানা যায়, যদি পুঁথিটি খণ্ডিত না হয়।

লিপিকর পুঁথির শেষে বিভিন্ন বাঁধা শ্লোকের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিতেন যে, তাঁরা পুঁথিতে যেমনটি দেখেছেন, ঠিক তেমনটিই নকল করেছেন। ভুল যদি কোথাও লিখে থাকেন তবে সে ভুল 'আসল' পুঁথিতেও ছিল। তবু তিনি তো সামান্য লিপিকর। কোথাও যদি কিছু বিচ্যুতি থেকে যায় পাঠক যেন তা না ধরেন।

লিপিকর কখনও নিজের বাড়িতে বসেই পুঁথি নকল করতেন, কখনও-বা যিনি পুঁথি নকল করাচ্ছেন তাঁর বাড়িতে দিনের পর দিন থেকেও পুঁথি নকলের কাজ করতেন। বর্তমান পশ্চিম বাংলার অনেক জেলাতেই এক বা একাধিক লিপিকরের বাস ছিল। বীরভূমের আদিত্যপুর, কোঙরডিহি, মুগসরা, রসিকবাজার, বিমুরি, বর্ধমানের কাইতি শ্রীরামপুর, ছোট বৈনান, খণ্ডঘোষ, বড়চতুরি, দামিন্যা, গোপালপুর, হাওড়া ভূড়শুটের কাসুন্দিয়া, কলকাতার সুতানুটি, কাপালিটোলা, বাঁকুড়ার কেশিয়া, আমদিয়া, চব্বিশ পরগনার বুড়ুল, গুঠারি, দৌতলপুর ইত্যাদি অঞ্চলের বেশ কয়েকজন লিপিকরের নাম পাওয়া যায়। যারা তাঁদের দীর্ঘ জীবনের প্রচুর পুঁথির নকলের কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে বর্ধমান জেলার খণ্ডমোষ গ্রামের অতিবৃদ্ধ পঞ্চানন আশ তো জন্মান্তরেও পুঁথি নকলের কাজ করার বাসনা জানিয়ে গেছেন তাঁর লেখা পুষ্পিকা অংশে।

পুঁথির মধ্যে এই পুষ্পিকা অংশটুকু খুবই আকর্ষক এবং মূল্যবান। সাধারণভাবে পুঁথির শেষ পত্রটিতে কাব্যের শেষে লেখক বা লিপিকর অনেক সময় পুঁথি সমাপ্তির দিনক্ষণ, তারিখ, নিজের নাম, নিজের গ্রামের নাম, যাঁর জন্য পুঁথি নকল করছেন তাঁর নাম, নিজের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পুঁথি নকলের পারিশ্রমিক, অথবা সমসাময়িক কোনও বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করতেন। এই অংশটুকু থেকে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং ঐতিহাসিক বহু ঘটনার মূল্যবান খবর পাওয়া যায়।

যেমন বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত একটি চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির পুষ্পিকায় ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের ভয়াবহ বর্ণনাই শুধু নেই, কী করে চালের দর দিন-দিন আকাশছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে, অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর দামই বা কীরকম, কোথায় রোদের তাপে মাঠের ফসল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কোথাকার জলাভূমিতে সামান্য ধান হয়েছে, কত লোক কীভাবে দিনের পর দিন অনাহারে মারা গেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। অথবা পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের জাতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত মহাভারতের একটি পুঁথির পুষ্পিকায় ফরাসডাঙায় বর্গির উৎপাত একটি পরিবারকে কীভাবে বিপর্যস্ত করেছিল তার সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কোন্ দরিদ্র ব্যক্তি অন্নসত্রে প্রতিপালিত হয়ে পুঁথি লিখছেন, একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর শোক ভোলার জন্য কে পুঁথি নকল শুরু করেছেন, কে ফসলের খেতে পোকা লাগায় অনন্যোপায় হয়ে পুঁথি লেখার পেশা অবলম্বন করেছেন ইত্যাদি বহু খবরই মেলে।

পুঁথির পুষ্পিকায় এ ছাড়াও পাওয়া যায় অনেক মজার খবর। যেমন গ্রামের কোন্ চোরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গ্রামের লোক পরিকল্পনা করছে, কার খেতে গোরু ঢোকায় লিপিকর কৌতুক বোধ করছেন, কোথাও পুঁথি নকল করে একখানি গা মোছার গামছা আকাঙ্ক্ষা করছেন বলে পুষ্পিকায় উল্লেখ করছেন, কোথাও-বা পারিশ্রমিক এক টাকা চার আনা, যদি মালিক দিতে অস্বীকার করেন তবে তাঁর কী ক্ষতি হবে বলেও লিপিকর ভয়

দেখাচ্ছেন এই পুষ্পিকা অংশেই। আবার কোন্ পুঁথি বিয়েতে যৌতুক দেওয়া হল, কোন্ পুঁথি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্য লেখা হল, কোন্ পুঁথি বিষ্ণুপুরের মহারানি নিজেই নকল করলেন, এরকম কত না-জানা খবর আমরা পাই এই পুষ্পিকার অংশেই। এ এক নতুন জগৎ। যা ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে মূল্যবান দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

কিন্তু এই পুঁথিগুলি অনেকক্ষেত্রেই যখন আমাদের হাতে আসে তখন হয় তার পাতাগুলো হাত দিতে গেলে ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ে অথবা একটার গায়ে অন্যটা এমনভাবে আটকে থাকে যে, সেগুলো আর আলাদা করে তার থেকে পাঠ উদ্ধার করবার উপায় থাকে না, কিংবা প্রথম ও শেষ দিকের পাতাগুলোই নেই। যার ফলে পুঁথির সময় ইত্যাদি অনেক মূল্যবান তথ্য অজানা থেকে যায়। আর তখনই পণ্ডিত মহলে সেই না-পাওয়া পুঁথির পাতাগুলো নিয়ে জল্পনা-কল্পনা-গবেষণা চলতে থাকে বছরের পর বছর, এ-পর্যন্ত পাওয়া বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাগীতি'র পুঁথিটিও পাওয়া গেছে এইরকম খণ্ডিত অবস্থায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন।

এইভাবে পুঁথিগুলো নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ, তখনকার দিনে পুঁথি যেভাবে রাখা হত, তা এখনকার মতো সুন্দর ঘরে সুন্দর সুন্দর আলমারিতে থরে থরে সাজানো বইয়ের সঙ্গে কোনওভাবেই তুলনা করা চলে না। তখন তো প্রায় সব বাড়িই ছিল মাটির মেঝে, মাটির দেওয়াল আর খড়ের বা টালির চাল। আর পুঁথিতে লেখা বিষয়গুলোও আজকের দিনের মতো গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বিষয় ছিল না। সেখানে লেখা হত ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র, দেবমাহাত্ম্য আর নানা শাস্ত্রের বিষয়। পুঁথি সংগ্রহ করে এনে তা বাড়ির খড়ের চালের বাতায় গুঁজে রাখা হত, অথবা যাঁদের ভক্তি খুব বেশি ছিল তাঁরা ঠাকুরের সিংহাসনের পাশে অথবা চণ্ডীমণ্ডপের কুলুঙ্গিতে রেখে প্রতিদিন পুঁথি পূজা করতেন।

এর ফল যা হওয়ার তাই হল। যে পুঁথিগুলির জায়গা হয়েছিল ঘরের চালের বাতায়, তারা মাঝে-মধ্যে আলো-হাওয়া পেত, কিন্তু সিংহাসনের পাশে রাখা পুঁথিগুলোকে একেবারেই ঠাকুর করে রাখা হত।

এই পুঁথিগুলো বছরের পর বছর আলো হাওয়া না পেয়ে এবং নাড়াচাড়ার অভাবে পাতাগুলো এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে,

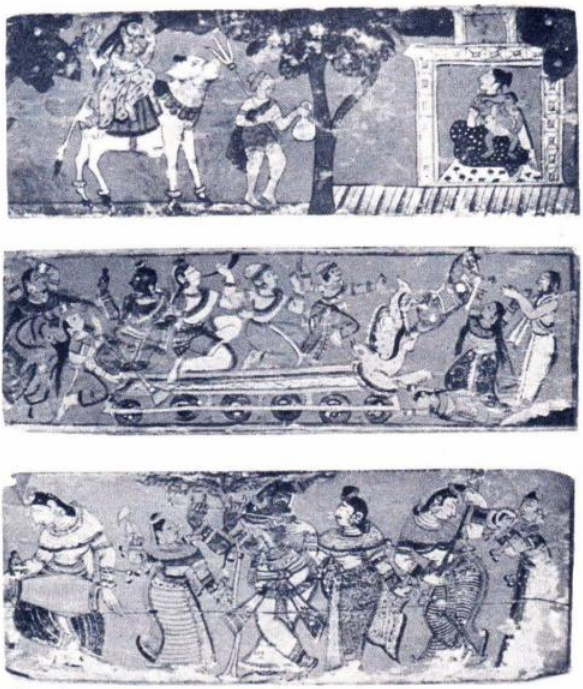

পুঁথির কাঠের মলাটে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে আঁকা ছবি

সেসব পুঁথিতে কী লেখা ছিল আজ আর তা জানতে পারা যাবে না। ভাবলে কষ্ট হয়, সেই সময়কার কত অজানা কাব্য-কাহিনী, কত ইতিহাস এর মধ্যে হারিয়ে গেছে। আজও গ্রামগঞ্জ থেকে এইরকম অনেক পুঁথি পাওয়া যায়।

পুঁথি পড়তে সবাই পারে না। কারণ এর হরফ ঠিক এখনকার হরফের মতো নয়। একটু অন্যরকম। একেবারে প্রথম দিকের ছাপা বইয়ের হরফ অবশ্য তখনকার পুঁথির হরফকে আদর্শ করেই তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘ অধ্যবসায়ে এই হরফগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে পুঁথি পড়ার বিশেষ বিদ্যাটি আয়ত্ত করতে হয়। আর যে গুটিকয়েক লোক পুঁথি পড়তে পারেন, এইভাবে পুঁথিগুলি নষ্ট হয়ে যেতে দেখলে তাঁদের খুব মন খারাপ হয়। কিন্তু কিছু করার নেই। কারও বাড়ির গৃহদেবতা যেমন কেউ চাইলে দেবে না, মনে করবে বাড়ির অকল্যাণ হবে, পুঁথির ক্ষেত্রেও অনেকটা এইরকম মনোভাবই কাজ করে। 'নষ্ট হচ্ছে আমার ভিটের হোক, তবু পৈতৃক পবিত্র জিনিস হাতছাড়া করলে সংসারের হানি হবে'—এই সংস্কার অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল। তাই পুঁথিগুলো ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেও কেউ নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে, জাতীয় সম্পদ হিসেবে সেগুলো কোনও মিউজিয়ামে দেওয়া তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে শুধু দেখতে দিতেও রাজি হন না।

পুঁথির পাতাগুলো কিন্তু বইয়ের মতো একসঙ্গে আটকানো থাকে না। বেশির ভাগ দু' দিকে লেখা এই পাতার প্রত্যেকটা আলাদা করা যায়। আর অনেক সময় পাতার ঠিক মাঝখানটিতে একটা করে ফুটো থাকে। তার মধ্য দিকে একটা শক্ত সুতো ঢুকিয়ে তাই দিয়ে পাতাগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। আবার কখনও-বা মলাটের মতো করে পুঁথির দু'পাশে দুটো কাঠের পাটা দিয়ে আটকে, তারপর নতুন গামছা বা এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে রাখা হত। সাধারণভাবে পুঁথিগুলো হত আয়তাকার। সাধারণত চওড়ায় তিন থেকে চার ইঞ্চি। আর লম্বায় দশ থেকে বারো ইঞ্চি।

(উপরে) পুঁথির কাঠের মলাটে পুরীর রথযাত্রার ছবি, (নীচে) শ্রীচৈতন্যদেবের নগর সংকীর্তনের দৃশ্য

আমাদের দেশে যে গোটানো তালপাতার পাখা পাওয়া যায়, তার দু' দিকে রং দিয়ে লতাপাতা, ফুল আঁকা থাকে, ঠিক সেইরকম তৈরি পুঁথিও পাওয়া গেছে। লতাপাতার বদলে সেখানে সুন্দর হাতের লেখায় কাব্য-কাহিনী লেখা রয়েছে। আবার কোথাও দেখা যায় তালপাতাকে ছোট-ছোট গোল করে কেটে, তার মধ্যে কাব্য রচনা করে সেগুলোকে মালার মতো করে গেঁথে রাখা আছে। দেখলেই গলায় পরতে ইচ্ছ করে। অথচ সেটাও একটা পুঁথি। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের এইরকম কিছু-কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে।

অনেক সময় এইসব পুঁথিতে রং-তুলি দিয়ে নানা ধরনের সুন্দর-সুন্দর ছবিও আঁকা থাকত। মধ্যযুগের অনেক রামায়ণ-মহাভারতের পুঁথিতে একদিকে কাহিনীর বর্ণনা, অন্যদিকে পাতায়-পাতায় বহুবর্ণে আঁকা সব ছবি। শুধু রামায়ণ-মহাভারতের পুঁথিতেই নয়, অন্য অনেক পুঁথিতেও ছবি আঁকা থাকত। যেসব পুঁথি মুঘলযুগের রাজা-বাদশার নির্দেশে চিত্রিত হত, সেখানে উজ্জ্বল নানা রঙের সঙ্গে থাকত সোনার জলের কারুকাজ। যেমন আইন-ই-আকবরির একটি চিত্রের একদিকে আছে সোনার জলের কারুকার্যে তখনকার দিনে যতরকমের অলঙ্কার ব্যবহৃত হত তার ছবি। অন্যদিকে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের ছবি।

ছুরির আকৃতির 'গীতগোবিন্দ' পুঁথি। (নীচে) পুঁথির কাঠের মলাটে সমুদ্র মন্থনের চিত্র

এইসব চিত্র রাজ্যের নামী শিল্পীদের দিয়ে আঁকানো হত। পেশাদার শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো ছবি ছাড়াও সাধারণ পুঁথিতে অনেক সময় লিপিকর নিজেই ছবি আঁকতেন। আবার কখনও-বা পুঁথির যিনি মালিক তিনি নিজেই তাঁর কোনও প্রিয় দেবদেবীর মূর্তি, লতাপাতা, জীবজন্তু অথবা পুঁথিতে বর্ণনীয় বিষয়ের কোনও একটি দৃশ্যের চিত্র এঁকে নিজের পুঁথিখানিকে আরও আকর্ষক করে তুলবার চেষ্টা করতেন।

সুখের কথা এই যে, অনেককাল আগে থেকেই পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক বা সাহিত্য-গবেষকদের দৃষ্টি পড়েছে এই পুঁথি সংগ্রহের দিকে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি সংরক্ষণ-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বিদেশের অনেক বড় বড় সংগ্রহশালায় অনেক ভারতীয় পুঁথি আছে—বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের পুঁথিই আছে বেশ কয়েকখানি। আর ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে তো বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পুঁথি আছেই।

এই পুঁথিগুলি সংগ্রহ করবার ইতিহাসও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কোথায় কোন অখ্যাত গ্রামে কার বাড়ির ঠাকুরঘরের পিঁড়ির তলায়, কোন চণ্ডীমণ্ডপের কুলুঙ্গিতে, গোয়াল ঘরের পুরনো আবর্জনার স্তূপে অথবা ঘুঁটের মাচায় বস্তাবন্দী অবস্থায় পুঁথি পড়ে রয়েছে—তার খবর রাখা তো খুব সহজ কাজ নয়। আর সেখান থেকে সংগ্রহ করে আনা তো আরও কঠিন।

আসলে একদল আত্মভোলা, কাজ পাগল, জ্ঞানী আর উৎসাহী মানুষ থাকেন, যাঁরা অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার আগ্রহে গভীর অরণ্য থেকে দুর্গম পবর্তমালা সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। দেশে দেশে প্রাচীন লিপি, পুঁথি ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করেছেন এরকমই কিছু জ্ঞানপাগল মানুষ। আর গ্রামেগঞ্জে নিজেরা গিয়ে দিনের পর দিন বহু পরিশ্রমে এঁরা পুঁথি জোগাড় করেছেন। পরে হয়তো সেই সংগ্রহ দান করেছেন কোনও সংগ্রহশালা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গড়ে উঠেছে পুঁথির সংরক্ষণ-কেন্দ্র।

আজ হয়তো খোঁজ করলে দেখব কত পুঁথি শোভা পাচ্ছে পরম যত্নে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা মিউজিয়ামের এয়ার কন্ডিশন্ড ঘরে। আর মাইক্রোফিল্মও হয়তো তোলা হয়ে কৌটোবন্দী হয়ে আছে কোনও বিদেশের লাইব্রেরিতে। কিন্তু ক'জন জানে তার সংগ্রহের পিছনের ইতিহাস!

ফোটো : কৌশিক মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার গণপতি হিরের চোখ

চা খেতে-খেতে আরও কিছুক্ষণ মউয়ের সঙ্গে গল্প করল শুভঙ্কর। ওর মায়ের সঙ্গেও দু-চারটে কথা বলল। খুবই নিরীহ প্রকৃতির ভদ্রমহিলা। কিন্তু তাঁর মেয়ে যে কী করে এত ডানপিটে হল তা যেন ভাবা যায় না।

মউদের বাড়ি থেকে ফিরে শুভঙ্কর আপন মনেই ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিকে। শালবনের ভেতরে ঢুকে আদিবাসী মেয়েদের শালবীজ সংগ্রহ দেখল। কেউ-বা পাতা কেটে গোছ করছে। দোকানে দোকানে যাবে এগুলো। ও তাদের সঙ্গে আলাপ করে মনের কোণে জমে থাকা অনেক প্রশ্নের উত্তর নিল। তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে গিয়ে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তিন্নি ওকে পাহাড় দেখাবে বলেছিল। বাসাডেরা বুরুডিপাস হয়ে নিয়ে যাবে বলেছিল ধারাগিরিতে ঝরনা দেখাতে। সেই তিন্নি এখন কোথায় কী করছে কে জানে ? আর বিল্টু ! সে কি বেঁচে আছে ? এইসব মনে হতেই মনে-মনে খুব ভয় পেল শুভঙ্কর। ও জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের দিকে চলল।

চারদিক ঘুরে অনেক বেলায় এসে স্নান-খাওয়া সেরে শুভঙ্কর যখন ওপরের ঘরে ঢুকল দুপুর তখন দুটো। দরজায় খিল দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা বাসী ফুলের মালাগুলো হাতে নিয়ে একটু গন্ধ শুঁকে সেগুলো দাদুর ছবির গলায় পরিয়ে বিছানায় এসে শুল।

সবে একটু তন্দ্রা মতন এসেছে এমন সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ। কে ? কে ডাকে ?

শুভঙ্কর উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই অবাক। মউ দাঁড়িয়ে আছে।

শুভঙ্কর একগাল হেসে বলল, "আরে তুমি ! আমি ভাবি কে না কে ?"

মউ গম্ভীর মুখে বলল, "তুমিই ডোবাবে। কী যে আছে কপালে তা ভগবান জানেন। তোমাকে নিয়ে কিছু করতে যাওয়াও যা, অথৈ জলে তলিয়ে যাওয়াও তাই।"

"কেন ? একথা বলছ কেন ?"

"কেন বলছি সেকথা বললেই তো রাগ হয়ে যাবে তোমার। তোমাকে না হাজারবার বলেছি কেউ দরজায় টোকা দিলে সাড়া না দিয়ে দরজা খুলবে না।"

"আরে সে তো রাতের বেলায়। এখন কী ?"

"কোনও সময়েই না। সাবধানের মার নেই একথা জানো না বুঝি ?"

"এসো, ভেতরে এসো।"

মউ ভেতরে ঢুকেই বলল, "শোনো, আজ এক্ষুনি আমাদের মূর্তি উদ্ধারের কাজে লেগে পড়তে হবে। তারপর প্রথম কাজ হবে বিল্টু ও তিন্নিকে খুঁজে বার করা। কাল আমি নদীর ধারে গিয়েছিলাম শুধুমাত্র ভিজে মাটির বুকে মোটরের চাকার দাগ দেখে। আমার মনে হয় ওরা ধরা পড়বার ভয়ে সড়ক পথে না গিয়ে জলপথে পাচার করেছে ওদের। আমি আরও খোঁজ নিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পড়ে গিয়ে মাথায় এমনই চোট পাই যে, কেমন যেন হয়ে যাই।" বলেই দরজায় খিল দিতে গেল।

শুভঙ্কর বলল, "খিল দেবার দরকার নেই। নীচের দরজাটা কি খোলা আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আগে ওটাকে বন্ধ করে দিয়ে এসো। না হলে হঠাৎ করে যদি কাকা-কাকিমা কেউ এসে পড়েন, তা হলে, তা হলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে।"

শুভঙ্করের বলা কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলে দু'জন লোক ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঢুকেই বলল, "একদম চেঁচাবে না। নীচের দরজা আমরা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। কাজেই কেউ আর ওপরে উঠবে না। এখন ভালয়-ভালয় লক্ষ্মী ছেলের মতো বলো দিকি, জিনিসটি কোথায় আছে ?"

শুভঙ্কর ওদের দু'জনকেই চিনতে পারল। ওরাই তো সেই কুখ্যাত শিকারি বাজের দলের লোক। ট্রেনের কামরায় যারা ছোরা হাতে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। বলল, "কী জিনিস ?"

"আরে ! তুমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে হয়ে কিনা এইরকম বোকার মতো প্রশ্ন করছ, কী জিনিস ? সে জিনিসটিই উদ্ধারের জন্য তোমরা এখানে এসেছ, সেই জিনিস। ওই সোনার গণপতি। যাঁর চোখ দুটো নাকি হিরের। দুর্লভ সামগ্রী। কী বলো ?"

"সে জিনিস কোথায় তা আমরা কী করে জানব ?"

"ওই ডায়েরির লেখা পড়ে আমরা কিন্তু সব কিছু জেনে ফেলেছি। অতএব আমাদের কাছে লুকিয়ে কোনও লাভ নেই।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "আরে ! কী বোকা তোমরা। ওটা তো পুরনো ডায়েরি। ও জিনিস কবেই উদ্ধার হয়ে গেছে। তোমরা ওই জিনিসের লোভে এসেছ নাকি ?"

"বাজে কথা একদম বলবে না। যদি তোমরা সত্যিই ওই জিনিসের ধান্দায় না এসে থাকো তা হলে কাল সারাটা দুপুর ধরে পাশের ঘরের প্লাস্টারগুলো খসালে কেন শুনি ?"

শুভঙ্কর ও মউ এ-কথার কোনও উত্তরই দিতে পারল না। এই শয়তান লোকগুলো যে ওদের এইভাবে ফলো করবে তা ওরা ভাবতেও পারেনি। ঘরের ভেতর চার দেওয়ালের মধ্যেই ওরা নিজেদের নিরাপদ মনে করেছিল। এখন ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর তাকিয়ে দেখল সেই লোক দুটোর দিকে। কী ভয়ানক চেহারা তাদের। একেবারে জল্লাদের মতো না হলেও ভয়ানক। দুর্ধর্ষ এবং বলবান। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। ওদের দু'জনের হাতেই রিভলভার। তারই নল দুটো ওদের বুকে ঠেকিয়ে বলল, "কোনওরকম ছল-চাতুরি না করে বলে ফ্যালো দেখি বাছাধনরা, আসল জিনিসটি কোথায় আছে ? না হলে কিন্তু বিপদ হবে। আমরা হয় সোনার গণপতি নিয়ে যাব, না হলে নিয়ে যাব তোমাদের দুটি তাজা প্রাণ। কিন্তু আমরা চাই না যে তোমাদের এমন সুন্দর চেহারা দুটি এত তাড়াতাড়ি চিতার আগুনে ঝলসে যাক।"

শুভঙ্কর বলল, "তোমরা বিশ্বাস করো, আমরা সত্যিই জানি না ও জিনিস কোথায় আছে।"

"তা যদি না-ই জানো তা হলে এই ঘরের ভেতর শাবল বাশুলা এগুলো এনেছ কেন?"

"আসলে ওই ডায়েরির লেখা পড়ে আমরাও ওগুলো খুঁজছি। তাই তো পাশের ঘরের প্লাস্টার খসিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি চারদিক। কিন্তু ও জিনিস যে আমরা পাইনি তা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ।"

"পেরেছি। এখন তা হলে ওই ঘর ভেঙেচুরে এই ঘরে হাত দিতে চলেছ তোমরা। ঠিক আছে। এ-ঘরের প্লাস্টার আমরাই ছাড়াব।"

এমন সময় নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে শোনা গেল পুণ্ডরীককাকার গলা, "শুভঙ্কর! শুভঙ্কর! দরজা খোলো।"

ঘরের ভেতর যারা ছিল তারা শুভঙ্কর ও মউকে বলল, "খুব সাবধান। চেঁচিয়েছ কি মরেছ।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু সাড়া না দিলে উনি যে অন্য রকম ভাববেন।"

একজন বলল, "ঠিক আছে। তুমি সাড়া দাও। জিজ্ঞেস করো, কী চাই?"

শুভঙ্কর ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে ডাকছেন কাকাবাবু?"

"হ্যাঁ। একবার নীচে এসো।"

"কী দরকার বলুন না?"

"তুমি নীচের দরজায় খিল দিয়েছ কেন? দারোগাবাবু এসেছেন। একবার দেখা করতে চান তোমার সঙ্গে।"

আগন্তুকদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবার। তবুও সাহস করে একজন বলল, "যাও। দেখা করে এসো। তবে সাবধান। ভুলেও যেন আমাদের কথা পুলিশকে বলবে না। তা হলে এখনকার মতো তুমি বাঁচলেও তোমার এই সঙ্গীটিকে কিন্তু আমরা মেরে রেখে যাব। বরং চেষ্টা করবে যাতে ওরা ওপরে না ওঠে।" বলেই অপর সঙ্গীকে বলল, "তুই এই মেয়েটাকে নিয়ে ছাদে চলে যা ভচু। গিয়ে শিকল তুলে দিবি। বাঁ দিকের আলসের সঙ্গে একটা নাইলনের ফিতে বাঁধা আছে। বেগতিক বুঝলে মেয়েটাকে গুলি করেই পালাবি।" বলে

শুভঙ্করকে বলল, "আমাদের সঙ্গে কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করবে না। যদি করো তা হলে দিনের আলোর মতো এই সত্যটুকু জেনে রেখো, তোমাদের দু'জন একটিমাত্র বুলেটের কৃপায় এক লহমায় একজন হয়ে যাবে। কেননা, পুলিশ যদি জানতে পারে আমরা এখানে আছি তা হলে ধরা আমরা পড়বই। আর ধরা যদি পড়ি তা হলে অপরাধ না করে ধরা পড়ব না।"

পুণ্ডরীককাকা আবার ডাকলেন, "শুভঙ্কর! একটু তাড়াতাড়ি এসো। এত দেরি করছ কেন? দারোগাবাবু অপেক্ষা করছেন।"

শুভঙ্কর বলল, "আজ্ঞে যাই।" বলে তরতরিয়ে নীচে নেমে গেল।

ভচু তখন মউকে টানতে-টানতে নিয়ে চলল ওপরের ছাদে। পাছে শুভঙ্করের ক্ষতি হয় সেজন্য মউ কোনওরকম বাধা দেবার চেষ্টা করল না। ভচু যাবার সময় তার সঙ্গীকে বলে গেল, "তুই ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখ কড়ি। যদি উলটোপালটা কিছু বলে তা হলে দিবি ডিসুম করে। তারপর যা হয় হবে।"

কড়ি বলল, "ওর ব্যাপারটা আমি দেখছি।" বলে শুভঙ্করের পিছু-পিছু এসে রিভলভার রেডি রেখে কান খাড়া করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দরজার আড়ালে। তারই ফাঁকে পালাবার পথটাও বেছে নিল। অর্থাৎ গুলি করেই দরজায় খিল দিয়ে উঠে যাবে ছাদে। তারপর ছাদের ওপর আর-একটা গুলি খরচা করে নাইলনের ফিতের সাহায্যে নেমে যাবে নীচে। পুলিশ যখন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে ওরা তখন শালবনের আগাছার ঝোপে লুকিয়ে রাখা বাইকটা নিয়ে পৌঁছে যাবে অনেক দূরে।

শুভঙ্কর নীচে নেমে বাইরে আসতেই দেখল একজন কনস্টেবলসহ দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। অনেকটা দূরে ঘেরা-পাঁচিলের দরজার কাছে অপেক্ষা করছে একজন ড্রাইভার, পুলিশের একটি জিপ নিয়ে। দারোগাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার! এত দেরি হল কেন? কী করছিলে ওপরের ঘরে?"

শুভঙ্কর বলল, "কিছু না। আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু।"

"যাক, ভাল কথা। তোমার বাবার সঙ্গে আমরা ফোনে যোগাযোগ করেছি। উনি সব শুনে তোমাকে বাড়ি চলে যেতে বলেছেন। তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলে এসো। সন্ধেবেলা ঘাটশিলা থেকে ডাউন ইস্পাত এক্সপ্রেসটা ধরিয়ে দেব তোমাকে। আমাদের একজন লোকও তোমার সঙ্গে যাবে।"

"কিন্তু।"

"কোনও কিন্তু নয়। হাওড়া স্টেশনে পুলিশের গাড়ি থাকবে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্য। তোমার জিনিসপত্র কী আছে নিয়ে এসো।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু আমার পক্ষে তো এখন এই মুহূর্তে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। আসলে আমি বড় ক্লান্ত। আজকের রাত্রিটুকু আমি এখানে বিশ্রাম নিই। তারপর কাল সকালে আমাকে যেখানে যেতে বলবেন যাব।"

"তা হলে শোনো, তোমার যাওয়া-না-যাওয়ার ব্যাপারটা এখন আর আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। ওপরওয়ালার হুকুম। আমরা পালন করছি মাত্র। তা ছাড়া এই পরিবেশে আর একটি রাতও তোমার একা থাকা ঠিক নয়। কিছু হলে আমরা অভিযুক্ত হব। অতএব···।"

"অতএব আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যেতে হবে। এই তো?"

"ঠিক তাই।"

শুভঙ্কর এই মুহূর্তে কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। এখন ওর চলে যাওয়া মানেই মউটাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যাওয়া। অথচ পুলিশকে আসল সত্য বলতে যাওয়াও বিপদ। শিয়রে শমন রিভলভারে গুলি পুরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

শুভঙ্কর ভেবে পেল না পুলিশ ওর বাবার সন্ধান কী করে পেল। ও তো একবারও ওর বাবার পোস্টিং কোথায় তা জানায়নি কাউকে। শুধু নামটুকুই যা বলেছিল। তাতেই এই? তা হলে এই পুলিশরা চোর-ডাকাত ধরতে এত ব্যর্থ কেন?

দারোগাবাবু বললেন, "তাড়াতাড়ি করো। আমার হাতে বেশি সময় নেই। তোমাকে ট্রেনে চাপিয়ে আমাকে একবার গালুডি যেতে হবে।"

"গালুডি কী?"

"সে একটা জায়গার নাম। ওখানে সাতগুড়ুম নদীর ধারে একটা লাশ পাওয়া গেছে। সেটার ব্যাপারে···।"

শুভঙ্কর কথা না বাড়িয়ে নীরবে মাথা হেঁট করে ঘরে ঢুকল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় বেশ বুঝতে পারল দরজার আড়ালে ওত পেতে থাকা কড়ি নামের সেই দুর্বৃত্ত রিভলভার বাগিয়ে নিঃশব্দে ওর পিছু-পিছু আসছে।

শুভঙ্কর ওপরে উঠেই বলল, "পুলিশকে তোমাদের কথা আমি কিছুই বলিনি।"

"শুনেছি। আমার মনে হয় এইটাই ভাল হল। এবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তবে সাবধান। এখান থেকে চলে গিয়েও রাস্তার মাঝখানে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পুলিশকে যেন এখানকার কথা ফাঁস করে দিও না।"

"জানি। তা হলে বদলা নেবার জন্য মউকে তোমরা বাঁচিয়ে রাখবে না এই তো?"

"ঠিক তাই। আজ সারারাত ধরে আমরা এই ঘর ভেঙেচুরে দেখব কোথায় লুকনো আছে সেই অমূল্য ধন।"

"মেয়েটার ব্যবস্থা কী করবে?"

"ওর ক্ষতি করার কোনও নির্দেশ আপাতত আমাদের ওপর নেই। ও যদি কোনও গোলমাল না করে তা হলে কাজ শেষ হলেই মুক্তি দেব ওকে।"

শুভঙ্কর বলল, "আচ্ছা, আমাদের সেই ছেলেমেয়ে দুটির খবর কী? ওরা কোথায় আছে? ওদের তোমরা নিয়ে গেলে কেন?"

"শিকারি বাজের হুকুম। তাই নিয়ে গেছি। এখানে আমাদের ইচ্ছেয় কিছু হয় না। উনি যা বলেন আমরা সেইমতো কাজ করি।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু কেন? কেন তোমরা ওর কথায় ওঠো-বসো?"

"সেটা কিন্তু আমরাও জানি না। তবে হুকুম মানতে মানতে কখন যে আমরা ওর আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি নিজেরাও টের পাইনি তা।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি তো দেখেছি শিকারি বাজকে। তোমাদেরও দেখছি। তখনও দেখেছি। এখনও দেখছি। ওর চেয়ে ঢের বেশি শক্তিমান তোমরা। আর শিকারি বাজ? সে তোমাদের চেয়ে অনেক দুর্বল।"

কড়ি হাঁ করে শুভঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শুভঙ্কর বলল, "তবু ওর পায়ে দাসখত লিখে দিতে তোমাদের বিবেকে বাধছে না?"

কড়ি বলল, "বাধে। তবে কী জানো, শিকারি বাজ এককভাবে আমাদের কাছে কিছু নয় যদিও, তবুও ও একটা ক্রিমিনাল। আমরাও তাই। তবে ওর লোকবল বেশি। কোথায় যে ছদ্মবেশে ওর কোন বন্ধু আত্মগোপন করে আছে তা তো জানি না। তাই আমরা ওকে ভয়ে ভক্তি করি।" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

Amcla-4 (24.1.90)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রুমুর কান্না

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রুমুর বন্ধু সোমা বেশ বড় অঙ্কের স্কলারশিপ পেয়ে হঠাৎ একদিন আমেরিকার এক নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি·এ·পড়তে চলে গেল। এতদিন রুমু জানত যে, ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে বি·এ· এম·এ·পাশ করে কী-একটা পরীক্ষা দিয়ে তবে ওদেশে পড়াশুনো করতে যায়, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক না দিয়ে এগারো ক্লাসে পড়তে-পড়তেই সোমা চলে গেল।

আমাদের মাধ্যমিকের মতো দিল্লি বোর্ডের আই সি এস সি পরীক্ষার পর সোমা এখান থেকে আমেরিকার প্রবেশিকা পরীক্ষা 'স্কলাসটিক অ্যাপ্টিচিউড' টেস্ট দিয়ে রেখেছিল। আর একরকম জোর করে রুমুকেও সেই পরীক্ষায় বসিয়েছিল। তারপর হয়তো বিদেশে যাবার ইচ্ছে ছিল বলে সোমা ওর বাবার সঙ্গে ঢাকায় গিয়ে 'ও লেভেল' পরীক্ষাও দিয়েছিল। এই দুটো পরীক্ষায় মোটামুটি ভাল করলে উচ্চ মাধ্যমিক না দিয়েই বিদেশে বি·এ· কিংবা বি·এসসি· এইরকম সব ক্লাসে পড়াশুনো করতে পারা যায়। আর মোটে তিন বছরের ব্যাপার।

আমেরিকায় গিয়ে সোমা অ্যাটল্যান্টা থেকে বেশ বড় একটা চিঠি লিখেছে রুমুকে। চিঠি পড়ে তো রুমুর চক্ষুস্থির। কী মজায় আছে সোমা! চিঠির প্যাডের কাগজটাই তো অপূর্ব! প্রত্যেক পাতায় ওর কলেজের তিন-রঙা ছবি আঁকা। ওর প্রোফেসররা চমৎকার

মানুষ। দেশ-বিদেশের ছাত্রছাত্রীরা এত ভাল আর ভদ্র যে, সোমার মনে হয় ওরা যেন ওর অনেক দিনের চেনা। এর মধ্যে অনেকেই ছুটিতে তাকে তাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছে। শার্লি নিয়ে যাবে ফ্লোরিডায়। মিনেসোটায় যেতে বলেছে লোরা। আর হনলুলু-হাওয়াই ঘুরে আসার কথা বলে রেখেছে আর্থার আর ম্যালামুদ।

সোমার চিঠি রুমু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেশ কয়েকবার পড়ল। পড়ে যেন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে চুপচাপ বসে থাকল বেশ কিছু সময়। কত দূরে হঠাৎ চলে গেল সোমা! রুমু ভাবল, কী ভাগ্য ওর। কত দেখছে ও, কত জানছে! পৃথিবীর কত দেশের কত ছেলেমেয়েকে ও নিতে পারছে নিজের মতো করে। এদেশে থাকলে যা ওর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। এসব ভাবতে-ভাবতে রুমু মনে-মনে বেশ অস্থির হয়ে উঠল। সেও তো স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশুনো করবার জন্য আমেরিকায় চলে যেতে পারে। রুমু লেখাপড়ায় সোমার চেয়ে অনেক ভাল। ইংরেজি কিংবা অঙ্কে সোমা ষাট-সত্তরের ঘরে নম্বর পেলেও কোনও পরীক্ষায় রুমুকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এই নামী স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বছরেই রুমু একেবারে প্রথম হয়ে এসেছে। স্কুলের সকলেই তাকে চেনে। তাকে ভালবাসে।

এইরকম সব নানা কথা ভেবে রুমু তার মাকে বলেই ফেলল, "মা, আমিও আমেরিকায় পড়তে যাব।"

রুমুর মা হেসে বললেন, "বেশ তো! আগে বি-এ পাশ কর, তারপর যাবি।"

"না মা, অত পরে নয়,আমি এখনই যাব 'ও লেভেল' দিয়ে।"

"স্কুলের পড়া শেষ না করে?"

রুমু বেশ জোর দিয়ে বলল, "সোমা যে গেল? আমি লেখাপড়ায় তো ওর চেয়ে ভাল।"

রুমুর মা বললেন, "তোর বাবা কী বলেন দ্যাখ।"

রুমুর বাবা সব শুনে হাসলেন। বললেন, "বেশ তো। যেতে চাস, যাবি। ও লেভেল পরীক্ষার জন্য তৈরি হ'। আমি তোকে ঢাকায় নিয়ে যাব।"

এই ও লেভেল পরীক্ষার ব্যাপারটা কিন্তু বেশ মজার। পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ইংল্যান্ড। কিন্তু যে-কেউ কলকাতায় বসেই পরীক্ষা দিতে পারে, যদি তার বাবা কূটনৈতিক চাকরিতে থাকেন কিংবা সে যদি ইংল্যান্ডের নাগরিক হয়। দুটোর কোনওটাই না হলে কলকাতা থেকে পরীক্ষা দেওয়া হবে না। তখন তাকে যেতে হবে ঢাকায়। সেখানে এইরকম নিয়ম-কানুন নেই। কেন নেই, কে জানে।

রুমু ওর বাবার সঙ্গে ঢাকায় গিয়ে ও লেভেল পরীক্ষা দিল। দারুণ রেজাল্ট করল। অঙ্কে পেল নব্বই আর ইংরেজিতে আশি। একজন কিশোরী বাঙালি মেয়ের পক্ষে বিদেশের একটা কঠিন পরীক্ষায় এত নম্বর পাওয়া যে খুব কৃতিত্বের কথা, তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

ইংল্যান্ডের কোনও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রুমুকে ঠিকই বি-এ পড়বার সুযোগ দেবে, কিন্তু তার একটুও ইচ্ছে নেই সেখানে যাবার। সে যেতে চায় আমেরিকায়। কারণ এই পরীক্ষায় ভাল করলে ইংল্যান্ডে শুধু পড়বারই সুযোগ দেয়, স্কলারশিপ-টিপ দেয় না। পড়তে হবে নিজের খরচে। অত টাকা কেন শুধু-শুধু খরচ করবেন রুমুর বাবা, যেখানে আমেরিকা তিন বছরের জন্য আংশিক স্কলারশিপ দিয়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল কলেজে পড়বার সুযোগ দিচ্ছে। বাবাকে তা হলে অনেক কম টাকা দিতে হবে।

ও লেভেলের রেজাল্ট জানিয়ে রুমু আমেরিকার কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়কে বি-এ পড়বার কথা লিখেছিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ওখানকার দু-তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় রুমুকে অভিনন্দন জানিয়ে ভর্তি করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। আংশিক স্কলারশিপের কথাও লিখল। সব চেয়ে বেশি অঙ্কের স্কলারশিপ দেবে দক্ষিণ আমেরিকার লুইসিয়ানা রাষ্ট্রের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।

লুইসিয়ানা রাষ্ট্রের নিউ অরলিনস্-এ রুমুকে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় চিঠির সঙ্গে তাকে লম্বা একটা লিস্ট পাঠিয়েছে। নিজের ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু জিনিস নিয়ে যেতে হবে রুমুকে। ছ'টা তোয়ালে, চারটে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়— তা ছাড়া ব্যাগ, সুটকেস, জুতো, মোজা, শাড়ি, চুড়িদার—আরও কত কী।

বাড়ির ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা শান্ত হাওয়া হঠাৎ গেল ঘুরে। হুলুস্থুলু পড়ে গেল। কারও যেন নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। পাসপোর্ট অফিসে ছোটাছুটি, ভিসার খবর নেওয়া, ট্রাভেল এজেন্টের কাউন্টারে ধরনা দেওয়া আর দরজিকে তাগাদা দেওয়া তো আছেই। তার ওপর যখন-তখন আসছে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব।

মা আর ছোট বোন ঝুমুর সঙ্গে রুমু রোজই কোনও না কোনও সময় বাজার করতে বেরোয়। জিনিসপত্র বয়ে আনবার সুবিধে হবে বলে রাধিকেও ওরা সঙ্গে নিয়ে যায়। নানারকম সওদা করে সকলে বাড়ি ফেরে বেশ ক্লান্ত হয়ে। এক-একদিন প্রচণ্ড বর্ষা ওদের ভীষণ মুশকিলে ফ্যালে।

রাধি এ-বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে আছে। তাকে রাখা হয়েছে সংসারের টুকিটাকি কাজ করবার জন্য। কতই বা বয়েস রাধির। তেরো-চোদ্দ হবে হয়তো। তবে খুবই কাজের মেয়ে রাধি। ছুটে-ছুটে দোকানে যায় বারবার। টিউবওয়েল থেকে কলসি-কলসি খাবার জল নিয়ে আসে। কখনও ক্লান্ত কিংবা বিরক্ত হয় না।

বোধহয় রুমুকেই রাধি সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তার কাছে রুমুদি যেন স্বর্গের দেবী-টেবির মতন। রুমু যখন একমনে পড়াশুনো করে কিংবা স্কুলে যাবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি মুখে পাউডার-টাউডার ঘষে, রাধি তখন সব কাজ ফেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে একমনে।

হঠাৎ রাধির দিকে চোখ পড়ে যায় রুমুর। সে হেসে জিজ্ঞেস করে, "কী রে রাধি, অমন হাঁ করে কী দেখছিস?"

রাধি আচমকা রুমুর প্রশ্ন শুনে একেবারেই অপ্রস্তুত হয় না। চোখ বড় করে তার মনের সত্যি কথাটাই বলে ফ্যালে, "রুমুদি, তোমাকে ঠিক দুর্গা-ঠাকুরের মতো দেখতে।"

রুমু মনে-মনে বেশ খুশি হলেও মুখে বলে, "বাজে বকিস না রাধি!"

"সত্যি বলছি রুমুদি। মা কালীর দিব্যি!" রাধি হলবল করে বলে যায়।

রুমু যে বিদেশে পড়াশুনো করতে যাচ্ছে, সে-কথাটা রাধির মাথায় ঢোকে না। এখানে-ওখানে ছুটোছুটি আর নানারকম জিনিসপত্র কেনাকাটার ধুম দেখে ও ধরে নেয় যে, তার রুমুদির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আর সে-আনন্দেই রাধি বিভোর হয়ে থাকে।

একদিন আর ধৈর্য ধরতে না পেরে রুমুকে সে স্পষ্টই বলে বসে, "রুমুদি, আমিও তোমার শ্বশুরবাড়িতে যাব। সেখানে কাজ করব। আমাকে নিয়ে যাবে তো?"

রুমু আসল ব্যাপারটা না বুঝে ফিক করে হেসে বলে, "ঠিক নিয়ে যাব।"

"বিয়ে কবে হবে রুমুদি?" রাধি উৎসুক চোখে রুমুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আর কতদিন বাকি?"

রুমু হাসি চেপে মনে-মনে কী হিসেব করে উত্তর দেয়, "বেশি না।

এই ধর, চার-পাঁচ বছর।"

রাধি চোখ বড়-বড় করে টেনে-টেনে উচ্চারণ করে, "চার-পাঁচ বছর!"

"হ্যাঁ রে," রুমু হেসে বলে, "লেখাপড়া শেষ করে আগে ঘুরে আসি আমেরিকা থেকে..."

রুমুর কথা শুনে রাধি কেমন যেন ঝিম মেরে যায়। ও বুঝতে পারে না অত পরে যদি বিয়ে, তা হলে এখনই এত কেনাকাটার ধুম কেন।

কিন্তু শিগগিরই একদিন রাধি বুঝতে পারল আসল ব্যাপার। দেখতে দেখতে রুমুর যাবার দিন এসে গেল। পরীক্ষায় তার আশ্চর্যরকম ভাল করার আনন্দ নিয়ে এল সংসারে অত দিনের জন্য দূরে চলে যাওয়ার ব্যথা। বাড়ির সকলেরই মন খারাপ। মা রুমুর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। ঝুমু রুমুর সঙ্গ যেন ছাড়তেই চায় না। ওর ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে যে, রুমুকে ছেড়ে একা-একা থাকতে হবে অত বছর। কখনও থাকেনি। তো দু'বোন ঠিক যেন বন্ধুর মতো, সব জায়গায় গেছে এক সঙ্গে—সিনেমায়, নেমন্তন্ন বাড়িতে, বিয়ের বরযাত্রী হয়ে। আর রুমুর বাবার হাসিখুশি মুটাও যেন বড় করুণ হয়ে আসে থেকে-থেকে।

ব্যাপার বুঝে রাধি একেবারে ভেঙে পড়েছে। বিয়ে-টিয়ে হবে না তার রুমুদির। অনেক দিনের জন্য দূর দেশে চলে যাচ্ছে রুমুদি। রাধি জানে না আবার কবে তাকে দেখতে পাবে। তার বুকের ভেতর হু-হু করে ওঠে। সে ভাল করে খায় না। কথা-টথা বেশি বলে না। চুপচাপ শুধু তাকিয়ে থাকে রুমুর দিকে। আর দেখতে-দেখতে তার দু' চোখ শুধু জলে ভরে ওঠে। কেউ কোথাও চলে গেলে যে খুব কাঁদতে হয়, ছোটবেলা থেকেই রাধি তা জানে। সে যখন গ্রাম ছেড়ে আসে তখন তার মা বুক চাপড়ে কেঁদেছিল।

রাধির অবস্থা দেখে রুমুরও বুকের ভেতর কীরকম করে ওঠে। সে এগিয়ে আসে রাধির কাছে। তার একটা হাত ধরে তাকে সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলে, "এই রাধি, কাঁদছিস কেন? বোকা মেয়ে?"

রুমুর কথা শুনে রাধি আর স্থির থাকতে পারে না। কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে, "ও রুমুদি, তুমি যেও না!"

রাধিকে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো মনে হয় রুমুর। সে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, "কাঁদিস না রে। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। কত জিনিস আনব তোর জন্য!"

গরিব মেয়ে রাধি। রুমু তার জন্য জিনিস আনবে শুনে একটু যেন শান্ত হয়। কান্না-কান্না গলায় জিজ্ঞেস করে, "কী আনবে?"

"বল না, কী চাস তুই?"

রাধি একটু ভেবে তার অনেকদিনের শখের কথা বলেই ফ্যালে রুমুকে, "একটা লাল মালা আনবে রুমুদি?"

রুমু হেসে বলে, "হ্যাঁ, আনব। মালা আনব। চুড়ি আনব। দুল আনব। সব লাল। ঠিক আনব।"

রাধি তখন চোখের জল মুছে ফেলে হাসল।

কিন্তু এখন অল্প হাসলে হবে কি, রুমুর যাবার দিন এয়ারপোর্টে গিয়ে রাধির হাঁ-হাঁ করে সে কী কান্না! রুমুর বাবা ম্লান মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মা রুমালে চোখ মুছছেন ঘনঘন। ঝুমু অনেক কষ্টে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। শুধু চিৎকার করে কাঁদছে রাধি। এয়ারপোর্টে আর যারা এসেছিল তারা সকলে তাকাচ্ছে তার দিকে।

রাধিকে দেখে রুমুরও কান্না পায়। সে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। বলে, "তোর জন্য লাল মালা আনব। চুড়ি আনব। দুল আনব। কাঁদিস না!"

অনুষ্ঠান

ঋক-ছন্দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঝিলি আর মিলি'র পুতুল-ঘরে কোনও একটি প্রাণী ঢুকে পড়েছে। তার মাথায় অনেক দুষ্টু বুদ্ধি। সে পুতুল-ঘরে ঢুকেই ওদের সুন্দর পুতুলগুলোকে ভেঙে তছনছ করছে। তা দেখে দুঃখে ভেঙে পড়ে ঝিলি আর মিলি। একসময় ঘুমিয়ে পড়ে দু'জন, ঘুমিয়েই স্বপ্নে দ্যাখে, পরিদের রানি তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রানি বলল, পুতুল-ঘরের বুড়োর দাড়িতে লুকিয়ে আছে দুষ্টু বুদ্ধি। দাড়ি উপড়ে ফেললেই দুষ্টু বুদ্ধি পালিয়ে যাবে। তারপর ঘুম ভেঙে যেতেই পরিদের রানির নির্দেশমতো বুড়োপুতুলের দাড়ি উপড়ে ফেলতেই অনুতপ্ত বুড়োপুতুলটি ক্ষমা চেয়ে নিল ঝিলি আর মিলি'র কাছে। তারপর আনন্দে মেতে উঠল সমস্ত পুতুলের সঙ্গে। এই হল লেকগার্ডেন্স-এর 'ঋক-ছন্দ' সঙ্গীত কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নৃত্যনাট্য 'পুতুল-ঘর'-এর গল্প। ২৩

ডিসেম্বর ১৯৮৯ বিড়লা অ্যাকাডেমিতে হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। সুপর্ণা দাসের পরিচালনায় এই নৃত্যনাট্যটি খুব মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। অংশগ্রহণ করেছিল প্রীতমনা, প্রিয়দর্শিনী, মিনি, রাজশ্রী, সঞ্চিতা, নীলাঞ্জন, রিদিমা, মুনমুন ও অনুরাধা। সঙ্গীতে অংশ নেন নমিতা ব্যানার্জি, শুভ্রা ঘোষ, রূপা মৈত্র, পি.এ. বিজয়লক্ষ্মী, ইন্দ্রাণী, রুবা, জিনা, লুনা, ঋতু, রাখী, স্বর্ণালী, কেকা, সুমিতা, শ্রীময়ী, শিল্পা, পারমিতা, সুচন্দা, শুচিস্মিতা, আর.পি. জয়রাম, ইন্দ্রজিৎ ও সঞ্জয়। সঙ্গতে ছিলেন ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, হরিশঙ্কর চৌধুরী ও গোপাল পুরকায়স্থ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দেবকিশোর ঘোষ। ঋক-ছন্দ সঙ্গীত কেন্দ্রটি পরিচালনা করেন মণিকা দাস।

থামে না রাধি। আরও জোরে কেঁদে উঠে বলে, "কিছু চাই না আমার। তুমি যেও না রুমুদি..."

এবার গেটের ওদিকে চলে যেতে হবে রুমুকে। মালপত্র ওজন করিয়ে পাসপোর্ট ভিসা দেখিয়ে নিয়মমতো যা করণীয় সব করতে হবে। সময় হয়েছে। মা-বাবাকে প্রণাম করল রুমু। ওঁরা তাকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছু সময়। ঝুমুকে আদর করল রুমু, রাধির গাল টিপে দিল। তারপর আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। রাধিও গেল তার সঙ্গে। কিন্তু সিকিউরিটির লোকেরা হেসে একটা হাত তুলে তাকে বাধা দিল।

বাধা পেয়ে রাধি আবার কেঁদে উঠল। এবার রুমুর মা বিরক্ত হয়ে তাকে বললেন, "এই রাধি, থাম। এরকম কেউ করে না এখানে।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

"তুমি যেও না রুমুদি..." রাধির আকুল কান্না শুনে এগিয়ে যেতে-যেতে বারবার পিছন ফিরে দেখল রুমু।

তারপর শেষ বর্ষার এক ভিজে-ভিজে বিকেলে যখন অনেক ওপরে উঠে গেল রুমুর প্লেন, তখনও থেকে-থেকে তার কানে বাজছিল, রাধির সেই বুক ভাঙা কান্না, "তুমি যেও না রুমুদি!"

পরদিন বেশ মন খারাপ করে রুমু ভয়ে-ভয়ে নামল অ্যাটলান্টায়। এখান থেকে আমেরিকার ঘরোয়া প্লেনে তাকে যেতে হবে নিউ অরলিনস্-এ। সেখানেই তার কলেজ। রুমু ছোট মেয়ে বলে আসবার সময় প্লেনে অনেকেই তার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করেছে। কেউ-কেউ এখানেও এসেছে। বেরোবার সময় মালপত্র ছাড়াবার ব্যাপারে তারা রুমুকে খুবই সাহায্য করল।

বাইরে এসে সোমাকে দেখে হাসি ফুটে উঠল রুমুর মুখে। এখানেই থাকে সোমা। যাক, ঠিকসময় সোমা তা হলে রুমুর চিঠি পেয়েছিল। সোমা ছুটে এল রুমুর কাছে। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, "হাই!"

রুমুও বলল। বলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সোমার দিকে। বেশ বদলে গেছে সে। তার কথাবার্তা বলবার ধরনও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

হাঁটতে-হাঁটতে রুমু সোমাকে বলল, "এখানে তো তুই এলি। নিউ অরলিন্স-এ নেমে কী করব?"

সোমা হেসে বেশ জোরে রুমুর পিঠ চাপড়ে দিল, "কিচ্ছু করতে হবে না তোকে। তোর ইউনিভার্সিটি থেকে গাড়ি নিয়ে লোক আসবে।"

সময় বেশি নেই। এক্ষুনি রুমুকে অন্য প্লেন ধরতে হবে। সোমা তার ফোন নম্বর দিয়ে বলল, "ফোন করিস। অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে। উইক এন্ডে মাঝে-মাঝে যাব তোর ওখানে। তুইও আমার এখানে এসে ছুটি কাটাবি।"

রুমু খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

নিউ অরলিন্স-এ প্রথম-প্রথম বড় মন খারাপ হত রুমুর। বিশেষ করে সন্ধেবেলা ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠত। মা-বাবা, ঝুমু, রাধি— এদের কথা বড় বেশি করে মনে পড়ত। কত দূরে চলে এসেছে রুমু! কত দিনের জন্য! আবার কবে ওদের সকলকে সে দেখতে পাবে!

কিন্তু ক্রমে এখানে নিজেকে মানিয়ে নিল রুমু। আর নিউ অরলিন্স শহরটাও ওর খুব ভাল লেগে গেল। রুমুর মনে হয় এখানকার আবহাওয়া, গাছপালা, রাস্তাঘাট ঠিক যেন কলকাতার শহরতলির মতোই। এপাশে-ওপাশে বড়-বড় গাছ। দূরে-দূরে লম্বা টানা হ্রদ। কোথাও-কোথাও ফাঁকা মাঠ। আর রুমু শুনেছে এখানকার ঠাণ্ডাও নাকি খুব ভারী নয়। কলেজ চত্বরের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের ডর্মিটরি। সংক্ষেপে বলে ডর্ম। কাফেটেরিয়াটাও বড়। টেলিফোনও আছে। এসব দেখেশুনে রুমুর মনে হল, এই অল্প সময়ের মধ্যে সে যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

এখানে এসে অনেকের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে রুমুর। ভারতবর্ষের একটিও মেয়ে নেই কিন্তু। শুধু পুনের একটি ছেলে আছে— নাম সুরেশ ভার্গব। সে বিজ্ঞানের ছাত্র। রুমুর বয়সী দুটো ফুটফুটে চিনে মেয়ে তার বাড়িরই আলাদা ঘরে থাকে। আর থাকে এলিজাবেথ। তার বাড়ি ক্যালিফোর্নিয়ায়। আর আছে অ্যান এবং জ্যাকলিন। কী সুন্দর দেখতে এরা! সকলেই রুমুকে খুব ভালবেসে ফেলল। তার শাড়ি আর চুড়িদারের দিকে এখানকার ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

প্রথম কয়েকদিন চারবেলা কাফেটেরিয়াতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছিল রুমু। কিন্তু শুধু খাবার জন্য এত দৌড়োদৌড়ি ওর একেবারেই ভাল লাগছিল না। তাই এলিজাবেথের সঙ্গে একটা ঘর ভাগাভাগি করে নিয়ে সে-ও তার ঘরে রান্না করতে শুরু করে দিয়েছে। একটু দূরেই মুদির দোকান। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রুমুও সেখানে যায় সারা সপ্তাহের জন্য বাজার করতে। আর ও অবাক হয়ে দ্যাখে, কী শস্তা সব জিনিসপত্র এদেশে! মোটে ডলার তিরিশ মতো লাগে রুমুর সারা সপ্তাহের বাজার খরচ। মাছ, মাংস, ডিম, মাখন আরও সব টুকিটাকি খাবার-দাবার ওই টাকাতেই কেনা হয়ে যায়।

এখন বাড়ির জন্য মন খারাপ করবার সময় খুব বেশি আর থাকে না রুমুর। পড়াশুনোর চাপ ভীষণ। তার ওপর ওকে ছুটে-ছুটে যেতে হয় অনেক জায়গায়। এখানে মা নেই। রাধিও নেই। রাধির কথা মনে পড়ে যেতেই রুমু একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ভাবে, ওর জিনিসগুলো আগে থেকেই কিনে রাখতে হবে। পরে ভুলে গেলেই মুশকিল।

এখানে রুমুকে একাই নিজের সব কাজ করে নিতে হয়। রান্না, বাসন ধোওয়া তো আছেই, তা ছাড়া লন্ড্রিতে যাওয়া, এটা-ওটা কেনাকাটা আর এখানে-ওখানে কত কারণে যাওয়া। সময় যে একেবারেই নেই রুমুর। কিন্তু সময় বয়ে যায় হুহু করে।

হয় তো ভারতবর্ষ থেকে এসেছে বলেই রুমুর কলেজের অধ্যাপকরা তাকে একটু বেশি স্নেহ করেন। এমনকী, মাঝে-মাঝে হাসি-ঠাট্টাও করেন তার সঙ্গে। রুমুর শাড়ির ঝলমলে রং আর চুড়িদার কামিজের বাহার দেখে এক প্রোফেসর তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অল্প হেসে একদিন বলেই ফেললেন, "তুমি তো খুব সুন্দরী হে!"

রুমু লজ্জা পেয়ে কোনওরকমে খুব আস্তে শুধু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ সার।"

প্রোফেসরের সামনে লজ্জা পেলেও রুমু ওর বোন ঝুমুকে ফলাও করে লিখল...

"শুধু প্রোফেসরই নয়, যে জমাদার রোজ আমাদের হস্টেলের সামনের রাস্তা ঝাঁট দেয়, সে আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলে, ইউ আর ভেরি প্রিটি ইনডিড!"

রুমুর দখল যেমন ইংরেজিতে, ঝুমুর তেমনি বাংলায়। তাই সে মজা করে রুমুকে বেশ ভাল বাংলায় উত্তর দিল—

"আপামর জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করা মহা সৌভাগ্যের কথা। ক'জন তা পারে! প্রোফেসর থেকে যে ঝাঁট দেয়—সকলে তোর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

মা-বাবাকে চিঠি লেখবার আগে রুমু কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়। বাইরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকে। রুমু জানে, সে যে

এতদূরে চলে এসেছে বলে মা-বাবার মন খুবই খারাপ। তাই রুমু তাদের শুধু ক্লাসে ভীষণ ভাল করবার কথা লিখে একটু খুশি করতে চায়।

"মা ও বাবা,

আমি তোমাদের ছেড়ে এত দূরে চলে এসেছি বলে আমার জন্য বেশি মন খারাপ কোরো না। এখানে আমি খুব ভাল আছি আর কলেজেও ভাল করছি। সব প্রোফেসর আমাকে চিনে গেছেন, কারণ ক্লাসের প্রত্যেকটি টেস্টে আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছি।

"একদিনের কথা শুনলে তোমরা খুবই খুশি হবে। কী হয়েছে শোনো। ক্লাসে বসে একদিন একটা 'এসে' লিখতে হল। পুরো নম্বর ষোলো। কিন্তু প্রোফেসর আমার খাতায় দিলেন সতেরো নম্বর। উনি ভুল করেছেন ভেবে খাতাটা খুলে ওঁর কাছে নিয়ে যেতেই প্রোফেসর হেসে আমাকে বললেন, 'তোমার লেখা ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হয়েছে বলে আমি আরও এক নম্বর বোনাস্ মার্ক হিসেবে দিয়েছি।'"

এই রকম ক্লাসে সকলের চেয়ে প্রায়ই ভাল করবার কথা রুমু লেখে তার মা-বাবাকে। আর ভারতবর্ষের একটি মেয়ের এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা ভেবে কলেজসুদ্ধু সকলে যখন তার প্রশংসা করে, তখন বাড়ির কথা বড় বেশি করে মনে পড়ে যায় রুমুর। রাধির কথাও। মাকে আলাদা করে লিখে রুমু জানতে চায় রাধি এখনও তার জন্য কান্নাকাটি করে কি না। করলে মা যেন বারণ করেন তাকে কাঁদতে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে যেন বলেন, রুমুদি লিখেছে আসবার সময় তোর সব জিনিস ঠিক-ঠিক নিয়ে আসবে। আসবার দিন কলকাতার এয়ারপোর্টে হাঁ-হাঁ করে রাধির বুক ভাঙা কান্নার কথা কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না রুমু।

প্রথম সেমিস্টার শেষ হয়ে গেল। বড়দিনের ছুটি হল। রুমু ছুটি কাটিয়ে এল সানফ্রানসিসকোয় এলিজাবেথদের বাড়িতে। ওকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল এলিজাবেথ। খুব হইচই হল বড়দিনের রাতে। চমৎকার মানুষ এলিজাবেথের মা-বাবা। রুমুকে দেখে ওরা খুবই খুশি হল। সানফ্রানসিসকোয় অনেক ছবি তোলা হল। রুমু সব পাঠিয়ে দিল মা-বাবাকে।

সময় বয়ে যায় হু-হু করে। গ্রীষ্মের ছুটি হল। তারপর আবার এল বড়দিন। কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে বেড়াতে গিয়ে এর মধ্যে রুমু দেখে নিয়েছে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, ফ্লোরিডা, উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার কত ছোট-বড় শহর। অনেক ছবি তুলেছে ও।

তারপর একদিন রুমুর স্কলারশিপের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে কোথা দিয়ে যে তিন বছর কেটে গেল রুমু বুঝতেই পারল না। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পরীক্ষায় আশ্চর্য রকম ভাল করেছে রুমু—এত ভাল যে একটা স্থানীয় খবরের কাগজে তার ছবিও বেরিয়ে গেছে। বড়-বড় করে লেখা, 'ভারতীয় ছাত্রীর কৃতিত্ব'। মা-বাবা আর সকলকে দেখাবার জন্য রুমু কয়েক কপি কাগজ কিনে সুটকেসে ভরে নিয়েছে।

বাড়ি ফিরে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। আবার কেনাকাটা, গোছগাছ আর এয়ার এজেন্টের অফিসে যাওয়া-আসা। এখানে মা-বাবা আর ঝুমু না থাকলেও অনেক বন্ধুবান্ধব আছে রুমুর। তারা তার পাশে-পাশে থেকে সবসময় সাহায্য করছে।

আমেরিকার ছেলে ব্রুক রুমুকে বলে, "এখনই কেন ফিরে যাচ্ছ? এম.এ করে যাও।"

অ্যান বলে, "তুমি চলে যাবে বলে খারাপ লাগছে। তোমাকে আমরা খুব পছন্দ করি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ অ্যান," পরে ব্রুসের দিকে তাকিয়ে রুমু বলে, "মা-বাবাকে অনেকদিন দেখিনি তো। আমি খুব চেষ্টা করব এখানে এসে তোমাদের সঙ্গে এম.এ পড়তে।"

অ্যান আর ব্রুক দু'জনেই বলে, "প্লিজ ডু।"

তারপর কত যে কেনাকাটা করল রুমু। বাবার জন্য কিনল দামি-দামি শার্ট। সুটের কাপড়। দু-দুটো শেভিং সেট। মা'র জন্য কিনল নকল মুক্তোর অনেক গয়না আর ঝুমুর জন্য কয়েক শিশি খুব ভাল পারফিউম, আরও কত জিনিস। আর রাধির কথা তো মনে আছেই রুমুর। তার জন্য যা-যা নিয়ে যাবে বলে এসেছিল—লাল মালা, চুড়ি আর দুল— রুমু একটু বেশি দাম দিয়ে একটা ঝকমকে বাক্সসুদ্ধু সেইসব কিনল।

এসে গেল রুমুর ঘরে ফেরার দিন। ওর বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্রোত বয়ে যায়। ঘরে ফেরার আনন্দ আর এ-দেশ ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ— এই দুই অনুভূতি রুমুকে কখনও অস্থির, কখনও বিষণ্ণ করে তোলে। এখানকার অধ্যাপকদের স্নেহ, কত বিদেশী বন্ধুর ভালবাসা—সবই যেন ঢেকে যাবে থমথমে কুয়াশায়। ওই দূরের হ্রদ, গাছপালা, ফাঁকা মাঠ আর তো দেখতে পাবে না রুমু। সব দেখার, সব পাওয়ার এইবার হয়ে যাবে শেষ। তাই রুমুর বুকের কাঁপন দ্রুত হয়। দু' চোখ ভরে ওঠে জলে।

পরেই রুমুর মনে পড়ে মা-বাবার কথা। ঝুমুর কথা। তাদের বাড়ির এক-একটি ঘর ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। মনে পড়ে রাস্তার ধারে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছ। রেসকোর্সের সেই টানা লম্বা পাঁচিল। আর চোখ বন্ধ করে সে অনুভব করে গ্রীষ্মের ভরা বিকেলের সেই হু-হু হাওয়া। বর্ষার ঝমঝম বৃষ্টি। আর পুজোর এক-একটি থরোথরো সকাল আর সন্ধ্যার কথা ভেবে এত পরে রুমুর মন কেমন করে। কত দিন পুজো দ্যাখেনি সে!

কলকাতাকে রুমু যে কত ভালবাসে তা তো আগে কখনও এমন করে বুঝতে পারেনি। তার মনে হয়, এই তো সেদিন সে যেন এল এখানে। সেই এয়ারপোর্ট। রাধির সেই কান্না। এখান থেকে যাবার সময় রাধির মতো অমন বুকভাঙা কান্না কেউ তো কাঁদবে না তার জন্য। রুমু আর-একবার ভাল করে দেখে নেয় রাধির জন্য কেনা লাল মালা, দুল আর চুড়ির বাক্স। সেটা সবচেয়ে ওপরে রেখে ও সুটকেস বন্ধ করে দেয়।

নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগেই রুমুর প্লেন নামল কলকাতার বিমান বন্দরে। এখন এখানে কড়া গ্রীষ্ম। আজ কিন্তু তেমন গরম নেই। মেঘলা আকাশ। পরে হয়তো বৃষ্টি নামবে।

মাটিতে পা দিয়েই রুমুর শরীর খুশিতে যেন রিমঝিম করে উঠল। আবার সে ফিরে এল তার সেই কলকাতায়। হাসি ফুটে উঠল রুমুর মুখে। ভারী হ্যান্ডব্যাগ কোনওরকমে সামলে মুখ তুলে হঠাৎ সে তার বড় চেনা আকাশ দেখে নিল একবার।

বিরাট প্লেন। অনেক প্যাসেঞ্জার। কাস্টমস্ দপ্তরে পৌঁছতে বেশ সময় লাগল রুমুর। তার আর ধৈর্য ছিল না। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসতে রুমুর খুব বেশি দেরি হল না। অল্প বয়েসী ছাত্রী দেখে কাস্টমস-এর লোকেরা তার সুটকেস-টুটকেস খুলিয়ে তছনছ করল না, শুধু হেসে জিজ্ঞেস করল, "বলবার মতো কিছু আছে কি?"

রুমুও হাসল, "কিচ্ছু না অফিসার।"

মা এয়ারপোর্টেই বুকে চেপে ধরলেন রুমুকে। বাবার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। রুমু বলল, "কী রোগা হয়ে গেছ তুমি বাবা!"

খুশি-খুশি মুখে ঝুমু দেখছিল রুমুকে। একটু পরে বলল, "তুই

বেশ মোটা হয়েছিস তো।"

রুমু হেসে বলল, "নজর দিস না ঝুমু।"

এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক সময় লাগল। রবিবারের দুপুর। লোকজন গাড়ি-টাড়ি বেশি নেই রাস্তায়। তা হলেও এত দেরি! এতদিন পর দেশে ফিরে ছেলেমানুষের মতো হয়ে উঠেছে রুমু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কত কথাই যে বলে চলেছে!

"এই ঝুমু, জানিস তোর জন্য কী এনেছি? ছ' ছ'টা পারফিউম। একটা রিস্টওয়াচ। চারটে চকোলেটের বড় বাক্স। মা, তোমার জন্য দারুণ-দারুণ ডিজাইনের গয়না এনেছি। আর বাবা, তোমার জন্য— থাক, এখন বলব না। বাড়ি গিয়ে দেখাব।"

মা রুমুর পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে অল্প হেসে আস্তে বললেন, "আমার জন্য আবার অত গয়না-টয়না আনতে গেলি কেন রে, রুমু? আমার কি আর ওসব পরবার বয়েস আছে!"

মা'র কথা শুনে রুমু হঠাৎ ঠিক আমেরিকার মেয়েদের মতো দু' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, "ও মামি, এসব বোলো না।"

রুমুর মনে হল বাইরে থেকে অনেক পরে দেশে ফিরলে চারপাশের সব কিছু আগের চেয়ে যেন আরও বেশি ভাল লাগে। গাড়িতে বসে দূর থেকে নিজেদের সেই বাড়িটা দেখে একটা মধুর উত্তেজনা ফেনিয়ে উঠল তার বুকের মধ্যে। হাওয়ায় মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। গলা ফুলিয়ে ছাই রঙের দুটো পায়রা এদিক-ওদিক করছে আরতিকাকিমাদের ছাদের কার্নিসে। একটা বাড়িতে জোরে গান বাজছে। এসব আজ রুমুর ভীষণ ভীষণ ভাল লাগল।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতেই সামনের দোতলা আর তিনতলার বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে দোলাবউদি আর খুকু প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, "এই রুমু, কনগ্রাচুলেশনস্! সন্ধেবেলা যাব।"

"এসো," রুমু ওপরে তাকিয়ে হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

এতদিন পরে নিজের বাড়িতে ঢুকে রুমুর তন্দ্রার মতো মনে হল। যাবার সময় যেমন রেখে গিয়েছিল সব ঠিক তেমনই আছে। ওর পড়ার টেবিলের ওপর সরস্বতীর সাদা রঙের বেশ বড় মূর্তি। পাশেই সোনালি ফ্রেমে রবীন্দ্রনাথের ছবি। আর এপাশে-ওপাশে থরে-থরে সাজানো বই আর বই! এসব যেন প্রথম দেখছে এমন ভঙ্গিতে রুমু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত।

তারপর শোবার ঘরে এসে শাড়ি-টাড়ি না বদলে ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল রুমু। বসে পড়ে ওর বড় সুটকেসটা টেনে চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেলল।

রুমুর মা বিব্রত হয়ে বললেন, "আহা, এইমাত্র তো এলি। এখনই এত ব্যস্ত হওয়ার কী দরকার। সুটকেস-টুটকেস থাক না এখন। খেয়ে-টেয়ে একটু বিশ্রাম করে নে আগে।"

ঝুমুর দিকে তাকিয়ে হাসল রুমু। বলল, "দেখি না সব জিনিস ঠিক-ঠিক এসেছে কি না।"

কয়েকটা শাড়ি-ব্লাউজ সরিয়ে প্রথমেই রুমু হাতে তুলে নিল ঝকমকে সুন্দর ছোট একটা বাক্স। সেটা খুলতেই সকলে দেখল তার মধ্যে ঝলমল করছে লাল মালা, দুল, আর চুড়ি।

সেসব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে আপনমনেই হাসল রুমু। পরে চিৎকার করে ডাকল, "রাধি! এই রাধি—" কারও সাড়া না পেয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "দোকানে-টোকানে বুঝি পাঠিয়েছ রাধিকে? কী করছে এতক্ষণ ধরে?"

রুমুর কথা যেন ওর মা বুঝতে পারলেন না। বললেন, "কী বলছিস? কাকে ডাকছিস তুই?"

রুমু হেসে ওর মাকে সেই ঝকমকে বাক্স দেখিয়ে বলল, "রাধির জন্য এনেছি। দ্যাখো, কী সুন্দর! ওর খুব পছন্দ হবে।" মালাটা হাতের ওপর মেলে দেখতে-দেখতে ও বলল, "আমি যেদিন যাই, খুব কাঁদছিল বেচারি। আমি আজও তা ভুলিনি মা।"

এবার রাধিকে মনে পড়ে গেল রুমুর মা'র। চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়ে তিনি কাটা-কাটা স্বরে বললেন, "ও রাধি! বড় অবাধ্য মেয়ে। কাজে-কর্মে একেবারেই মন ছিল না। কবে ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছি!"

"ছাড়িয়ে দিয়েছ?" রুমুর গলায় কান্না ঠেলে উঠল, "রাধি এ-বাড়িতে আর নেই?"

"কাজের লোকেরা কি চিরকাল থাকে রে?" রুমুর মা হেসে বললেন, "তোরও যেমন কাণ্ড! এত কেনাকাটা করতে গেলি কেন ওর জন্য শুধু-শুধু?"

রুমুর মা'র কিছু কথা ওর কানে গেল, কিছু গেল না। রাধির জন্য আনা সেই বাক্সটা খুব শক্ত করে সে শুধু চেপে ধরল। চারপাশ অন্ধকার—অন্ধকার লাগছে যেন। রুমুর দু' চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

যাবার দিন খুব কাঁদছিল রাধি। আমেরিকায় বসে কতবার রুমু ভেবেছে দেশে ফিরে রাধির মুখে সে হাসি ফুটিয়ে তুলবে। কিন্তু তা আর পারল না রুমু। রাধির কান্না-ভেজা মুখটাই তার মনে আঁকা হয়ে থাকল। দেশে ফিরে আজ রুমুই কাঁদছিল রাধির জন্য। তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে যাচ্ছিল। আর রুমুর এই কান্নার মানে বুঝল না বাড়ির কেউ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মাঘ মাসের আকাশ

অরূপরতন ভট্টাচার্য

[১৮ মাঘ রাত্রি এগারোটা, ২৫ মাঘ রাত্রি সাড়ে দশটা, ও মাসের শেষে রাত্রি দশটার আকাশপট—আমাদের অঞ্চলের আকাশসঙ্গী।]

শীতের মাসগুলি আকাশ চেনার আদর্শ সময়। তা ছাড়া এই সময় রাতের প্রথম প্রহরে আকাশে উজ্জ্বল তারার সমাবেশ লক্ষ করার মতো। মাঘ মাসের শীতের রাতে পরিষ্কার আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিশিষ্ট কত তারা আর তারকামণ্ডলের সমাবেশ চোখে পড়ে। এরই ভেতর দিয়ে ছায়াপথ চলে গেছে ব্রাহ্মণের উপবীতের মতো উত্তর-পশ্চিমের আকাশ থেকে অনেকটা মাঝ আকাশ হয়ে প্রায় দক্ষিণ-পূর্ব দিগন্তের কাছাকাছি। মেঘবিহীন অন্ধকার আকাশে এই ছায়াপথও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

এ-মাসের দিনগুলিতে সন্ধের অন্ধকার খানিকটা ঘন হয়ে আসার পরে আকাশপটে যে তারকামণ্ডলটি সকলের আগে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তার নাম কালপুরুষমণ্ডল।

শশ

আকাশপটে সব তারকামণ্ডল তাদের নিজস্ব রূপটি নিয়ে ফুটে উঠেছে। কত উজ্জ্বল তারকা মাথার ওপরের আকাশে! এরই মধ্যে কালপুরুষ তার আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর। একটা আশ্চর্য সংহত রূপ কালপুরুষমণ্ডলের। আকাশপটে উজ্জ্বল অনেক তারকামণ্ডলের মধ্যে প্রথম চেষ্টাতেই চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না।

পৌষ মাসেও কালপুরুষমণ্ডলকে সবাই দেখেছি। কিন্তু রাত ঘন হয়ে আসার আগে সে ছিল আকাশের পূর্ব দিকে, পূর্ব দিগন্ত ছেড়ে খানিকটা ওপরে। এ-মাসে রাত একটু গভীর হয়ে আসার সময়ে তাকে নজরে আসবে মাথার ওপরের আকাশে, তবে কিছুটা দক্ষিণ ঘেঁষে। উজ্জ্বল তারা বাণরাজাকে নিয়ে যোদ্ধার বেশে। কালপুরুষকে আকাশপটে একবার চিনলে আর ভুল হওয়ার কথা নয়।

পূর্ব আকাশ থেকে কালপুরুষ উঠে আসার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রহ্মহৃদয়কে নিয়ে অরিগা (Auriga) মণ্ডলও এ-মাসের প্রথম রাত্রে মাথার ওপরে নজরে আসবে। তবে কালপুরুষ আছে ছায়াপথের দক্ষিণে, আর অরিগা ছায়াপথের একেবারে ওপরে। অরিগা মণ্ডলে আছে আকাশের একটি অতি উজ্জ্বল তারকা ব্রহ্মহৃদয়। এটির বিদেশী নাম ক্যাপেলা (Capella), আছে মণ্ডলটির অনেকটা উত্তর-পশ্চিম দিকে। খালি চোখে আকাশে যত তারা দেখা যায়, এটি তার মধ্যে ষষ্ঠ উজ্জ্বল তারকা। অতি উজ্জ্বল এই তারকাটি আছে প্রায় ৪০ আলোকবর্ষ দূরে।

ব্রহ্মহৃদয়ের ঠিক পূর্ব দিক বরাবর আর-একটি তারকার কথা বলতে হয়। এটি ব্রহ্মহৃদয়ের মতো অতটা উজ্জ্বল নয়, তবে এটিরও বৈশিষ্ট্যের কথা বলবার মতো। এই তারাটির নাম মেনকালিনান (Menkalinan)। এ-তারাটিকে আমরা একটি তারা বলছি, কিন্তু এতে আসলে আছে দু'টি তারকা, পরিচয়ে এ যুগ্ম তারকা। এই দু'টি তারার একটি আর একটিকে ঘিরে আবর্তন করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে এদের ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তনও নজরে আসছে। এ-তারাটি যে ধরনের তারা, তাতে এর আবর্তনের পর্যায় দু' দিনের বেশি হতে হবে। তা ছাড়া পরস্পরকে ঘিরে আবর্তনের সময়ে একের ওপরে অন্যের গ্রহণও লাগবে। সেই সঙ্গে যুগ্ম তারার দু'টি তারাই সচরাচর সূর্যের চেয়ে অনেক বড় হবে আর একের চেয়ে অন্যের ঔজ্জ্বল্যের হেরফেরও থাকবে রীতিমত। ব্রহ্মহৃদয়ের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমের তারাটিও ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে পরিবর্তনশীল। এটিও একটি যুগ্মতারা—বর্ণালী বিশ্লেষণে এর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এর দুটি তারার একটি চেহারা ছবিতে দৈত্যাকার।

অরিগামণ্ডলের যে তিনটি তারার কথা বলা হল, তাতে ব্রহ্মহৃদয়কে মাঝে রেখে ছায়াপথের ওপরে একটা সুন্দর উলটো V তৈরি করা চলে।

অরিগা মণ্ডল

গ্রিক পুরাণে অরিগামণ্ডলকে একটি রথচালকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তারকাচিত্রেই বলবান এক মানুষের কাঁধে দুটি ছাগশিশু সমেত একটি মা-ছাগলকে দেখতে পাওয়া যায়। পুরাণে আছে, দেবতা ভালকানের পুত্র হল অরিগা। শারীরিক গঠনে তার খুঁত থাকায় সে এক চার চাকার রথ তৈরি করে, তাতে চেপে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত। বৃহস্পতি তাকে এজন্য আকাশের একটি তারকামণ্ডল পুরস্কার দেন। পুরাণে এভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে আকাশে কত তারকামণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। অরিগামণ্ডলের পাঁচটি উজ্জ্বল তারকায় পৌরাণিক এই রথটির কল্পনা করা চলে।

অরিগামণ্ডলের দক্ষিণ প্রান্তের তারকাটিকে নিয়ে শুরু হয়েছে আর-একটি উজ্জ্বল তারকামণ্ডল। এটি একটি রাশি। গত মাসে আমরা রাশিচক্রের শুরুর রাশি মেষকে চিনেছি। মেষ অনুজ্জ্বল তারায় গঠিত, সেইজন্যে সব সময়ে তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু দ্বিতীয় রাশি বৃষ এদিক দিয়ে

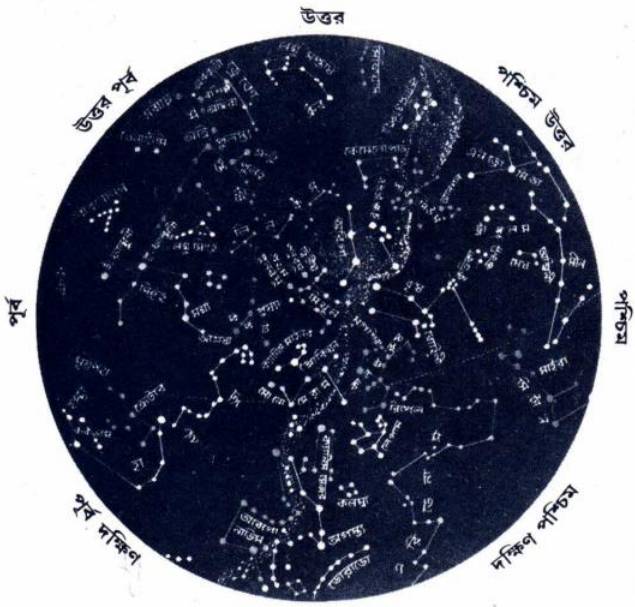

ছবি : পরমেশ পুরকায়স্থ

অসাধারণ। উজ্জ্বল তারায় তারায় ঠিক বৃষের আকৃতি, কল্পনার বেশি রং লাগাতে হয় না। বৃষরাশির পাশ্চাত্য নাম টরাস (Taurus)। আকাশে কালপুরুষমণ্ডল আর অরিগা মণ্ডলের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এই বৃষ রাশিটি নজরে আসবে।

বৃষ রাশির সুন্দর আকৃতির মধ্যে সর্বোজ্জ্বল তারাটি আছে বৃষের মুখে। ওখানকার অন্যান্য তারকায় বৃষের মুখ সহজে কল্পনা করে নেওয়া যায়। মাথা থেকে দুটো ধারালো শিং চলে গেছে পূর্ব দিকে। উজ্জ্বল তারায় শিং দুটিও স্পষ্ট। বৃষের মুখের এই উজ্জ্বল তারাটি, এটি যে বৃষের শুধু সর্বোজ্জ্বল তারকা তা-ই নয়, আকাশে খালি চোখে প্রথম যে কুড়িটি উজ্জ্বল তারকা দেখা যায়, তার মধ্যে ওই তারাটির নিজেরও একটি আসন আছে। ওই তারাটি আকাশের ত্রয়োদশ উজ্জ্বল তারকা, বিদেশী নাম আলডিবারান (Aldebaran)। কালপুরুষমণ্ডলের আর্দ্রা ছিল খালি চোখে দেখা দ্বাদশ উজ্জ্বল তারকা, এটি ত্রয়োদশ। বাংলায় এই লাল, দানবাকৃতি তারাটি রোহিণী নামে আমাদের অনেকের কাছেই পরিচিত। এই তারাটিরও ঔজ্জ্বল্যের হেরফের হয় এবং এটি একটি যুগ্ম তারকাও।

বৃষ রাশির রোহিণী তারাটিতে (যেখানে ইংরাজি V আকারের একটি তারকাপুঞ্জ আছে) প্রায় দু'শো তারার সমাবেশ। রোহিণী পড়ে ওই পুঞ্জের দৃষ্টিপথেই, কিন্তু সে ওই পুঞ্জের ভেতরকার তারকা নয়। রোহিণী আছে তার তুলনায় অনেক কাছে। এই পুঞ্জটির নাম হাই-এডিস (Hyades)। এর বয়স হবে প্রায় ৫০ কোটি বছর, দূরত্ব দেড়শো আলোকবর্ষের মতো। রোহিণী তারাটিকে নিয়ে রোহিণীর নামেই আছে ভারতীয় জ্যোতিষের একটি নক্ষত্র, চাঁদের এক স্ত্রী। অশ্বিনী থেকে শুরু করে এটি হল চতুর্থ নক্ষত্র।

রোহিণীকে নিয়ে বৃষ রাশিকে দেখার সময়েই বৃষ রাশির মধ্যে বৃষের পশ্চিম প্রান্তে আর-একটি, চেহারায় একটু অন্য রকমের, তারকামণ্ডল এক নজরে ধরা পড়বে। এটির নাম কৃত্তিকা। এই মণ্ডলের তারাগুলি কিন্তু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই আকাশপটে, আছে কাছাকাছি ঘন হয়ে। একগুচ্ছ আঙুর ফলের মতো চেহারাটা— উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল ক'টি তারার সমাবেশ যেন। মণ্ডলটিতে তারার সংখ্যা কত ? সহজ দৃষ্টিতে ছয়, কিন্তু দৃষ্টি যদি ভাল হয়, তা হলে এই মণ্ডলে আরও একটি তারা তোমাদের নজরে আসতে পারে। তখন সেখানে সাতটি তারকা। বাংলায় এই মণ্ডলটির একটা আটপৌরে নাম আছে। সেটি হল 'সাত ভেয়ে' বা 'সাত ভাই চম্পা'। এটির বিদেশী নাম প্লিডিস (Pleiades)।

কৃত্তিকামণ্ডলে খালি চোখে সাতটি মাত্র তারা দেখা গেলে কী হবে, আসলে এটিতে তারকার সংখ্যা ৩০০০-এর মতো হতে পারে। দূরত্ব প্রায় চারশো আলোকবর্ষের মতো। এই তারাগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে উজ্জ্বল, সেটির নাম দেবসেনা, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে অ্যালসাইয়োন (Alcyon)। খালি চোখে নজরে আসার মতো অন্য পাঁচটি তারার নাম প্রীতি, লজ্জা, সন্নতি, সম্ভূতি, অনসূয়া।

কৃত্তিকাকে নিয়েও আছে চাঁদের ২৭ বউয়ের এক বউ, চান্দ্র-তিথির ২৭ নক্ষত্রের এক নক্ষত্র। এটি হল তৃতীয় নক্ষত্র। কৃত্তিকার সামান্য পশ্চিমে মেষ রাশির তারায়-তারায় অনুজ্জ্বল ভরণী, চান্দ্র-তিথির দ্বিতীয় নক্ষত্র। ভরণীরও একটু পশ্চিমে মীনের গা ঘেঁষে মেষের তারা নিয়ে গঠিত প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনীর মতোই অনেকটা এই নক্ষত্র— চেহারায় ম্লান, পরিসরেও বিস্তৃত নয়। ভরণীকে দেখতে হলে একটা ছোট ত্রিভুজের খোঁজ করতে হবে।

এখন **সন্ধের অন্ধকারে** অস্তে চলেছে পেগাসাস আর এনড্রোমিডামণ্ডল, সেই সঙ্গে রয়েছে রেবতী নক্ষত্র আর সিটাসমণ্ডল। মাঝের আকাশে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর উজ্জ্বল মণ্ডলগুলি লক্ষ করার মতো। ব্রহ্মহৃদয়কে নিয়ে অরিগা ; রোহিণী, কৃত্তিকাকে নিয়ে বৃষরাশি ; আর্দ্রাকে নিয়ে কালপুরুষমণ্ডল— সবই সুন্দর। কালপুরুষের দক্ষিণের আর একটি ছোট মণ্ডলকেও চিনে নেওয়া যেতে পারে এখন। এটির নাম লেপাস (Lepus) মণ্ডল। লেপাসের অর্থ শশ বা খরগোশ। অর্থাৎ, এটিকে শশমণ্ডল বলা চলে। এর বেশির ভাগ তারাই অনুজ্জ্বল, তবুও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো তারাও এতে পাওয়া যায়। এরা যে বরাবর মাথার ওপরে থাকবে, তা নয়। এক এক করে দিন যাবে আর এরাও ক্রমে ক্রমে সরে যাবে পশ্চিমে। সন্ধের অন্ধকারে তখন আবার নতুন তারকামণ্ডল।

মনে রাখতে হবে, আকাশপটের দিকের সঙ্গে পার্থিব উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম মিলবে না। সেইজন্য তারকাপটটিকে মাথার ওপরে নিচু করে ধরে উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে নিতে হবে। পূর্ব-পশ্চিম মিলে যাবে।

শেষ পর্যায়ে বিশ্বকাপ

তরুণ রায়

সময় এগিয়ে আসছে ক্রমশ। বিশ্বের সেরা ফুটবল দলগুলোর মধ্যে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ১৯ মাস ধরে ৩১৩টি কোয়ালিফাইং ম্যাচ হওয়ার পর বিশ্বকাপের ২২টি দল ঠিক হয়ে গেল। সঙ্গে গতবারের বিজয়ী আর্জেন্টিনা এবং সংগঠক দেশ ইতালি এ তো আছেই। কোয়ালিফাইং ম্যাচ শুরু হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ১৭ এপ্রিল, ত্রিনিদাদ টোবাকোর সঙ্গে গুয়ানার ম্যাচ দিয়ে, শেষ হল ওই ত্রিনিদাদেরই সঙ্গে আমেরিকার ম্যাচ দিয়ে, গত ২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ তে। ৩১৩ ম্যাচে গোল হয়েছে ৬৯২টি।

যে ২৪টি দেশ ফাইনাল রাউণ্ডে খেলবে তার মধ্যে প্রাধান্য রয়েছে ইউরোপিয়ান দেশগুলিরই। মোট ১৪টি ইউরোপের, ৪টি দক্ষিণ আমেরিকার, আফ্রিকা, এশিয়া এবং মধ্য-উত্তর আমেরিকার ২টি করে। ইউরোপের ১৪টি— রুমানিয়া, সুইডেন, ইংল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অস্ট্রিয়া, হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, যুগোস্লাভিয়া, স্কটল্যান্ড, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া ও ইতালি। দক্ষিণ আমেরিকার ৪টি—ব্রাজিল, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া এবং আর্জেন্টিনা। এশিয়ার ২টি—সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও দক্ষিণ কোরিয়া। আফ্রিকার ২টি—মিশর ও ক্যামেরুন। মধ্য-উত্তর আমেরিকার ২টি—কোস্টারিকা এবং আমেরিকা।

বিশ্বকাপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে কোন পর্যায়ে চলে গেছে তার প্রমাণ, গত বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউন্ডের ১৩টি প্রতিযোগী-দেশই এবার মূল পর্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ৯টি দেশ এবারেও ইতালিতে খেলবে। সেই ৯টি হল—ইংল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মানি, স্কটল্যান্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, উরুগুয়ে, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ কোরিয়া। যারা পারল না, তাদের মধ্যে আছে গত বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থানাধিকারী প্লাতিনির ফ্রান্স, 'কালো ঘোড়া' হিসেবে চিহ্নিত ডেনমার্ক এবং পর-পর চারটি বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে ওঠা পোলাণ্ডের মতো শক্তিধর দেশ।

বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউন্ডে প্রথম খেলছে কোস্টারিকা, আয়ারল্যান্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ৪০ বছর পর খেলছে আমেরিকা, মিশর ৫৬ এবং কলম্বিয়া ২৮ বছর পর। অর্থাৎ এদেরও প্রায় নতুনই বলা যায়। 'শাম্বা' ফুটবলের দেশ ব্রাজিল একটি অসাধারণ রেকর্ড করে রেখেছে এরই মধ্যে। ১৪টি বিশ্বকাপের প্রত্যেকটিতেই তারা ফাইনাল রাউণ্ডে উঠল, যা আর কোনও দেশই পারেনি।

একটি প্রশ্ন এখন, কারা জিতবে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল? বিশেষজ্ঞরা নিজেদের বোকা বানাতে রাজি নন। তবে একটা কথা বলা যায়, দেখা গেছে, ইউরোপে খেলা হলে দক্ষিণ আমেরিকান দেশগুলি একবার বাদ দিয়ে আর কোনওবারই জিততে পারেনি। ১৯৫৮-তে সুইডেনে শুধু ব্রাজিল জিতেছিল। এবার কি পারবে মারাদোনার আর্জেন্টিনা, ফ্রানসেসকোলির উরুগুয়ে অথবা কারেকা, বেবেটোর ব্রাজিল? নিজেদের মাঠে সহজে কি ছেড়ে দেবে তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী ইতালি অথবা গতবারের ফাইনালের হারের বদলা নিতে তৈরি পশ্চিম জার্মানি, লিনেকার, শিলটনের ইংল্যান্ড বা গুলিট-বাস্তেন, রিচকার্ডকে ঘিরে আকাশ-ছোঁয়া প্রত্যাশায় তৈরি হল্যান্ড দল?

এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভেবে এখন থেকেই আমরা শিহরিত, আগামী জুন-জুলাইয়ে কী হবে!

ইতালির এক ডজন স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফুটবল

অরুণাভ গুপ্ত

দেখতে দেখতে এসে গেল বিশ্বকাপ। রাজধানী রোমের চারদিক ছেয়ে গেছে নানান রঙিন পোস্টারে। কোনও কোনও পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'আমরা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করছি'। স্থানীয় পরিচালন-সংস্থার এখন একটাই চিন্তা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেভাবেই হোক বারোটি স্টেডিয়ামকে পুরোপুরি আধুনিক কায়দায় সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে হবে।

ইতালির লিগের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই বারোটি স্টেডিয়ামের মধ্যে সাতটিই প্রায় ৬০ বছরের বেশি পুরনো। তবে প্রতিটি স্টেডিয়ামকেই আধুনিক করে তোলা হচ্ছে। এর জন্য খরচ হবে ২৮ কোটি ১০ লক্ষ ডলার বা তারও বেশি। ইতালির নয়া ক্রীড়া-প্রধান ফ্র্যাঙ্কো ক্যারারো বিশ্বকাপ ফুটবলকে সব দিক থেকে সফল করে তোলার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। ইতালির খেলাধুলোর জগতের এক কর্মকর্তা বলেছেন, "খেলার পরিবর্তে শুধু অর্থ সংগ্রহ করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। লাভের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে, তা কখনওই আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠবে না।"

ইতালির মোট বারোটি জায়গায় বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসছে। তুরিন, মিলান, ভেরোনা, উদিনে, জেনোয়া, বোলগ্না, ফ্লোরেন্স, নেপল্স, রোম, বারি, ক্যাগলিয়ারি ও পালারমো।

আল্পস-এর উত্তর-পশ্চিমে হল তুরিন। সেখানে ফিয়াট ও জুভেনটাস-এর সর্বময়কর্তা গিয়ানি অ্যাগনেলি'র রমরমা ব্যাপার-স্যাপার। শহর থেকে ছ' মাইল দূরে 'ক্যাসিনে ডি-কন্টিমাসা'য় তৈরি হয়েছে বহুমুখী ক্রীড়াঙ্গন। সেখানে ৭০ হাজার দর্শক খেলা দেখতে পারবেন। মিলানের 'সান সিরো' স্টেডিয়াম বিখ্যাত ফুটবলার রুড গুলিট-এর দারুণ প্রিয়। ৮৫ হাজার সংরক্ষিত আসনের দর্শকদের ইতালির কনকনে উত্তুরে হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার সব ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। সান সিরো স্টেডিয়ামের সংস্কারের জন্য দু-দুটো ইস্পাতের 'বিম' ব্যবহার করা হয়েছে, যার ওজন পাক্কা দু' হাজার টন। লম্বায় ২০৫ মিটার। মুখপাত্রদের মন্তব্য, "ইস্পাতের এত বড় বড় বিম আজ পর্যন্ত ইউরোপের কোনও শহরে ব্যবহৃত হয়নি।"

তবে এখানে ৬০ হাজার দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর্দিনিয়া দ্বীপের রাজধানী ক্যাগলিয়ারিতেও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সমানতালে চলছে। কর্মকর্তাদের বক্তব্য, "নতুন ঘাসে ক্যাগলিয়ারি স্টেডিয়াম এখন আরও সবুজ।" ৪৫ হাজার আসন সংখ্যা। তবে 'পেলারমো'র ক্ষেত্রে ইতালির স্বপ্ন খানিকটা হোঁচট খেয়েছে। আসলে ক্লাব সংক্রান্ত ঝামেলায় পেলারমো কিছুটা বিচলিত। ইতালির এই ষষ্ঠ শহরের স্টেডিয়াম 'লা-ফেভোরিটা' নিঃসন্দেহে একটি জাতীয় সম্পদ। দর্শক-আসনের সংখ্যা ৪০ হাজার। পুরোটাই আচ্ছাদিত। ফ্লোরেন্সের পুর স্টেডিয়ামটিও স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল

ভেরোনায় ৪৫ হাজার দর্শকের খেলা দেখার সুযোগ রয়েছে। স্থানীয় দল হেলাস ভেরোনা ইতিমধ্যেই সিজন টিকিটের দর্শকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। ইতালির উত্তর-পূর্বে উদিনের 'ফ্রিউলি' স্টেডিয়ামটির বয়স মাত্র দশ বছর। এখানকার জন্য পরিচালকদের খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি। রাস্তাঘাটও অল্প-বিস্তর সংস্কার করে হাজার সাংবাদিকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শকাসন নির্দিষ্ট, তবে আসন সংখ্যা ৪৭ হাজার থেকে কমিয়ে ৪০ হাজার ২০০ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১১,৭০০ আসনের মাথায় থাকছে আচ্ছাদন।

জেনোয়ার 'মারাসি' স্টেডিয়ামের দর্শকাসন প্রায় ৪৩,৮২৫। বোলগ্নার 'ডেল-আরা' স্টেডিয়ামের সামর্থ্য ৪১,২০০। নিদর্শন। কাজ শেষ হলে এই স্টেডিয়ামে ৫০ হাজার ফুটবল অনুরাগীর খেলা দেখার সুযোগ হবে। নেপল্স-এর 'সান-পাওলো' স্টেডিয়াম মারাদোনার প্রিয়। আসন-সংখ্যা ৮৫,০২৭। রোমের ওলিম্পিক স্টেডিয়ামও নতুন সাজে সজ্জিত হতে চলেছে। এক লাখ দর্শকের খেলা দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য স্টেডিয়ামকে ঢেলে সাজাতে হবে। তার জন্য স্টেডিয়ামের খোল-নলচে পালটাবার দায়-দায়িত্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ নির্মাতা 'দিনো ভায়লো'র ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইতালির বিশ্বকাপে ম্যাসকট নির্বাচিত হয়েছে CIAO। একটি কিউবিক ধরনের মানুষের মাথায় ফুটবল। ম্যাসকটটি ইতালির জাতীয় রঙে সুসজ্জিত। সন্দেহ নেই, বিশ্বকাপ ফুটবল সবদিক থেকেই বর্ণাঢ্য হয়ে উঠবে।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

গৌতম সরকার

মাঝ মাঠের লড়াই

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান দুই ক্লাবে খেলেই প্রভূত সম্মান, খ্যাতি পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু টেনশনও কম যায়নি। বিশেষত, বড় খেলার আগে আমাদের সব খেলোয়াড়েরই যে কী মানসিক অবস্থা হত, তা নতুন করে আর বলব না। তোমরা যারা, বড় দলের সমর্থক তারা নিশ্চয়ই কিছুটা আন্দাজ করতে পারছ। বড় দু' দলের খেলার আগে খুব কম বাঙালিরই হৃৎস্পন্দন ঠিক থাকে!

সেদিক থেকে জাতীয় ফুটবলের খেলায় টেনশন অনেক কম। কারণ, ক্লাবের সব সেরা খেলোয়াড়ই সেখান খেলেন। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান- মহমেডান থাকে না। আর গৌরব, সম্মান তো আলাদাই। সন্তোষ ট্রোফিতে বাংলার রেকর্ড এত ভাল যে, আমাদের সময়ে জেতাটা কোনও খবরই ছিল না। এখন অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে জয়টাই বড় খবর হয়।

১৯৭৮ সালে আমরা দু'বার সন্তোষ ট্রোফি খেললাম। প্রকৃতপক্ষে সাতাত্তর সালের জাতীয় ফুটবলের আসর ১৯৭৮-এর জানুয়ারিতে বসে ছিল কলকাতায় আর আটাত্তরের খেলা বসে ছিল শ্রীনগরে বছরের শেষে। এবং সেই খেলায় অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালনের ভার পেয়েছিলাম আমিই। ১৯৭৬-এ ইস্টবেঙ্গল দলের ক্যাপ্টেনসির পর আর-এক বড় সম্মান পেলাম এবং সেরা সম্মানও বটে। রাজ্যকে নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে।

১৯৭২ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মধ্যে মাত্র একবার বাদ দিয়ে আমি প্রত্যেকবারই বাংলা দলে খেলেছি। ১৯৭৬-এ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাকে সাসপেন্ড করায় সেবার সুযোগ পাইনি। ছিয়াত্তরের সাসপেণ্ড খেলোয়াড়ই অবশ্য আটাত্তরে অধিনায়ক হল।

কলকাতার ন্যাশনালে আমাদের সামনে ছোট্ট একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। সন্তোষ ট্রোফি পর-পর তিনবার অর্থাৎ হ্যাটট্রিক করার চ্যালেঞ্জ। পঞ্জাব দারুণ দল—পারব কি আমরা? এর আগের দু'বছর সুধীর আর সুরজিতের নেতৃত্বে বাংলা জিতেছিল। এবার ক্যাপ্টেন আকবর। ওই হ্যাটট্রিক করা ছাড়া আমরা আর কিছু নিয়ে ভাবছিলামও না।

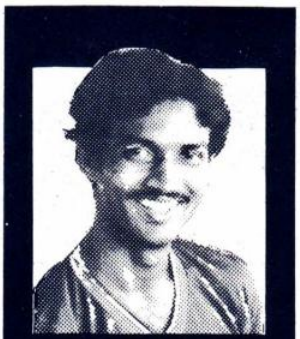

শুরু করলামও ঝড়ের গতিতে। গুজরাতকে দিলাম ১১ গোল। দৈনিক কাগজ মজা করে লিখল, গোলদাতা—আকবর প্রভৃতি। প্রায় আমরা সবাই-ই গোল করলাম। সত্যিই কে ক'টা গোল করল তার খেই রাখা যাচ্ছিল না। শুরু করার দায়িত্বটা অবশ্য আমিই নিই। মিনিট বারোর মাথায় গুজরাতের গোলরক্ষক রডরিগসকে একটু চমকানোর জন্য আমি গজ পঁচিশেক দূর থেকে একটা নিচু শট নিই এবং তাতেই গোল। গোলটা হয়ে যাওয়ায় আমার নিজেরই অবাক লাগছিল।

আমাদের ঝড় থামাল পঞ্জাব। যদিও সাময়িকভাবে। প্রথম দিনের ফাইনাল ড্র হল। শুরু হয়ে গেল আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা। বিশষত হাফ-এ আমার আর প্রসূনের খেলা নিয়ে কটাক্ষ করলেন কয়েকজন প্রাক্তন খেলোয়াড়। খুব রাগ হয়ে গেল, সব খেলা কি ভাল হয়? এটা প্রাক্তনেরা কেন বুঝবেন না, তাঁরা নিজেরাও তো খেলেছেন। সুতরাং দ্বিতীয় দিন জবাব দিলাম আমরা—মাঠেই। তিন গোল দিয়ে উড়িয়ে দিলাম ইন্দর, হরজিন্দরের পঞ্জাবকে। খুব ভাল খেলল বিদেশ, শ্যাম, সুরজিৎ, প্রসূন। কলকাতার মাঠে সন্তোষ ট্রোফির হ্যাটট্রিক হল।

জিতলাম আমরা, আমাকে কিন্তু মুগ্ধ করে গেলেন এক বর্ষীয়ান ফুটবলার—ইন্দর সিং। কলকাতায় ইন্দর খেললেন একেবারে স্মরণীয় ফুটবল। তখন তাঁর বয়স কমপক্ষে ৩৭। ভাবা যায় তখনও তার কাঁধে ভর দিয়ে একটা রাজ্য-দল কী লড়াইটাই না করে গেল আমাদের তারকাসমৃদ্ধ দলের সঙ্গে। স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই, ইন্দর সিং-এর বয়স যদি আর দশ বছর কম হত, তবে সেবার সন্তোষ ট্রোফি পেতে আমাদের প্রত্যেকেরই আরও দশ বছর করে আয়ু কমে যেত!

ইন্দরভাই আমাদের কাছেই প্রবাদপুরুষের মর্যাদা পেয়েছেন। দর্শকরা তো তাঁকে মাথায় করে রাখবেনই। খেলা শুরু করার সময় থেকেই আমি ইন্দরের নাম শুনে আসছি। সত্যি কথা, ভারতবর্ষে এত বড় মাপের ফুটবলার ক'জন আছেন হাতে গোনা যায়। ইন্দর সিং-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, এক বছরের জন্যও কলকাতায় ফুটবল না খেলে সর্বভারতীয় খ্যাতি পেয়েছেন। সব ভাল ফুটবলারই চান কলকাতায় ভাল ফুটবলারের সঙ্গে অথবা বিপক্ষে খেলে নিজের দক্ষতা এবং খ্যাতি আরও ছড়িয়ে দিতে। পঞ্জাবের ভারতখ্যাত ডিফেন্ডার জার্নেল সিং কলকাতায়, মোহনবাগানে খেলে গেছেন দীর্ঘকাল। কলকাতায় খেলেছেন শিল্পী-ফুটবলার হরজিন্দর সিংও। এঁরা যা স্বাভাবিক তাই-ই করেছেন। কিন্তু ইন্দর অন্যরকম ভেবেছিলেন। কলকাতার খ্যাতি, অর্থের লোভও তাঁকে টলাতে পারেনি। অথচ তিনি সবই পেয়েছেন। এবং পঞ্জাবে বসেই। নিজের ওপর কতখানি আস্থা! তাই ইন্দরভাই আমাদের কাছে এতখানি শ্রদ্ধেয়।

একটা সময় তো পঞ্জাব দল বলতে ইন্দরকেই বোঝাত। ইন্দর যেদিন খেলতেন তাঁর দল জিতত, যেদিন খেলতে পারতেন না, দল হারত। পঞ্জাব ফুটবলে ইন্দরের দান অপরিসীম।

আমরা যেসব খেলায় পঞ্জাব দলের কাছে বাধা পেয়েছি, দেখা যাবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার পিছনে ছিলেন এই পরিণত খেলোয়াড়টি। ইন্দরকে কখনও অহেতুক ছোটাছুটি করতে দেখিনি, কিন্তু কী করে যেন ঠিক বলের কাছে পৌঁছে যেতেন এই চতুর ফরোয়ার্ডটি! ইন্দরের সামনে বাংলার তাবড়-তাবড় ডিফেন্ডারকেও আমি গুটিয়ে যেতে দেখেছি। ইন্দরকে দেখলেই তাঁদের বুক কাঁপত। একমাত্র সুধীরকেই দেখেছি, ঠিকমতো ইন্দরের মোকাবিলা করতে। সুধীরের জাত অবশ্য আলাদা

তিয়াত্তর সালে ডুরান্ডের একটা ম্যাচ মনে আছে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বোধ হয় লিডার্স ক্লাবেরই হবে। ইন্দর খেলছেন। আমাদের নাভিশ্বাস উঠিয়ে দিয়েছিলেন

এক বিশেষ মুহূর্তে আমি, অশোকলাল ব্যানার্জি এবং ইন্দর সিং

একা। খেলার শেষে আমরা বলাবলি করেছিলাম, আর-একটা ইন্দর থাকলে আজ আর দেখতে হত না।

কলকাতায় সাতাত্তর সালের সন্তোষ ট্রোফির সেমিফাইনালে কেরলের বিরুদ্ধে করা একটা গোলের কথা ভুলব না। কেরলের মাঝমাঠে বল পেয়ে সামনে একজন সতীর্থকে বল বাড়াতে গিয়ে মুখ তুলে দেখলেন, কেরলের গোলকিপার একটু এগিয়ে এসেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওই দূর থেকে একটা পাঞ্চ এবং গোল। মাঠে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। কী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ! একেই কি বলে সিকি ভাগ সুযোগকে পুরো কাজে লাগানো ?

ভুলব না, দিল্লির মাঠে রাশিয়ার জাতীয় দলের সঙ্গে ইন্দরের খেলা। আমিও ভারতীয় টিমে ছিলাম, সালটা বোধ হয় ১৯৭৮ অথবা '৭৯। হাফটাইমের আগেই আমরা পাঁচ-পাঁচটা গোল খেলাম। বিরতিতে ইন্দর বললেন, 'এ কেয়া হোতা হ্যায় ? আমাদেরও দেখাতে হবে, আমরা খেলতে জানি।' আমরা কতটা দেখালাম জানি না, তবে ইন্দরভাই দেখালেন। একাই টানা তিন গোল অর্থাৎ হ্যাটট্রিক করলেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ৫-৪ গোলে হারলাম।

ইন্দরের বিপক্ষে অনেক, সঙ্গেও কয়েকটা ম্যাচ খেলেছি। পেয়েছি ওঁর ভালবাসাও। সঙ্গে নামলেই বলতেন, 'চল গৌতম, আজ উসকো খেল দিখায়ঙ্গা। তু বল বাড়ায়েগা, হাম ডিফেন্স ভাঙ্গেগা।' বল চাইতেন ইন্দর একটা অদ্ভুত জায়গায়। বিপক্ষের ডিফেন্স আর হাফ লাইনের মাঝ-বরাবর। ডিফেন্ডার এগোবে কি পিছবে ভাবতে ভাবতেই ঢুকে যেতেন পেনিট্রেটিভ জোনে। এবং সেখানে ইন্দরকে আটকানো যে কী শক্ত তা দু-একজনই বলতে পারবে। কেননা, আটকাতে পেরেছে তো দু-একজনই ! ছোট্ট জায়গার মধ্যে ইন্দরভাই এত সুন্দর কাটিয়ে বেরোতেন, যা ভাবাই যায় না। ওঁর ফ্লিকও ছিল দারুণ। সতীর্থদের পাস বাড়াতেন, এত ভাল জায়গায় যে, সেসব বল পেয়ে গোল না করা মুশকিল।

ইন্দর-প্রসঙ্গ শেষ করব, ওর ক্ষুরধার বুদ্ধির একটা মজার গল্প বলে। তবে ঘটনা বলব, খেলোয়াড় বা দল—কারওরই নাম লিখব না। দিল্লিতে খেলা। কলকাতারই এক দলের সঙ্গে। দুই স্টপারের সঙ্গে হেডে কিছুতেই পারছেন না ইন্দর। দুই স্টপার ছিনে জোঁকের মতো একসঙ্গে লেগে রয়েছে। খেলা ভাঙার মিনিট দশেক আগে ইন্দর ওঁর এক সতীর্থের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলে এলেন, বলটা বিপক্ষের ডিফেন্সের মাথায় ভাসাতে। বলটা যখন নামছে, ইন্দর আস্তে করে বললেন, 'লিভ ইট।' দুই স্টপারই ভাবল, অপরজন বলছে। দু'জনেই বলটা ধরল না। ইন্দর ধরলেন এবং যা হবার তাই হল।

পা এবং মাথা—যাঁর এরকম সমানভাবে চলত, তাঁকে শ্রদ্ধা না করে উপায় আছে ?

শ্রীনগরে আটাত্তরের সন্তোষ ট্রোফির ফাইনালে হারালাম গোয়াকে এবং খুব-একটা কষ্ট না করেই। সতীর্থদের সহায়তায় অধিনায়কত্ব আমার মাথায় পাথর হয়ে চেপে বসেনি। জয়ের পর শ্রীনগরে বসেই কলকাতা থেকে যখন অনেক অভিনন্দনবার্তা পেতে লাগলাম, খুব আনন্দ লাগছিল। (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

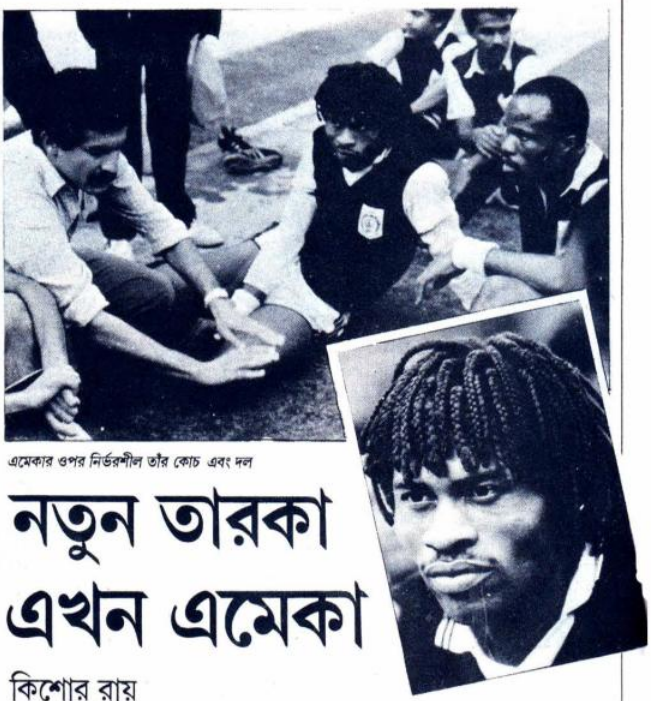

এমেকার ওপর নির্ভরশীল তাঁর কোচ এবং দল

নতুন তারকা এখন এমেকা

কিশোর রায়

আবির্ভাবে যতটা না হইচই ফেলেছিলেন, তার চেয়েও বেশি হইচই ফেলে দিলেন পুনরাবির্ভাবে। কলকাতার ফুটবলে এখন নতুন তারকা দীর্ঘকায় নাইজিরিয়ান এমেকা এজুগো। বছর কয়েক আগে কলকাতায় অল্প কিছুদিন খেলে হঠাৎ বাংলাদেশ চলে যান এমেকা। আবার ফিরে এসেই একেবারে হিরো। আর এক নাইজিরিয়ান চিমা ওকোরি এতদিন ছিলেন ফুটবল-প্রেমী দর্শকদের নয়নের মণি। নিঃসন্দেহে আক্রমণের দক্ষতায় চিমা এখনকার স্ট্রাইকারদের মধ্যে সেরা। বুদ্ধিদীপ্ত খেলার চমকে এমেকা কি চিমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন? যদিও দুজনে দুই পজিশনের খেলোয়াড়, তবু এই দুজনের তুলনামূলক আলোচনা অনেকেরই কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠছে।

কলকাতায় এমেকা খেলে গিয়েছিলেন স্ট্রাইকার হিসেবে, ফিরে এলেন সফল মিডফিল্ডারের ভূমিকায়। হঠাৎ এই ভূমিকা বদল কেন? মহমেডান ক্লাবের টেন্টে বসে এমেকা জবাব দিলেন, "আমি মূলত মাঝমাঠেই খেলতাম, খেলা তৈরি করা বা গেমমেকিংই ছিল আমার লক্ষ্য। কিন্তু এখানে আসার পর কোচ আমাকে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলান। কোনও জায়গাতেই আমার খেলতে আপত্তি নেই। তাই খেললাম দলের প্রয়োজনে। এখন নিজের জায়গা ফেরত পেয়েছি। আর আধুনিক ফুটবলে গোলকিপার বাদে আর কোনও প্লেয়ারের নির্দিষ্ট কোনও জায়গা আছে বলে আমার মনে হয় না।"

চিমার মতোই এমেকার বিশাল শরীর। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। একঝলক দেখলেই হল্যান্ড দলের পৃথিবী-বিখ্যাত ফুটবলার রুড গুলিটের কথা মনে পড়ে যায়। গুলিটের অনুকরণেই কি চুল রাখা এবং মাঝ-মাঠে খেলা? প্রশ্নটা খুব একটা পছন্দ হল না এমেকার। বিপক্ষের ডিফেন্ডারকে যেমন হেলায় ডজ করেন, সেই ভঙ্গিতেই হাতটা নেড়ে বললেন, "যেহেতু গুলিট চুল রেখেছে, আমি রাখতে পারব না নাকি? লেটেস্ট ফ্যাশন আমার সব সময়ই পছন্দ। এই ধরনের চুল রাখা আফ্রিকানদের খুব প্রিয়। গুলিট নিজেও তো আফ্রিকারই ছেলে। সেখানে গিয়ে ওর ব্যাপারটা ভাল লেগেছে, ও তাই রেখেছে। আমারও ভাল লাগল, আমি রাখলাম। এতে অনুকরণের কী আছে?"

আবার প্রশ্ন রাখলাম, আর মাঝ-মাঠে খেলা? "বলেইছি তো মাঝ-মাঠে খেলতে আমার বরাবরই ভাল লাগে। আর এখন সুযোগ পেয়েছি, তাই খেলছি। গুলিটের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আমার কী যোগাযোগ থাকতে পারে? গুলিট তো বিরাট প্লেয়ার।"

এবারের ডুরান্ড কাপে এবং নেহরু শতবার্ষিক ফুটবলে কলকাতার প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর বিরুদ্ধে মহমেডানের হয়ে এমেকা যা খেললেন, তা প্রাক্তন ফুটবলার, কোচ এবং বিশেষজ্ঞদের দারুণ প্রশংসা অর্জন করেছে। কোচ পি· কে· ব্যানার্জি বলেছেন, "জবাব নেই এমেকার। ও একাই তিনজনের ফুটবল খেলে।" সুভাষ ভৌমিকের মতে, "এমেকার নিখুঁত পজিশন প্লে আক্রমণকে করে তোলে ক্ষুরধার। ওর ফ্রি মুভমেন্ট, লম্বা-লম্বা স্ট্রাইড, ঠাস বুনোট ডিফেন্স, দুর্দান্ত ওয়ার্কলোড নেওয়া অসাধারণ।" গৌতম সরকার জানালেন "চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ গজ সহ মাঝ-মাঠকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে ও দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে।"

প্রকৃতপক্ষে এমেকা বাংলাদেশে গিয়েই এই স্কিমারের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। মাঝে দু' বছর ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮-তে হল্যান্ডেও খেলে এসেছেন। এবারে কলকাতায় খেলারও খুব ইচ্ছে ছিল না তাঁর। বাংলাদেশে বিদেশী খেলোয়াড়দের ব্যাপারে নানা বিধিনিষেধ দেখা দেওয়ায় বাধ্য হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। ইচ্ছে আছে, সুযোগ এলে ইউরোপীয় টিমে খেলবেন।

কলকাতার ফুটবল সম্বন্ধে খুব একটা উঁচু ধারণা নেই এমেকার। সুদীপ চ্যাটার্জি ছাড়া আর কারও সম্পর্কেই খুব একটা ভাল বললেন না এমেকা। চিমা কেমন? এমেকার জবাব, "মোটামুটি, তেমন আহামরি কিছু নয়।" চিমার সঙ্গে নিজের তুলনাটাও না-পসন্দ এমেকার। বললেন, "ও স্ট্রাইকার, আমি সব জায়গাতেই খেলি। সুতরাং তুলনা হবে কী করে?"

রক মিউজিক এবং আধুনিক ফ্যাশনের ভক্ত এমেকা এজুগো নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করতেই বেশি অভ্যস্ত। খেলার মাঠে এখন তিনিই বিপক্ষ দল এবং অনেকেরই চিন্তার কারণ হয়ে উঠছেন।

হিকের বিশ্রাম

বেশি খাওয়া হয়ে গেলে যেমন হাঁসফাঁস অবস্থা হয়, তরুণ গ্রেম হিকেরও সেই অবস্থা। জিম্বাবোয়ে-জাত ক্রিকেটার হিক একটিও টেস্ট না খেলে, শুধু ইংল্যান্ডের কাউন্টি খেলেই যে পরিমাণ রান এবং মান সংগ্রহ করেছেন তা অনেকেরই ঈর্ষার কারণ। টানা পাঁচ বছর রানের পাহাড় গড়ে হিক বোধ হয় এখন ক্লান্ত। তাই চার মাসের ছুটিতে গেলেন নিজের দেশ জিম্বাবোয়েতে। পরিবারের সঙ্গে তিনি এই সময়টা কাটাবেন। হিকের কাউন্টি উরস্টারশায়ারের চেয়ারম্যান ফ্র্যাঙ্কলে বলেছেন, "পাঁচ বছর রান করার পর নিজের ব্যাটটাকেও একটু বিশ্রাম দেবে হিক !" হিকের ব্যাটের ব্যথা বোধ হয় বুঝেছেন মাননীয় চেয়ারম্যান !

সবচেয়ে লম্বা

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ফিল অ্যালে এখন সংবাদের শীর্ষে। উইকেট নেওয়ার জন্য নয়, তাঁর উচ্চতার জন্য। তাঁর উচ্চতা ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি, মাত্র আধ ইঞ্চির জন্য তিনি বিশ্বরেকর্ড করতে পারলেন না। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সবচেয়ে লম্বা ক্রিকেটার হলেন এ টি সি অ্যালুম। ১৯৬০ সালে তিনি সারের পক্ষে খেলেন।

দ্রুততম

নেহরু কাপ ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলাররা বল করে গেলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোরে বল করেছেন কে ? এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দীর্ঘকায় পেসার উইনস্টন বেঞ্জামিনই দ্রুততম বোলার। ঘণ্টায় তাঁর বলের গতি ৮৬·৯ মাইল। অস্ট্রেলিয়ার মার্ভ হিউজ (ঘণ্টায় ৮২·৬ মাইল), পাকিস্তানের ওয়াসিম আক্রম (৭৯·৮ মাইল ঘণ্টায়) এবং ম্যালকম মার্শাল (৭৮·৯ মাইল ঘণ্টায়)। অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, শ্বেতাঙ্গ বোলারদের মধ্যে মার্ভ হিউজের বলের গতিই সবচেয়ে বেশি।

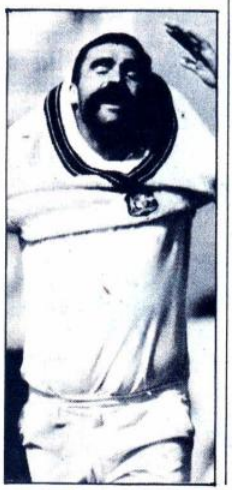

সোফিয়া লরেনের প্রিয় খেলোয়াড়

পেলে, বেকেনবাওয়ার প্রভৃতি ফুটবল-তারকার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল পর্বের 'ড্র'-এ আর-এক তারকাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি রুপোলি পরদার নায়িকা সোফিয়া লরেন। সব অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর লরেনকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন দেশ জয়ী হলে তিনি খুশি হবেন ? লরেন বলেছেন, "আমি বিজয়ী দেখতে চাই আমার নিজের দেশ ইতালিকে।" কোন খেলোয়াড়কে তাঁর ভাল লাগে ? "মারাদোনাকে," লরেন হাসতে হাসতে বলেছিলেন। তাঁর এই উত্তরের একটা কারণও আছে। নেপল্‌স শহরে থাকেন সোফিয়া লরেন এবং নেপল্‌স দলে খেলেন মারাদোনা। সুতরাং মারাদোনাই যে তাঁর প্রিয় হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী !

উত্থান ও পতন

গত বছরের সেরা টেনিস-খেলোয়াড় কে ? নিঃসন্দেহে, বরিস বেকার। সারা বছর ধরে ধারাবাহিক সাফল্য দেখিয়েছেন বেকার। উইম্বলডন জয়ের পর ইউ এস ওপেন চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন তিনি। এবং ১৯৮৯-র শেষাশেষি নিজের দেশ পশ্চিম জার্মানিকে ডেভিস কাপ জেতানোতেও বেকার নিয়েছেন দারুণ ভূমিকা। টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে কার মা গত বছর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন ? অবশ্যই মাইকেল চ্যাং-এর মা বেট্টি। চ্যাংয়ের দ্রুত উত্থানে তাঁর মা নেপথ্যে প্রেরণা জুগিয়েছেন। চ্যাংকে সাহায্য করেছেন। টেনিস-খেলোয়াড়দের তালিকায় চ্যাং ছিলেন ২৫ নম্বরে। তাঁর স্থান এখন পাঁচ নম্বর। 'সেরা' উত্থানের পর এবার 'সেরা'

পতনের কথা। ম্যাট্‌স ভিল্যান্ডার ছিলেন একেবারে শীর্ষে। তিনি এখন চর্তুদশ স্থানে।

দর্শক

এক প্রবীণকে ঘিরে পূর্বাঞ্চলের দুই তরুণ ক্রিকেটার

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ছেলেটির বলের গতি দেখে চমকে গেলেন ওয়েন লারকিনস ও রবিন স্মিথ। কটকে নেহরু কাপের নেটে ইংল্যান্ডের সেরা এই দুই ব্যাটসম্যানকে বল করছিল ছেলেটি। পাকিস্তানের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগের দিন কয়েকজন বাড়তি পেস বোলারের বিরুদ্ধে প্র্যাকটিস করতে চেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। কিন্তু রীতিমত মুগ্ধ হলেন ওড়িশার বাইশ বছরের সৌরজিৎ মহাপাত্রকে দেখে। শুধু নেটেই নয়, গত বছর থেকে রঞ্জি ট্রোফিতেও ম্যাচের পর ম্যাচ দুর্দান্ত বল করছে সৌরজিৎ।

১৯৮৮-৮৯ মরসুমে সৌরজিৎ ওড়িশার হয়ে রঞ্জিতে সবাধিক ২১টি উইকেট দখল করেছে। এবারও উইকেট-শিকারিদের মধ্যে সে সবার আগে। লম্বা, ছিপছিপে চেহারার ছেলেটি গত বছর ইডেনে দু' দফায় বাংলার ছ'জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে চমক জাগিয়েছিল। আর এবার বারিপদায় ওর বলে যেভাবে বাংলার ব্যাটসম্যানরা হিমশিম খেল, তা বিস্ময়কর। অসাধারণ বোলিং পরিসংখ্যান তার। প্রথম ইনিংসে ২৯·৫-৭- ৭৪-৭ আর দ্বিতীয় দফায় ১৬-০-৯৫-২। ম্যাচে ন'টি উইকেট। কী আছে সৌরজিতের বলে? প্রচণ্ড জোরে ঠিকমতো লাইন ও লেংথ রেখে সে বল করে। সৌরজিতের বলের জোর বাংলার রাজীব শেঠের চেয়েও বেশি। সম্ভবত সলিল আঙ্কোলার চেয়েও। বারিপদায় অরুণলাল, আই· বি· রায়, শ্রীকান্ত কল্যাণী ও স্নেহাশিস গাঙ্গুলিকে বারকয়েক সে চমকে দেয় নাকে হাওয়া-লাগানো বাউন্সারে। সৌরজিতের 'ওপেন চেস্ট' বোলিং অ্যাকশন দারুণ বিভ্রান্তিকর। ওর নিখুঁত আউট সুইংয়ে খোঁচা মেরে এখন পর্যন্ত উইকেট দিয়েছেন পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব নামী ব্যাটসম্যান। সৌরজিতের আর একটি বড় গুণ, সে একটানা অনেকক্ষণ লাইন ও লেংথ ঠিক রেখে বল বলতে পারে। বারিপদায় বাংলার প্রথম ইনিংসে সে একবারের জন্যও পয়েন্টে কোনও ফিল্ডার রাখেনি। এবং কী আশ্চর্য! মাঠের ওই অঞ্চল দিয়ে সৌরজিতের বলে একটিও বাউন্ডারি হয়নি। সৌরজিৎ এখন দারুণ ফর্মে। বিহার ও অসমের বিপক্ষেও রঞ্জি ট্রোফির ম্যাচে সে ১৩টি উইকেট পেয়েছে। সুযোগ করে নিয়েছে দলিপ ট্রোফিতে। পূর্বাঞ্চলের প্রথম এগারোজনের দলে চিপকের মরা পিচে মধ্যাঞ্চল রানের পাহাড় গড়লেও সৌরজিতের বিরুদ্ধে তাদের ব্যাটসম্যানরা মাথা তুলতে পারেননি।

> সৌরজিৎ ছাড়াও কলিঙ্গ রাজ্য থেকে উঠে এসেছে আরও এক নবীন ক্রিকেটার। সাড়ে সতেরো বছরের রাজীব বিসওয়াল এই মুহূর্তে সবচেয়ে সুখী ক্রিকেটার। বিজয়ী ভারতীয় যুব দলের অধিনায়ক এই তরুণ।

সৌরজিৎ মহাপাত্র ফোটো : গৌতম রায়

কলিঙ্গ রাজ্য থেকে উঠে এসেছে আরও একজন নবীন ক্রিকেটার। সাড়ে সতেরো বছরের অল রাউন্ডার রাজীব বিসওয়াল এই মুহূর্তে সবচেয়ে সুখী ক্রিকেটার। ঢাকায় কয়েকদিন আগে তার অধিনায়কত্বে ভারতীয় যুবদল প্রথম এশীয় যুব ক্রিকেট (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সীদের) চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ব্যাটে-বলে ধারাবাহিক সাফল্য পেয়েছে বিসওয়াল। দেশে ফিরে বিসওয়াল রঞ্জিতে অসমের বিরুদ্ধে ঝকঝকে ৭০ রানের ইনিংস খেলে ঢুকে পড়েছে পূর্বাঞ্চল দলেও। বিসওয়ালের ক্রিকেট-বুদ্ধি প্রখর। পাকিস্তান যুবদলের বিপক্ষে চলতি টেস্ট সিরিজে সে-ই আবার ভারতের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে।

সৌরজিৎ ও বিসওয়াল— দুই তরুণ ক্রিকেটারকে গত দু'বছর ধরে যিনি পরম যত্নে লালন-পালন করছেন সেই অসজিৎ জয়প্রকাশের ওপর ওড়িশা ক্রিকেট দল এখন দাঁড়িয়ে। প্রায় দেড় দশক হয়ে গেল জয়প্রকাশ রঞ্জি ট্রোফি খেলছেন। প্রথমে যিনি ছিলেন নিছক অফ স্পিনার, ক্রিকেট-জীবনের শেষে পৌঁছে তিনি হয়ে উঠেছেন অপরিহার্য অলরাউন্ডার। জীবনের সেরা ফর্মে রয়েছেন জয়প্রকাশ। এই মরসুমে সব ম্যাচেই ভাল রান পেয়েছেন। প্রচুর রান করার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটিও জয়প্রকাশ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন। পূর্বাঞ্চলের অধিনায়কের দায়িত্বও এবার তাঁর চওড়া কাঁধে চাপিয়েছেন নির্বাচকরা। প্রবীণ জয়প্রকাশ ক্রিকেট ছাড়ার প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে সাফল্যের স্বীকৃতি পেলেন। আর তাঁর দুই 'পালিত' ক্রিকেটার রইলেন বড় ধরনের স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষায়।

লক্ষ্যে স্থির ভারতীয় তীরন্দাজরা

শ্যামল রায়

অপ্রত্যাশিত বলে জয়ের আনন্দটাও ছিল বেশি। দু-একজনের ব্যক্তিগত সাফল্য ছাড়া এশীয় মানে আমরা যখন ক্রমশ পিছু হটছি, সেই সময় তিন ভারতীয় তীরন্দাজের এশীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়া অবশ্যই গৌরবের কথা। তাও আবার কাদের হারিয়ে? না, ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে। অঘটন ঘটালে এই ধরনের বড়সড় ঘটানোই ভাল বোধ হয়!

অবশ্য এই জয়কে ঠিক অঘটন বলা যাবে কি না সন্দেহ। গত কয়েক বছর ধরেই তীরন্দাজরা আস্তে-আস্তে সাফল্যের পথে এগোচ্ছিলেন। ১৯৮৬ সালে এশিয়াডে ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করে। ১৯৮৭-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ইভেন্টে শ্যামলাল ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। আর গতবছর সোল ওলিম্পিকে দলগতভাবে ভারত ২০ তম স্থান পায়, বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে খুব একটা খারাপ ফল নয়। আর এবার তো একেবারে এশীয় চ্যাম্পিয়ান।

অঘটন বললে বরং তিন তীরন্দাজ—শ্যামলাল, লিম্বারাম আর স্কালজাং দোরজির একসঙ্গে ভারতের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাই বলতে হয়। কারণ, ঐরা কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি গ্রামের ছেলের যা শখ, তা কোনওদিন দেশের হয়ে মস্ত সম্মান বয়ে আনতে পারে। রাজস্থানের বনস্ওয়ারা জেলার কেওরিয়া গ্রামের ছেলে শ্যামলাল। তেইশ বছর বয়স, আট ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বড় হয়ে বাবার 'খেতি'-তে কাজ করার কথা। কিন্তু শখ সারাদিন তীর ধনুক নিয়ে শিকার করে বেড়ানো। ঘটনাক্রমে, দূরের শহর চিতোরে বেড়াতে আসেন তিন বছর আগে। সেই সময়, ১৯৮৬ সালে, স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই) চিতোরে প্রতিভাবান তীরন্দাজ খুঁজে বের করার জন্য একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল। মজা দেখার জন্য তীর-ধনুক নিয়ে সেখানে হাজির হলেন শ্যামলাল। এবং নজরে পড়লেন সাই-কর্তাদের। নির্বাচিত করে তাঁরা তাঁকে নিয়ে এলেন দিল্লিতে। তারপর নিবিড় অনুশীলন।

শ্যামলালের মতো লিম্বারামও রাজস্থানের ছেলে। উদয়পুরের কাছে ছাদোকিট গ্রামে বাস। লিম্বারামের বাবাও কৃষিজীবী। চিতোরের ওই ক্যাম্পে লিম্বারামও নির্বাচিত হন, বয়স তখন মাত্র পনেরো। যে-কোনও লক্ষ্যে অতি সহজেই তীর মারতে অভ্যস্ত লিম্বা তখনও জানতেনই না যে, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি-র মতো তীরন্দাজিও একটা আন্তর্জাতিক খেলা। তীর ছুঁড়ে পয়েন্ট পাওয়া যায়, এ-সংবাদ শুনে খুব অবাক হয়ে

(বাঁদিক থেকে) শ্যামলাল, লিম্বারাম, আলেকজাণ্ডার নিকোলাই (কোচ), রাজিন্দর গুঁইয়া ও স্কালজাং দোরজি

গিয়েছিলেন তিনি।

আর স্কালজাং দোরজি? পড়ায় তেমন মন ছিল না চঞ্চল প্রকৃতির এই তরুণের। সারাদিন শুধু তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করে বেড়াতেন। হিমাচল প্রদেশের কাজা উপত্যকার এই তরুণও একদিন এলেন বাবার সঙ্গে সোলানে। সালটা একই ১৯৮৬। সেখানেও তখন চলছিল, প্রতিভা অন্বেষণের শিবির। যথার্থ প্রতিভাকে চিনতে দেরি করেননি সাই-এর কর্মকর্তারা।

তিন শখের তীরন্দাজ এলেন দিল্লিতে সাই-এর কোচিং ক্যাম্পে। কোচ সৌম্যেন দাসের অধীনে কঠোর অনুশীলন শুরু হল। ১৯৮৬-তেই এশিয়াডে গেল ভারতীয় দল। চতুর্থ স্থান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। ইতিমধ্যে ভারতে এলেন রুশ কোচ আলেকজাণ্ডার নিকোলায়েভ। তিনি তীরন্দাজদের দক্ষতায় খুশি হলেন, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত আরও কিছু প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। তিনি তীরন্দাজদের হালকা ধনুক বদলে দিলেন। এতে ফল পাওয়া গেল।

কীভাবে ভারতীয়রা এশীয় চ্যাম্পিয়ান হলেন? বেজিং-এর ঠাণ্ডায় অনভ্যস্ত ভারতীয়ররা প্রথমে এতই কাবু হয়ে পড়েছিলেন যে, ভাল করে তীর-ধনুক হাতেই নিতে পারছিলেন না। এক সদস্য রাজিন্দর গুঁইয়া তো অসুস্থই হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভারতীয়রা লড়াইয়ে ফিরে আসেন। তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, চিন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ওপরে লেখা হয় ভারতের নাম। ভারত দলগত চ্যাম্পিয়ান হয় ১৮৫০ পয়েন্ট পেয়ে। লিম্বারাম ব্যক্তিগত ইভেন্টে পান রুপো। পঞ্চাশ মিটার ইভেন্টে তিনি স্কোর করেন ৩১১।

চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় ভালরকম আর্থিক পুরস্কার পেয়েছেন তীরন্দাজরা। কী করলেন লিম্বারাম তা দিয়ে? বই পড়ার খুব শখ তাঁর। অনেক বই কিনবেন তিনি। আর দোরজি? তিনি কিছু ইংরেজি গানের ক্যাসেট কিনবেন। ইংরেজি বলা ভাল করে রপ্ত করার জন্য। দোরজির বোধ হয় মনে হয়েছে, তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুই ভাল করে শেখা দরকার।

প্রতিআক্রমণের কৌশল 'সুতো উচি উচি'

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

কিওকুশিন ক্যারাটের ব্লক বা প্রতিপক্ষের মার আটকানোর কৌশল নিয়ে কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবার হাত দিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রতিআক্রমণের কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। যে পদ্ধতি নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব তার জাপানি নাম হল 'সুতো'। এটি হাতের চেটোর বাইরের প্রান্তভাগ দিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি। এখন যে পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা করব তার নাম 'সুতো উচি উচি'। এই সুতোর আঘাত ভীষণভাবে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে পারে।

সুতো উচি উচি : 'সুতো' কথার অর্থ চপ ; 'উচি' কথার অর্থ ভেতর থেকে বাইরের দিকের মুভমেন্ট এবং দ্বিতীয় 'উচি' কথার অর্থ আঘাত। আগের মতো হাতের কৌশল অনুশীলন করার জন্য যেভাবে দাঁড়াতে হবে, অর্থাৎ প্রথমে ইওইদাচি, তারপর হাত এবং পায়ের অবস্থার পরিবর্তনে সানচিনদাচিতে দাঁড়াতে হবে। এবার বাঁ হাতটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে গলার সমান উচ্চতায় হাতের আঙুলগুলো পাশাপাশি শক্তভাবে সামনের দিক করে কনুই থেকে একটু মুড়ে কনুইটাকে শরীরের ভেতর দিক করে রেখে দাঁড়াতে হবে। সেই সঙ্গে ডান হাতটাকে ডান দিকের বুকের পাশে ডান পাঁজরার সঙ্গে স্পর্শ করে রাখতে হবে। শরীরের ওপর ভাগ কোমর থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে রাখতে হবে। এবার বাঁ হাত এবং ডান হাত কনুই থেকে মুড়ে (বাঁ হাত ডান হাতের তলা দিয়ে রাখতে হবে) শরীরের ওপর ভাগ কোমর থেকে বাঁ দিকে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে দাঁড়াতে হবে। এই কৌশলের শুরুতে যখন বাঁ হাত আগে সামনের দিকে রাখা ছিল তখন বাঁ হাতের চেটো নীচের দিকে এবং ডান হাতের চেটো ওপর দিকে রেখে দাঁড়াতে হবে। যখন ডান হাত দিয়ে মারার সময় হাত দুটো মুড়ে দাঁড়ানো হল তখন ডান হাতের চেটো ওপর দিক করে বাঁ কাঁধের ওপর রেখে এবং বাঁ হাতের চেটো নীচের দিকে করে ডান হাত শরীরের সঙ্গে যেখানে যুক্ত সেখানে স্পর্শ করে রাখতে হবে। এবার ডান হাতটাকে সামনের দিকে ছুঁড়তে হবে। শুরুতে ডান হাতের চেটো ওপর দিকে ছিল, সামনে আঘাত হানতে যাবার সময় হাতের কবজি থেকে হাতের মোচড় দিয়ে ডান হাতের চেটো নীচে চলে গেল এবং ডান হাতের চেটোর বাইরের অংশ (আঙুলের অংশ নয়) গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করবে। সেই সঙ্গে বাঁ হাতটা সরে এসে বাঁ দিকে বুকের পাশে বাঁ পাঁজরা স্পর্শ করে রাখতে হবে। এইভাবে আবার বাঁ হাত দিয়ে মারতে হবে, তারপর ডান হাত দিয়ে মারতে হবে। প্রতি হাতে কুড়িবার করে অনুশীলন করতে হবে। ডান হাত দিয়ে মার অনুশীলনের সময় শরীরের ওপর ভাগ বাঁ দিকে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে দাঁড়াতে হবে, আবার বাঁ হাত দিয়ে মারার সময় শরীরের ওপর ভাগ ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে রাখতে হবে। অবস্থা অনুযায়ী ডান হাত বা বাঁ হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের গলার ডান দিকে বা বাঁ দিকে মারতে হবে। প্রথমে আস্তে-আস্তে অনুশীলন করতে হবে, তারপর স্পিড বাড়াতে হবে।

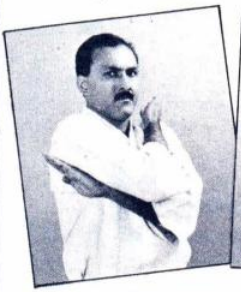

ফোটো : উৎপল সরকার

বিবেক রাজদান

ফোটো : উৎপল সরকার

সঞ্জয় মঞ্জরেকর
ফোটো : উৎপল সরকার

নিয়ানডারথালরা কি কথা বলত

কথা বলার অধিকার সভ্য মানুষের একচেটিয়া অধিকার ?
ইজরায়েলের প্রাগৈতিহাসিক কেবারা গুহায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বারুখ অ্যারেন্‌সবার্গ। প্রশ্নের সমর্থনে একটি নমুনাও তিনি পেশ করেছেন। ইউ-আকৃতির এক ফালি হাড়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম 'হাইঅয়েড' অস্থি !
হাইঅয়েড অস্থিটি জিভ ও জিভসংলগ্ন পেশীগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। জিভের নড়াচড়া প্রধানত এই অস্থিটির জন্যই হয়ে থাকে।
বারুখ কেবারা গুহায় অনুসন্ধান চালিয়ে ষাট হাজার বছর আগে মানুষের একটি হাইঅয়েড অস্থি খুঁজে পেয়েছেন।
হয়তো বা সামান্য এই হাড়টুকু আর কয়েকদিন পরে খুলে দেবে মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে এক বন্ধ দরজা !
ষাট হাজার বছর আগে, বর্তমান মানুষ 'হোমো স্যাপিয়েন্‌স'-রা আদৌ পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়নি, তখন নিয়ানডারথাল নামে এক শ্রেণীর দু-পেয়ে জীব এই পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করত। এরাই বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ !
বারুখের আবিষ্কার প্রমাণ করতে চলেছে, এই নিয়ানডারথাল নামের আধা-মানুষরাও কথা বলতে পারত !
বারুখের মতে, 'ষাট হাজার বছর আগের এই হাড়টি আকৃতি, অবস্থান, কাজ সব-কিছুতেই আধুনিক হাইঅয়েড অস্থির অনুরূপ। শুধু একটা বিষয়েই সামান্য সংশয় রয়েছে।
নিয়ানডারথাল মানুষরা ইউরোপে থাকত। ষাট হাজার বছর আগের ইজরায়েলের গুহামানবরা তো নিয়ানডারথাল না-ও হতে পারে !'
তা না হোক, কিন্তু আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্‌স আর দাবি করবে না, শুধুমাত্র তারাই বকবক করতে পারে, কথা বলতে পারে !

নতুন লেমুর

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানী এলউইন সিমন্‌স একটি দারুণ ভাল কাজ করেছেন। তিনি লুপ্তপ্রায় একটি লেমুর-প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন !
ব্রিটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী আয়ান ট্যাটারসল এই লেমুরটির ফোটো তুলেছিলেন ১৯৭৪ সালে। মাদাগাস্কারের জঙ্গলে বসে আছে ১৮ ইঞ্চি লম্বা একটি খুদে লেমুর। কান দুটো সাদা লোমে ঢাকা। মাথার দিকের লোমগুলি সোনালি এবং কমলা রঙে মেশানো ! এরা 'শি-ফাখ', 'শি-ফাখ' শব্দ করে ডাকে। এলউইন সিমন্‌স ছবিতে দেখা এই প্রাণীটির নাম রাখলেন 'সোনালি-মাথা-শিফাখা' !
সোনালি-মাথা-শিফাখা কখনওই

কোনও প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম হতে পারে না ! এলউইন ১৯৭৪ সাল থেকেই অদ্ভুত এক দোটানায় ভুগছিলেন। এটা কোন্ প্রজাতির লেমুর ? কই, তিনি তো এরকম কোনও লেমুর আগে কোথাও দেখেননি ! নতুন কোনও প্রজাতি ? তা হলে, এই লেমুরগুলির বৈশিষ্ট্য কী ?
বৈজ্ঞানিকভাবে লেমুরদের কোন্ গণ, কোন্ গোত্রের অন্তর্গত এরা ?
এলউইন সিমন্‌স তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন।
'সোনালি-মাথা-শিফাখা' একটি দুষ্প্রাপ্য, নতুন ধরনের প্রজাতি। এই ধরনের লেমুর মাদাগাস্কারেও খুব একটা বেশি নেই, সংখ্যায় বড়জোর কয়েকশো ! সিমন্‌স এই লেমুরগুলির বৈজ্ঞানিক নাম রেখেছেন প্রোপিথেকাস ট্যাটারসেলি ! ফোটোগ্রাফার আয়ান ট্যাটারসলের নামেই তিনি শেষ অবধি এই প্রজাতিটির নাম রাখলেন। দুষ্প্রাপ্য এক লেমুর-প্রজাতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেল একজন মানুষের নাম !
কারণ, এই দুষ্প্রাপ্য প্রজাতিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব শুধু মানুষের ! দেখতে হবে, ডোডো পাখিদের মতো এরাও যাতে আচমকা হারিয়ে না যায়।

ক্যালিফোর্নিয়া কনডর

মান্দান, তোয়াসিনা, কাদুকু আর শাস্‌তা !
লস অ্যাঞ্জেলিসের চিড়িয়াখানায় সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করেছে এই চার ভাইবোন ! সুসংবাদটি সঙ্গে-সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীর জীববিজ্ঞানী-মহলে।
প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম পাখি 'ক্যালিফোর্নিয়া কনডর'। যে ক'জনকে খুঁজে পাওয়া গেছে, নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের লস অ্যাঞ্জেলিস চিড়িয়াখানায় রেখে দেওয়া হয়েছিল।
বহু চেষ্টার পর, এই কনডর পাখিগুলি ডিম পেড়েছিল। তাও, সব মিলিয়ে মাত্র সাতটি ডিম। তার মধ্যে আবার দুটো ডিম অনিষিক্ত, তৃতীয় ডিমটি এক বৃহদাকার কনডর নিজেই ভেঙে ফেলে।
বাকি চারটে ডিম ফুটেই বেরিয়ে এসেছে চার-চারটে ক্যালিফোর্নিয়া কনডর ! ওদেরই নাম রাখা হয়েছে মানদান, তোয়াসিনা, কাদুকু আর শাস্‌তা।
সংরক্ষিত রেড-ইন্ডিয়ান উপজাতির নামে নাম রাখা হয়েছে ওদের।

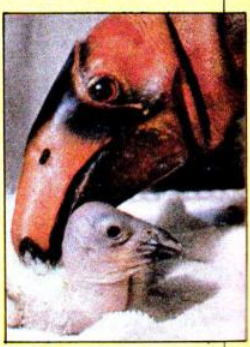

ওরাও আজ সংরক্ষিত। সমস্ত পৃথিবীতে, মান্দান আর কাদুকুদের ধরে, ক্যালিফোর্নিয়া কনডরের সংখ্যা মাত্র বত্রিশ !
তবু, ওরা আশা জাগিয়েছে। 'সান দিয়েগো বন্যপ্রাণী পার্ক'-এর সংরক্ষক উইলিয়ম টোনি বলেছেন, 'সংখ্যা বৃদ্ধি হলেই কনডরদের আবার ছেড়ে দেওয়া হবে ওদের নিজস্ব বাসভূমিতে।'

গৌতম চক্রবর্তী

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষা

অমর দাশ

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (নতুন বছরের) পরামর্শ আগেই এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষার মাধ্যমেও প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে প্রচুর লোক নিয়োগ করা হয়। অনেকের ধারণা, কেবলমাত্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যই ইউ·পি·এস·সি'র পরীক্ষাগুলি রয়েছে। তা কিন্তু নয়। একটু ধৈর্য ধরে অনুশীলন করলেই স্টাফ সিলেকশন কমিশন পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষায় যে-কোনও পরীক্ষার্থী সফল হতে পারেন।

১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে স্টাফ সিলেকশন কমিশন তৈরি করা হয়। সারা দেশে এর অফিস রয়েছে এলাহাবাদ, বোম্বে, কলকাতা, দিল্লি, গুয়াহাটি এবং মাদ্রাজ— ছ'টি আঞ্চলিক অফিস এবং রায়পুরের (মধ্যপ্রদেশ) একটি উপ-আঞ্চলিক অফিস। সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী-পদের জন্য কমিশন বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন করেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড এগজামিনেশন, ১৯৮৮

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি। এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ৪ নভেম্বর, ১৯৮৯। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ৪ ডিসেম্বর '৮৯। এই পরীক্ষায় বসতে হলে যে-কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। বয়ঃসীমা ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, রেলওয়ে বোর্ড সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস, আর্মড ফোর্সেস হেড কোয়ার্টার্স সিভিল সার্ভিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড পদে চাকরির সুযোগ পাওয়া যায়। একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, ১৯৮৮ সালের এই

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের প্রতীক-চিহ্ন

পরীক্ষা দেরিতে নেওয়া হচ্ছে বলে বয়স ১ জানুয়ারি ১৯৮৮ তারিখের হিসেবেই ধরা হবে।

এবার পরীক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা যাক। তিনটি পত্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথম পত্রে অ্যারিথমেটিক। দেড়শো নম্বরের পরীক্ষা। সময় আড়াই ঘণ্টা। দ্বিতীয় পত্রে থাকে জেনারেল নলেজ। দেড়শো নম্বরের পরীক্ষা। সময় আড়াই ঘণ্টা। তৃতীয় পত্রে জেনারেল ইংলিশ অথবা জেনারেল ইংলিশ এবং হিন্দি। দু'শো নম্বরের পরীক্ষা। সময় তিন ঘণ্টা। প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতিটি পত্রেই অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকে। অ্যারিথমেটিক এবং জেনারেল নলেজ বিষয়ের প্রশ্ন ইংরেজি এবং হিন্দি দুটি ভাষাতেই থাকে। অ্যারিথমেটিক প্রথম পত্রে থাকে নাম্বার, গ্রাফস, এলিমেন্টারি স্ট্যাটিসটিকস এবং অ্যারিথমেটিক সংক্রান্ত প্রশ্ন। দ্বিতীয় পত্রে থাকে ভারতের ভূগোল এবং ইতিহাস -সংক্রান্ত প্রশ্ন। তা ছাড়া দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপরও প্রশ্ন থাকে। তৃতীয় পত্রে প্রশ্ন থাকে স্নাতক-মানের। যাঁরা এই পত্রে ইংরেজি এবং হিন্দি বিষয়ে পরীক্ষা দেন, সেক্ষেত্রে ইংরেজিতে থাকে ৫০ নম্বর এবং হিন্দিতে ৫০ নম্বর। পরীক্ষার ফি আঠাশ টাকা। সাদা কাগজে প্রোফর্মা অনুযায়ী আবেদন করতে হয়।

ইনভেসটিগেটর এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৯। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৫ মার্চ, ১৯৯০। আবেদন করার শেষ তারিখ ৮ জানুয়ারি, ১৯৯০। শিক্ষাগত যোগ্যতা ইকনমিকস, স্ট্যাটিসটিকস অথবা ম্যাথমেটিকসসহ গ্র্যাজুয়েশন। বয়স হওয়া চাই ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে।

ট্রান্সমিশন এক্সিকিউটিভ এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ৬ জানুয়ারি, ১৯৯০। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল, ১৯৯০। আবেদন করার শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০। বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক। উপরন্তু সাহিত্য, নাটক কিংবা বিতর্কের ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়া চাই। বিজ্ঞান বিষয়ে কিংবা সাহিত্য বিষয়ে দক্ষতা থাকলে ভাল হয়। আঞ্চলিক ভাষায়ও দখল থাকা চাই। যারা বি·এ·, বি·এস্‌সি·, বি·কম· পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী পাননি অথচ এম·এ·, এম·এস্‌সি·, এম·কম· পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছেন কিংবা যাঁরা দ্বিতীয় বিভাগে আইনের স্নাতক হয়েছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। ট্রান্সমিশন এক্সিকিউটিভের কী কাজ এ-নিয়ে অনেকের মনে কৌতূহল আছে। মোট কথা, এই পদের ওপর সেই কেন্দ্রের ট্রান্সমিশনের দায়িত্ব বর্তায়। এই পদ থেকে প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর, স্টেশন ডিরেক্টর পদেও উন্নীত হওয়া সম্ভব। পরীক্ষার ফি : আট টাকা।

দেড়শো নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। জেনারেল ইনটেলিজেন্স ৫০ নম্বর, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বর, ইংরেজি ৫০ নম্বর। সময় দেড় ঘণ্টা। জেনারেল

অ্যাওয়ারনেসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, ভারতের সংবিধান এবং বর্তমান ঘটনার ওপর প্রশ্ন থাকে। ইংরেজিতে থাকে ভোকাবুলারি, গ্রামার, সেনটেন্স স্ট্রাকচার, সিনোনিমস, অ্যান্টোনিমস প্রভৃতি। এ ছাড়া থাকে কমপ্রিহেনশন টেস্ট। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে ডাকা হয়।

গ্রেড 'ডি' স্টেনোগ্রাফারস এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ মে ১৯৯০। পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ১০ ফেব্রুয়ারি। আবেদন করার শেষ তারিখ ১২ মার্চ। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক। বয়স হওয়া চাই ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। আড়াইশো নম্বরের অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকে জেনারেল নলেজ, এসে এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে।

সাব-ইনসপেক্টর অব দিল্লি পুলিশ এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৭ জুন, ১৯৯০। এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ১০ মার্চ। আবেদন করার শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। যে-কোনও শাখার স্নাতকরাই আবেদন করতে পারেন, ১৮ বছর থেকে ২৩ বছরের মধ্যে।

এবার পরীক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত জানা দরকার। দুই ভাগে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পার্ট : ১-এ থাকে লিখিত পরীক্ষা ৬০০ নম্বরের এবং পার্ট : ২-এ থাকে পার্সোনালিটি টেস্ট ১০০ নম্বরের। পার্ট : ১-এর আওতায় প্রথম পত্রে জেনারেল টেস্ট, প্রশ্ন থাকে জেনারেল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি বিষয়ে। সময় দু' ঘণ্টা। মোট নম্বর ৪০০। দ্বিতীয় পত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট। হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে ১০০ নম্বর এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ১০০ নম্বর। দু' ঘণ্টার পরীক্ষা। জেনারেল ইনটেলিজেন্স এবং রিজনিং বিষয়ে প্রশ্ন থাকে অ্যানালজি, সিমিলারিটিজ অ্যান্ড ডিফারেন্সেস, প্রবলেম সলভিং, জাজমেন্ট ডিসিশন মেকিং, রিলেশনস কনসেপ্টস, অ্যারিথমেটিক্যাল রিজনিং প্রভৃতি। জেনারেল অ্যাওয়ারনেস-এর ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সমাজে তার প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন থাকে। দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল, অর্থনীতি, বিজ্ঞান-গবেষণা এবং প্রতিবেশী দেশের ওপরও প্রশ্ন করা হয়। ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টের ক্ষেত্রে অবজেকটিভ ধরনের কমপ্রিহেনশন টেস্ট, ইংরেজিতে ২৫ এবং হিন্দিতে ২৫ মোট ৫০ নম্বর এবং রাইটিং এবিলিটি টেস্ট, ইংরেজিতে ৭৫ এবং হিন্দিতে ৭৫ মোট ১৫০ নম্বর থাকে।

গ্রেড 'সি' স্টেনোগ্রাফার ওপেন এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২২ জুলাই। পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ৭ এপ্রিল। আবেদন করার শেষ তারিখ ৭ মে। শিক্ষাগত যোগ্যতা— মাধ্যমিক পাশ। বয়স হওয়া চাই ১৮ বছর থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

ইনসপেক্টর অব সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ইনকাম-ট্যাক্স এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৯ অগস্ট। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ২১ এপ্রিল। আবেদন করার শেষ তারিখ ২১ মে। যে-কোনও শাখার স্নাতকরাই আবেদন করতে পারেন। বয়স হওয়া চাই ১৮ বছর থেকে ২৫ বছরের

ডাকটিকিট

নরডিক স্ট্যাম্প

সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড—উত্তর গোলার্ধের এই পাঁচটি দেশের কিছু ডাকটিকিটে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মতো। এই বৈশিষ্ট্য হল, একই বিষয়কে নিয়ে একসঙ্গে ডাকটিকিট প্রকাশ করা। এইসব দেশের ডাকবিভাগগুলি ১৯৭১ সালে একটি সভায় স্থির করে যে, প্রতি তিন বছর অন্তর একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা প্রত্যেকেই ডাকটিকিট প্রকাশ করবে। ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের পরিভাষায় এগুলি 'নরডিক স্ট্যাম্প' নামে পরিচিত।

১৯৮৯-এর নরডিক স্ট্যাম্পের বিষয়বস্তু হিসেবে বাছা হয়েছে পাঁচটি দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক পোশাক সমূহকে। এই ডাকটিকিটগুলি সংগ্রহ করতে পারলে উত্তর গোলার্ধের পোশাক-আশাক সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে। এখানে সুইডেনের দুটি ডাকটিকিটে সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি করা সুইডিশ চাষিদের দুটি প্রিয় পোশাক দেখা যাচ্ছে।

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত নরডিক স্ট্যাম্পের বিষয়বস্তু ছিল ওই পাঁচটি দেশের বিভিন্ন শহরের দৃশ্য। উত্তর গোলার্ধের এই পাঁচটি দেশের প্রায় ৩০০ টি শহর এখন এক সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এবং সেই শান্তিপূর্ণ মেলবন্ধনে নরডিক স্ট্যাম্প এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

এখানে 'নরডিক-৮৬' উপলক্ষে প্রকাশিত সুইডেনের দুটি ডাকটিকিটে সুইডেনের দু'টি প্রাচীন শহরকে দেখা যাচ্ছে। প্রথম ডাকটিকিটে উপসালা

শহরে অবস্থিত প্রাচীন এবং সবথেকে বড় বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখা যাচ্ছে। অপর ডাকটিকিটে মূর্ত হয়েছে সপ্তদশ শতকের প্রাচীন শহর এস্‌কিলস্‌টুনার দৃশ্যবিশেষ।

মধ্যে। পরীক্ষার ফি আঠাশ টাকা। সেন্ট্রাল এক্সাইজ ইনসপেক্টর পদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা কিন্তু ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এ ছাড়া এই পদে পরীক্ষার ক্ষেত্রে দৈহিক যোগ্যতার কিছু ব্যাপার রয়েছে। যেমন উচ্চতা চাই ১৫৭·৫ সেমি, (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫ সেমি কম), চেস্ট ৮১ সেমি, ৩০ মিনিটে ৮ কি·মি· সাইক্লিং এবং ১৫ মিনিটে ১৬০০ মিটার হাঁটতে পারা। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা দরকার ১৫২ সেমি, ওজন ৪৮ কেজি, ১৫ মিনিটে ১ কিমি এবং ২৫ মিনিটে ৩ কিমি সাইক্লিং করতে পারা।

লিখিত পরীক্ষায় থাকে ৪০০ নম্বর। সময় দু'ঘণ্টা। জেনারেল ইনটেলিজেন্স ৮০টি প্রশ্নে ১৬০ নম্বর, জেনারেল ইংলিশে ৪০টি প্রশ্নে ৮০ নম্বর, অ্যারিথমেটিক্যাল এবিলিটিতে ৪০টি প্রশ্নে ৮০ নম্বর এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে ৪০টি প্রশ্নে ৮০ নম্বর থাকে। প্রশ্ন করা হয় অবজেকটিভ মালটিপল চয়েস ধরনের। জেনারেল ইংলিশে থাকে ভোকাবুলারি, গ্রামার, সেনটেন্স স্ট্রাকচার, সিননিমস, অ্যান্টোনিমস এবং কমপ্রিহেনশন। অ্যারিথমেটিক এবিলিটির ক্ষেত্রে থাকে পার্সেন্টেজ, রেসিও, প্রোপোরশন, এভারেজ, এস্টিমেশন, মেনসুরেশন, টাইম অ্যান্ড ডিসটান্স, রেসিও অ্যান্ড টাইম-সংক্রান্ত প্রশ্ন। পার্সোনালিটি টেস্টে থাকে ১০০ নম্বর।

ক্লার্কস গ্রেড এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৮ অক্টোবর ১৯৯০। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ২ জুন। আবেদন করার শেষ তারিখ ২ জুলাই। মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। বয়স হওয়া চাই ১৮ বছর থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। পরীক্ষার ফি বারো টাকা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরির সুযোগ পাওয়া যায়।

জেনে রাখা ভাল, দুশো নম্বরের অবজেকটিভ-মালটিপল-চয়েস ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হয়। সময় দু' ঘণ্টা। জেনারেল ইনটেলিজেন্স ৫০ নম্বর, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ৫০ নম্বর, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিচুড ৫০ নম্বর এবং ক্লারিক্যাল অ্যাপটিচুড ৫০ নম্বর। এ ছাড়া থাকে টাইপ রাইটিং টেস্ট।

স্টাফ সিলেকশন কমিশন ভবন

জুনিয়ার/সিনিয়ার হিন্দি ট্রানস্লেটর এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ৩০ জুন। আবেদন করার শেষ তারিখ ৩০ জুলাই। বয়স ১৮ বছর থেকে ২৮ বছরের মধ্যে এবং ১৮ বছর থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা— প্রার্থীকে হিন্দিসহ স্নাতক হতে হবে। ইলেকটিভ বিষয় হিসেবে ইংরেজি থাকতে হবে। ইংরেজি থেকে হিন্দি এবং হিন্দি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের অভিজ্ঞতা (দু'বছরের) থাকতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় জ্ঞান থাকলে আরও ভাল। লিখিত পরীক্ষা হয় দেড়শো নম্বরের মধ্যে। সময় দেড় ঘণ্টা। জেনারেল ইনটেলিজেন্স, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস-এ ৭৫টি করে প্রশ্ন থাকে। সব প্রশ্নই অবজেকটিভ, মালটিপল-চয়েস ধরনের।

অডিটর/ইউ·ডি·সি· এগজামিনেশন, ১৯৯০

পরীক্ষা হবে ২৫ নভেম্বর, ১৯৯০। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ৭ জুলাই। আবেদন করার শেষ দিন ৭ অগস্ট। যে-কোনও শাখার স্নাতকরাই আবেদন করতে পারেন। বয়স হওয়া চাই ১৮ বছর থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। পরীক্ষার ফি আঠাশ টাকা।

দুটি পত্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথম পত্রে থাকে জেনারেল ইনটেলিজেন্স ৭৫টি প্রশ্ন ৭৫ নম্বরের, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৭৫টি প্রশ্ন ৭৫ নম্বরের এবং কমপ্রিহেনশন ও ইংলিশ রাইটিং এবিলিটিতে ৫০টি প্রশ্ন ৫০ নম্বরের। সময় দু' ঘণ্টা। দ্বিতীয় পত্রে অ্যারিথমেটিক ৫০টি প্রশ্ন, ১০০ নম্বরের। সময় এক ঘণ্টা। প্রশ্ন থাকে অবজেকটিভ ধরনের। ইংলিশ কমপ্রিহেনশন ও রাইটিং এবিলিটির ক্ষেত্রে ভোকাবুলারি, গ্রামার, সেনটেন্স স্ট্রাকচার, সিননিমস, অ্যান্টোনিমস প্রভৃতি। দ্বিতীয় পত্রে থাকে পার্সেন্টেজ, রেসিও, প্রোপোরশন, এভারেজ, এস্টিমেশন, মেনসুরেশন, টাইম ও ডিসটান্স, রেসিও ও টাইম প্রভৃতির উপর প্রশ্ন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড এগজামিনেশন, ১৯৮৯

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৩ ডিসেম্বর। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ২৫ অগস্ট। আবেদন করার শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। যে-কোনও স্তরের স্নাতক আবেদন করতে পারেন। বয়স হওয়া চাই ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। পরীক্ষার নিয়মাবলী একই।

এসব পরীক্ষা ছাড়াও স্টাফ সিলেকশন কমিশন, সিনিয়র অবজার্ভার এগজামিনেশন, হিন্দি প্রধ্যাপক এগজামিনেশনও নিয়ে থাকেন। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা : ৫, এসপ্লানেড রো ওয়েস্ট, কলকাতা-৭০০০০১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অফিসের ঠিকানা : নবগ্রহ রোড, চেনিকুঠি হিল সাইড, গুয়াহাটি-৭৮১০০৩। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে বহরমপুর, বারাসত, বর্ধমান, কলকাতা, চুঁচুড়া, কোচবিহার, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, মালদা, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি ও সিউড়ি শহরে। পূর্বাঞ্চলীয় অফিসের আওতায় রয়েছে ওড়িশা, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। বিস্তারিত তথ্যের জন্য রিজিওনাল ডাইরেক্টরের সঙ্গে অথবা পূর্বাঞ্চলীয় অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মোবিয়াস স্ট্রিপ

গত শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মান জ্যোতির্বিদ অগাস্টাস ফার্দিনান্দ মোবিয়াস আবিষ্কার করেন এই মজার খেলাটি। খুব সহজেই খেলাটি তৈরি করে তোমাদের বন্ধুদের দেখাতে পারো।

খেলাটি তৈরি করতে লাগবে খবরের কাগজের একটি পাতা, রুলার, কাগজ কাটার কাঁচি, পেনসিল এবং আঠা।

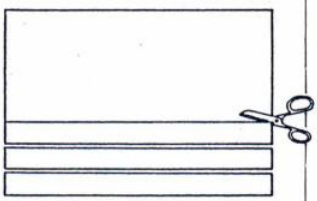

১। প্রথমে খবরের কাগজটা থেকে ৫ সেন্টিমিটার অন্তর লম্বা তিনখানা ফালি কেটে নাও।

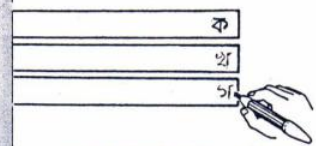

২। এবার সেই তিনটে ফালির একদিকে পর-পর ক, খ এবং গ পেনসিলে লিখে চিহ্ন করে নাও।

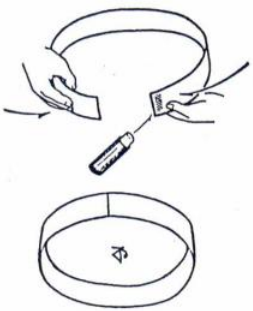

৩। 'ক' ফালিকে গোল করে বাঁকিয়ে দুটো মাথা যেভাবে ছবিতে দেখানো আছে সেইভাবে আঠা দিয়ে জুড়ে নাও।

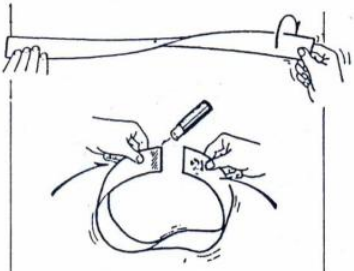

৪। 'খ' ফালিটা বাঁ দিকে একটা প্যাঁচ দিয়ে অর্থাৎ (১৮০ ডিগ্রি) বাঁকিয়ে দুটো মাথা আঠা দিয়ে আগের মতো জুড়ে নাও।

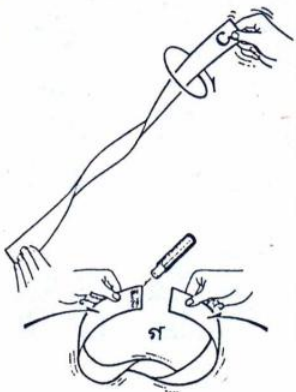

৫। এবার 'গ' ফালিটা 'খ' ফালির মতো পর-পর দু'বার প্যাঁচ দিয়ে অর্থাৎ (৩৬০ ডিগ্রি) বাঁকিয়ে স্ট্রিপের দু' দিকের মাথা আগের মতো একইভাবে আঠা দিয়ে জুড়ে ফ্যালো।

৬। এবার এই তিনটে ফালি ক, খ এবং গ-এর ঠিক মাঝখান দিয়ে সমান করে কাঁচি দিয়ে কেটে ফ্যালো।

৭। 'ক' ফালিটা কাটার পর দেখা যাবে, দু'খানা একই পরিধির বৃত্ত তৈরি হয়ে গেছে।

৮। 'খ' ফালিটা কাটার পর দেখা যাবে ঠিক দ্বিগুণ মাপের একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে।

৯। আর শেষে 'গ' ফালিটি কাটার পর দেখা যাবে দ্বিগুণ মাপের দু'খানা বৃত্ত তৈরি হয়েছে, তবে একটার সঙ্গে আর-একটা শিকলের মতো আটকে আছে।

কবির

প্রথম বিভাগে ফিরে এসে জখমের জন্য তিনজন সেরা খেলোয়াড় ছাড়া খেলতে নেমে প্রথম খেলাতেই রোভার্স অবিশ্বাস্যভাবে ৪-১ গোলে হেরে চুপসে গেছে। খেলা শেষে ড্রেসিং-রুমে হতাশ খেলোয়াড়দের সামনে রয়…
তোমরা মাথা তুলে দাঁড়াও ! জানি আঘাতটা প্রচণ্ড, কিন্তু কথা দিচ্ছি এমন ঘটনা আর ঘটতে দেব না…
রোভার্সের রয়
রয়ের অপেক্ষায় ক্লাবের সভাপতি স্যাম বার্লো…
রয়, তুমি নিশ্চয় ওদের খুব বকেছ ! আশা করি ওদের কিছু বাড়তি ট্রেনিংও দিয়েছ !
ইয়ে-ঠিক তা নয়, স্যাম…
ক'দিন ওদের স্টেডিয়ামে আসতে বারণ করেছি ! আর যা-ই হোক, এই মুহূর্তে বাড়তি ট্রেনিং-এর দরকার নেই !
কক্‌কী ?
রয়, তুমি বোধ হয় গুরুত্বটা বুঝতে পারছ না ! আমার মতে এক্ষুনি পরিচালক সমিতির জরুরি বৈঠক দরকার !
সেই রাতে…
এবার জখম খেলোয়াড়দের অবস্থা শোনো, রয় !
অবস্থা খারাপ ! চার্লি আর মার্ভিন কয়েক সপ্তাহ খেলতে পারবে না । ভার্নন এলিয়টের ছেঁড়া পেশি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে না !
মেলচেস্টার রোভার্স ফু. ক্লা.
ফিজিওথেরাপিস্টের মতে ও হয়তো আর কোনও দিনই খেলতে পারবে না !
সর্বনাশ !
তার মানে আমাদের নতুন লোক আনতে হবে !
ঠিক কথা !
প্রয়োজন হলে আমরা তোমাকে কুড়ি লক্ষ পাউন্ড দিতে পারি, রয় !
কুড়ি লক্ষ, অ্যাঁ ? সে তো অনেক টাকা, স্যাম…

(এর পরে আগামী সংখ্যায়) □

ক.....

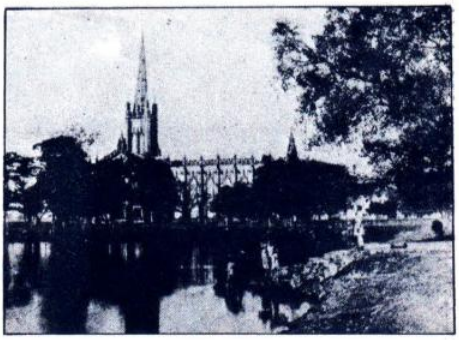

খ.....

কলকাতার তিনশো বছর চলছে। তিনশো বছর ধরে তিল-তিল করে গড়ে উঠেছে এই শহর, ধীরে-ধীরে সমৃদ্ধ হয়েছে, হয়ে উঠেছে আধুনিক। কিন্তু পুরনো দিনের কলকাতা কেমন, কেমন ছিল পুরনো হাওড়া ব্রিজ বা প্রিন্সেপঘাট, জানতে ইচ্ছে করে। তাই এবারে দেওয়া হল সেরকমই কয়েকটি ফোটো। ফোটো দেখে বলতে হবে কোনটি কিসের ফোটো।

গত সংখ্যায় ছিল কয়েকজন চিত্রশিল্পীর ছবি। (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (খ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (গ) অতুল বসু। (ঘ) নন্দলাল বসু। (ঙ) রামকিঙ্কর বেজ। (চ) বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। (ছ) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রত্নাকর

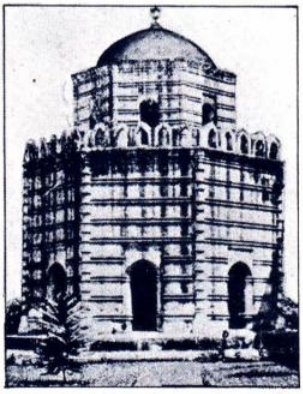

গ.....

ঘ.....

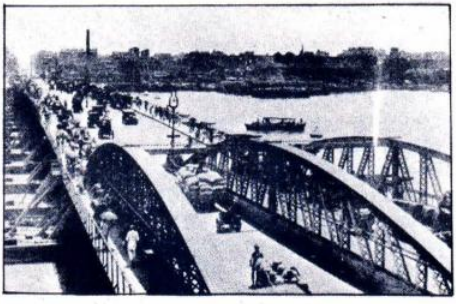

ঙ.....

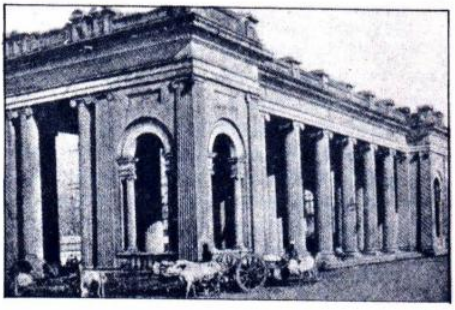

চ.....

হারিয়ে যাওয়া

অনীশ দেব

প্রথমে গিয়েছিল বিক্রম শর্মা আর রণবীর সেন। তার দু' মাস পরে সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। কিন্তু ওরা কেউই ফিরে আসেনি ওই রহস্যে-ঢাকা প্রাচীন জঙ্গল ফরেস্ট-এক্স থেকে! গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্যপ্রকৃতির বুকে খুশিমতো বেড়ে উঠে ঘন হয়েছে ওই রহস্যময় জঙ্গল। গবেষণার প্রয়োজনে ওটাকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছিল, প্রতি একশো বছর অন্তর-অন্তর অভিযান চালানো হবে ওই জঙ্গলের অভ্যন্তরে। খতিয়ে দেখা হবে তার গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর বিবর্তনের নানা লক্ষণ। পর্যবেক্ষণ করা হবে তাদের আচার-আচরণ প্রকৃতি।

আর সেই মতোই শুরু হয়েছিল প্রথম অভিযান।

তারপর···

'সেন্ট্রাল কন্ট্রোল'-এর চিফ ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী টেবিলে রাখা কম্পিউটার টার্মিনালের বোতাম টিপলেন। ভিডিও পরদায় ফুটে-ওঠা সবুজ লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ ছোট হল।

আমি টেবিলের এ-প্রান্তে বসে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। কাজ ছাড়া আমার মন বসে না। অলস থাকলে আমার অ্যালার্জি হয়। অবশ্য শুধু আমার নয়। অপারেশন ডিভিশনের সকলেরই এই একই অভ্যাস। মনোবিজ্ঞানের নানান পরীক্ষার মাধ্যমে অপারেশন ডিভিশনের লোক বাছাই করা হয়। তার মধ্যে দুটি প্রধান শর্ত হল : প্রার্থীকে কাজ-পাগল হতে হবে এবং তার মধ্যে কল্পনার ছিটে-ফোঁটাও থাকবে না।

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী কম্পিউটার ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "দাস, আপনাকে সংক্ষেপে ওদের হারিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। তবে কম্পিউটারের মেমোরিতে এ-বিষয়ে বিশদ তথ্য রয়েছে। আপনাকে তার একটা কপি করে দিচ্ছি। সময়মতো দেখে নেবেন।"

ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। একটা লুকনো সুইচ টিপতেই টেবিল ফুঁড়ে দু' গ্লাস শরবত উঠে এল। ব্রিগেডিয়ার ইশারা করতেই তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটা গ্লাস তুলে নিলাম। এই শরবতই আমাদের 'সেন্ট্রাল কন্ট্রোল' অফিসের একমাত্র সুষম পানীয়। এর সমস্ত উপাদান বিজ্ঞানীরা হিসেব করে ঠিক করেছেন। এই শরবত কর্মঠ লোকেদের কাজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

ব্রিগেডিয়ার ধীরে-ধীরে কথা বলছিলেন, "দাস, আপনি হয়তো জানেন, প্রাকৃতিক পৃথিবী থেকে গত আড়াইশো বছর ধরে আমরা বিচ্ছিন্ন। সারা পৃথিবীতে এখন সিনথেটিক ঘেরাটোপে ঢাকা চল্লিশ হাজার দু'শো শহর রয়েছে। পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচার জন্য এই ঘেরাটোপের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া ঘেরাটোপের মধ্যে আমরা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—খুশিমতো। ঘেরাটোপের এই কৃত্রিম অথচ আরামের পরিবেশে স্বস্তির মধ্যে বেড়ে উঠেছি আমরা। ফলে বাইরের প্রকৃতিতে পা রাখিনি। আমাদের যারা বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চায় তাদের এই অভ্যাস করানো হয় ছোটবেলা থেকেই।"

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, "জানি, সার।"

কারণ আমাকেও এই অভ্যাস করানো হয়েছে ছেলেবেলা থেকে। এখানকার নিয়ম অনুসারে ছেলেমেয়েদের বারো বছর বয়েস হলেই সরকারি সংস্থায় গিয়ে আই কিউ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হয়। এ ছাড়া তাদের নিয়ে অন্যান্য দৈহিক এবং মানসিক পরীক্ষাও চালানো হয়। এইসব পরীক্ষার ফল অনুযায়ী সরকার থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাদের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা ও পেশা। এইসব পরীক্ষার

রেজাল্ট দেখেই আমাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের জন্য। তারপর আট বছর পরে আবার একদফা পরীক্ষা নিয়ে তবেই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অপারেশন ডিভিশনে।

সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাকে বাইরের পরিবেশে রপ্ত করানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর তার জন্য প্রয়োজন হয়েছে সোশ্যাল লাইসেন্স। এরকম লাইসেন্স ওদেরও ছিল। ওই হারিয়ে যাওয়া চারজনের, বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। সুতরাং বাইরের দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে ছিল অভিযানের উপযুক্ত আত্মরক্ষার আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্র, আর প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও...

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী শরবতের গ্লাসে শব্দ করে চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। চিন্তাজড়ানো গলায় বললেন, "দাস, বাইরের পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তবে ফরেস্ট-এক্স, আমাদের সংরক্ষিত ওই জঙ্গল, ওদের কাছে নতুন। শর্মা আর সেন যখন রওনা হয় তখন আমরা ঠিক করেছিলাম, অভিযান শেষ করতে হবে দশদিনের মধ্যে। কিন্তু দু'মাস পরেও যখন ওরা ফিরল না,তখন পাঠালাম সিং আর মহান্তিকে। বুঝতেই পারছেন, ওরা পুরোপুরি আর্মড ছিল। ওদের সঙ্গে যে ব্লাস্টার ছিল তা দিয়ে ফরেস্ট-এক্সকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। যে-কোনও হিংস্র জন্তু ওই ব্লাস্টারের আক্রমণে স্রেফ ধুলো হয়ে যাবে। অথচ তা সত্ত্বেও ওই চারজনের কেউই ফিরে এল না। ব্যস, অভিযান মাথায় থাক, এখন দুশ্চিন্তায় গোটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ভেঙে পড়েছে। গভর্নমেন্ট নানা সন্দেহ করছে। যেখানে গত দুশো বছরে সারা পৃথিবীতে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মাত্র দশ হাজার মানুষ, সেখানে তিন মাসের মধ্যে চার-চারজন স্পেশ্যালিস্ট নিরুদ্দেশ! আনথিংকেবল, দাস। সেইজন্যই আপনাকে ডেকেছি।"

আমার শরবত শেষ হয়ে গিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার আবার লুকনো বোতামটি টিপলেন। খালি গ্লাস দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল টেবিলের গহ্বরে। টেবিল আবার যথারীতি মসৃণ। জানি, আমাদের চোখের আড়ালে ওই গ্লাস দুটো পরিষ্কার ও স্টেরিলাইজড হয়ে অপেক্ষা করবে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহারের জন্য।

ব্রিগেডিয়ারের আঙুল আবার চলে গেল কম্পিউটারের বোর্ডে। দ্রুত নড়াচড়া করল বোতামের ওপরে। ভিডিও পরদায় জটিল রঙিন ছবি ফুটে উঠল। ব্রিগেডিয়ার আপনমনেই বললেন, "ফরেস্ট-এক্স-এর টোপোলজিক্যাল ম্যাপ।" বলে একটা বোতাম টিপে তার একটা ছাপা কপি বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর পরদায় ফুটিয়ে তুললেন হারিয়ে-যাওয়া বিজ্ঞানীদের রুট-ম্যাপ। বের করে নিলেন সেটারও হার্ড কপি। আর সবশেষে অনেক পৃষ্ঠা ছাপিয়ে নিয়ে আমাকে লক্ষ করে বললেন, "এতে অভিযান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দিলাম। এ ছাড়া পাবেন ফরেস্ট-এক্স-এর বিষয়ে সমস্ত খবর—সেখানে আবহাওয়া কীরকম, কোন কোন ধরনের প্রাণী ওখানে আছে বলে এ-পর্যন্ত জানা গেছে। অবশ্য এ-সবই একশো বছরের পুরনো। তবু যদি আপনার কোনও কাজে লাগে।"

কম্পিউটার টার্মিনাল ছেড়ে ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারের বায়ুচাপ সামান্য বাড়িয়ে দিলেন। চেয়ারটা ইঞ্চি-চারেক উঁচু হল। তখন তিনি পলিথিন কভারে মুড়ে কম্পিউটারের প্রিন্টআউটের পুরো গোছাটা সামনে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতে দিলেন। তারপর

চেয়ারটাকে আবার ঠিক করে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। শেষে বললেন, "মনে করুন, ফরেস্ট-এক্স-এ গিয়ে আপনি দেখলেন···"

ব্রিগেডিয়ার বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই শুনছিলাম না। ভাবছিলাম, প্রায় চার বছর পরে আমি আবার 'বাইরে' যাব। আর এবারের যাওয়াটা অন্যান্য বারের মতো নয়। অন্যান্য বারে আমি বাইরে থেকেছি বড় জোর বারো ঘন্টার জন্য। সে নতুন কাউকে বাইরের আবহাওয়ায় অভ্যাসের ট্রেনিং দেবার জন্য, নয়তো কোনও অটো-টানেল পরীক্ষা করার জন্য, অথবা কোনও মহাকাশযান রওনা হওয়াকালীন নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এবারের অপারেশন অন্যরকম।

"···হঠাৎ করে যদি এইরকম কোনও ঘটনা হয়, তখন আপনি কী করবেন, দাস ?"

আমার খেয়াল হল, ব্রিগেডিয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে দেখছেন। আমার জবাবের অপেক্ষা করছেন। তিনি আবার বললেন, "বলুন দাস, তখন আপনি কী করবেন ?"

আমি হাসলাম। বুকের কাছে লুকনো আধুনিক জেনারেটর গানটা একবার অনুভব করলাম। তারপর বললাম, "আপনার কথা আমি কিছুই শুনিনি, সার···"

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর মুখ লালচে হতে লাগল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি বললাম, "শুনিনি, কারণ ধরি, মনে করি, যদি, হয়তো, সম্ভবত, এইসব শব্দ দিয়ে কোনও কথা শুরু হলে আমি বাকিটা আর শুনি না। কল্পনার ওপরে আমার কোনও আস্থা নেই, সার।"

ব্রিগেডিয়ার যে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি ওঁকে অপমান করতে চাইনি। কারণ এটাই আমার বরাবরের অভ্যাস। শুধু আমার কেন, আমাদের অপারেশন ডিভিশনের প্রত্যেকেরই। আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী আমার সম্পর্কে পুরো খোঁজখবর না নিয়ে আমাকে ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারে ডেকেছেন তা আমি মনে করি না। উনি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের প্রতিটি মানুষের পার্সোনাল কম্পিউটার কোড জানেন এবং টার্মিনালের বোতামে আঙুলের ডগা ছুঁইয়ে যে-কোনও সময়ে পড়ে ফেলতে পারেন আমাদের, আগাপাশতলা ইতিহাস। তা হলে এই মুহূর্তের অপমানিত ভাবটুকু কি ব্রিগেডিয়ারের অভিনয় ?

ঠিক সেই সময়ে ব্রিগেডিয়ারের ডান দিকে রাখা একটা ছোট্ট টিভির পরদায় একটা সবুজ সঙ্কেত ফুটে উঠল। দু'বার বিপ-বিপ শব্দ শোনা গেল। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ব্রিগেডিয়ার পরদার দিকে তাকালেন। ততক্ষণে সেখানে একজন লোকের রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে এবং সেই অতিথি ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

টিভির সামনে রাখা মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী একটা কোড নম্বর বললেন। পরক্ষণেই পালটা একটা নম্বর শোনা গেল স্পিকারে। ব্রিগেডিয়ার হাসলেন। বললেন, "প্লিজ কাম ইন।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু সুরেশ চোপরা। আট বছর ধরে মিশিগানে ছিল। মহাকাশযানের কঠিন জ্বালানি নিয়ে গবেষণা করছিল। এখন চলে আসছে জাপানে। সেই ফাঁকে এক মাস ভারতে থাকবে। আজ আমাদের সেলিব্রেট করার কথা। কিন্তু ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারটা···"

আমি নির্লিপ্তভাবে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর কথাগুলো শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, সুরেশ চোপরার জীবনী জেনে আমার লাভ কী। আর ফরেস্ট-এক্স-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কী ?

ইতিমধ্যে সুরেশ চোপরা ঘরে ঢুকে পড়েছেন এবং ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে করমর্দনের পর একটা বাতাস-চেয়ারে বসেও পড়েছেন। আমি ভাবছিলাম, এবারে বিদায় নিলে হয়, কিন্তু চিফ না নির্দেশ দিলে সেটা ভাল দেখায় না। সুতরাং চুপচাপ বসে রইলাম।

সুরেশ চোপরা ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছিলেন—পুরনো, নতুন, নানা কথা। আর ওঁরা দুজনেই খুব হাসছিলেন। কথায় কথায় সময় কাটতে লাগল। এক সময় এক গ্লাস শরবত টেবিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সুরেশ চোপরার জন্য। তিনি তখন মিশিগানের নানা মজার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। কথা থামিয়ে শরবতে চুমুক দিলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

এক হাতে শরবতের গ্লাস ছিল। অন্য হাতে ব্লাস্টারটা বের করে নিয়ে ব্রিগেডিয়ারের দিকে তাক করে ধরলেন সুরেশ চোপরা। তাঁর মুখের হাসি, শরবতের গ্লাস ধরে রাখার ভঙ্গি, এমনকী, ব্লাস্টার বের করে আনার কাজটিও এত স্বাভাবিক যে, চট করে তা নজর কাড়ে না।

কিন্তু আমার নজর কাড়ল।

স্লো মোশনে আমি সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলাম। ব্রিগেডিয়ারের মুখে একটা ফ্যাকাসে পরদা ছড়িয়ে গেল চকিতে। প্রযুক্তি এখন লক্ষ গুণে উন্নত হয়ে উঠলেও মানুষের কয়েকটি মৌলিক প্রতিক্রিয়া এখনও বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেইজন্যই সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফও ভয় পেলেন—মৃত্যু ভয় ! আর তখন সুরেশ চোপরার একটু আগের হাসিখুশি ভাবটা খুব ধীরে পালটাচ্ছিল।

আমার কাছে এই সুরেশ চোপরা লোকটা একজন অচেনা আগন্তুক ছাড়া কিছু নয়। সে হঠাৎ করে চিফের ঘরে ঢুকে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্লাস্টার তুলে ধরেছে। চুলোয় যাক মিশিগানের গবেষণার গল্প, আর চিফের সঙ্গে লোকটার পুরনো বন্ধুত্বের কাহিনী। এসব নির্ভেজাল সত্যি কি না তার কোনও প্রমাণ এখনও আমি পাইনি।

সুতরাং কয়েকশো মিলিসেকেণ্ড ভাবনাচিন্তার পর আমি মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আধ পাক গড়িয়ে চোপরার বাতাস-চেয়ারে সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলাম। এবং জেনারেটর গান তাক করে লো-লেভেল ফায়ার করলাম।

লাথির চোটে চোপরা টাল খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন। তার ওপর লো-লেভেল ফায়ারে পলকে অসাড় হয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেলেন।

ট্রিগারে চাপ দিলে জেনারেটর গান থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী আহিত-কণার স্রোত বেরিয়ে আসে। এই আহিত-কণার তীব্রতা তিন রকমের হয় ; লো-লেভেল, হাই-লেভেল, আর আলট্রা-হাই-লেভেল। লো-লেভেল ফায়ারে কোনও মানুষ ঘণ্টা-দেড়েকের জন্য শুধু অসাড় হয়ে থাকে। হাই-লেভেলে তার চেতনা ফিরবে সাত দিন চিকিৎসার পরে। কেউ-কেউ আবার ওপরেও চলে যায়। আর আলট্রা-হাই ফায়ারিংয়ে সরাসরি নামের আগে চন্দ্রবিন্দু। যেহেতু চিফের কথা সত্যি কিংবা মিথ্যে দুই-ই হতে পারে তাই চোপরাকে লো-লেভেল ট্রিটমেন্ট করেছি। সত্যি-সত্যি চিফ কোনও পুরনো বন্ধু হারাক তা আমি চাই না।

মেঝে থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখি ব্রিগেডিয়ার আবার স্বাভাবিক ভাব ফিরে পেয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তাঁকে খানিকটা উদ্বিগ্নও মনে হল। সেটার কারণ আঁচ করতে পেরে আমি বললাম, "লো-লেভেল ডোজ দিয়েছি, সার। কিন্তু সত্যিই কি উনি আপনার বন্ধু ?"

চিফ হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ওকে আমিই এ-সময়ে আসতে

বলেছিলাম। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য। আর আমি চোপরা সম্পর্কে আপনাকে আগে থাকতেই সাজেশন দিয়েছিলাম যাতে আপনি ওকে নিরাপদ মনে করেন। সেই অবস্থায় দেখতে চাইছিলাম আপনি কত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিতে পারেন।"

আমি সামান্য হেসে কুণ্ঠিতভাবে বললাম, "পরীক্ষায় কি আমি পাশ করেছি?"

চিফ বললেন, "বসুন, দাস।"

আমি বসলাম।

"এই পরীক্ষা আমি করেছি আপনার কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য নয়। শুধু এটা দেখতে যে, ফরেস্ট-এক্স থেকে আপনার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কি না।" ব্রিগেডিয়ারের গলার স্বর কিছুটা ভারী হল, "আমার ধারণা ওই গভীর জঙ্গলে এমন কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণী আছে যাকে আমাদের আধুনিক কোনও অস্ত্র ঘায়েল করতে পারে না। আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি হয়তো প্রাণ দিয়েছে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীর আক্রমণে। আমাদের অজানা-অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। কিন্তু আমি চাই, আপনি ফিরে আসুন। ওদের জীবিত অথবা মৃত সঙ্গে নিয়ে—অথবা না নিয়ে। আপনাকে আমি ফেরত চাই, দাস। কারণ ফরেস্ট-এক্স-এর রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।"

কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী। গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন বোধহয়। তারপর মুখ তুলে বললেন, "আপনি কাল ছ'টার সময়ে রওনা হয়ে পড়ুন। সাত দিনের মধ্যে যদি আপনি রিপোর্ট ব্যাক না করেন তা হলে ব্যাপারটা রীতিমত মারাত্মক হয়ে উঠবে। তখন হয়তো ওই বায়ো-রিজার্ভটাকে—মানে, ফরেস্ট-এক্সকে ডেস্ট্রয় করে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। এনিওয়ে, আই ওয়ান্ট য়ু ব্যাক, দাস—অ্যাট এনি কস্ট।"

"আমি তা হলে কাল ছ'টার সময় রওনা হচ্ছি, সার।"

"হ্যাঁ। উইশ য়ু বেস্ট অব লাক।" ব্রিগেডিয়ার শুভেচ্ছা জানালেন আমাকে। তারপর আমি যেই উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি উনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, "এ-ঘরের কথাবার্তা কারও সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে চোপরার ব্যাপারটা। আর অপারেশন ডিভিশনের চিফকে যেটুকু বলার আমি বলে দিচ্ছি।"

"ও কে সার।"

বলে সুরেশ চোপরার দিকে একবার দেখলাম। পাথর হয়ে শুয়ে আছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। সবে মাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে। দেড় ঘণ্টা হতে এখনও এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট দেরি!

অটো-টানেলের স্বচ্ছ দেওয়াল ঘণ্টায় পাঁচশো কিলোমিটার বেগে পিছনে ছুটে যাচ্ছিল। আমি চোখ বুজে গাড়িতে বসে আছি। কারণ অটো-টানেলে যেসব গাড়ি চলে সবই কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত।

ঘেরাটোপে ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে অটো-স্টেশনে এসে আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নিজস্ব গাড়ি বেছে নিয়েছি। এই বেছে নেওয়ার কাজটাও কম্পিউটার পরিচালিত। আইডেন্টিফিকেশান ও ভয়েস চেক পজিটিভ হলেই অটো-টানেলের লক খুলবে। তারপর গাড়িতে উঠে ভ্রমণের সম্পূর্ণ মানচিত্র গাড়ির কম্পিউটারের বোতাম টিপে জানাতে হবে। তা হলেই 'কৃত্রিম বুদ্ধিমান' গাড়ি যাত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। গাড়িগুলোতে দু'জনের বসার জায়গা আছে। তবে আমি চলেছি একা।

আমাদের কাছাকাছি শহরগুলো সবই অটো-টানেল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। আর দূরের যাত্রাপথে আমরা স্পেস-প্লেন ব্যবহার করি। এই প্লেন আবহাওয়ামণ্ডল ছাড়িয়ে উঠে যায় মহাশূন্যে। তারপর মোট উড়ানের সিংহভাগটাই সম্পন্ন করে মহাশূন্যে। অবশেষে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে আবহাওয়ামণ্ডল কেটে নেমে আসে নির্দিষ্ট প্লেন-পোর্টে।

ফরেস্ট-এক্স-এ যাবার জন্য স্পেস-প্লেন আমি পছন্দ করিনি। কারণ তাতে জেট ল্যাগের জন্য শরীর ভারী হয়ে থাকে। আমার কাজ শুরু করতে অসুবিধে হবে। তাই অপেক্ষাকৃত আরামের অটো-টানেল ভ্রমণই বেছে নিয়েছি। অটো-টানেলের গাড়ির কোনও চাকা নেই। ম্যাগনেটিক লেভিটেশানে টানেলের অটো-লাইন থেকে কয়েক মিলিমিটার ওপর দিয়ে ভেসে চলে। সুতরাং ঝাঁকুনির কোনও ব্যাপার নেই। আর ইচ্ছে করলে গাড়ির গতিবেগ আমি ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত তুলতে পারি। কিন্তু আমার কোনও তাড়া নেই। বরং ধীরেসুস্থে সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় আমি ফরেস্ট-এক্স-এর সীমানায় পৌঁছতে চাই। যে করে হোক হারানো চারজনকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। যে করে হোক।

আমি চোখ খুললাম। সাপের মতো টানেল ধরে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। পাশের সিটে রাখা ব্রিগেডিয়ারের দেওয়া কম্পিউটার প্রিন্টআউটগুলো তুলে নিলাম। এর আগে তিন বার এগুলো খুঁটিয়ে পড়েছি। পড়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি ওই চারজনের মধ্যে কোথায়-কোথায় মিল রয়েছে, আর কোথায়ই বা অমিল। এ ছাড়া, ফরেস্ট-এক্স-এর প্রাণীর তালিকাটাও দেখেছি বারবার। তাদের বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে ছবি। ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করেছি কোন ভয়ঙ্কর জন্তু ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি। কিন্তু নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। তবু আর-একবার ওগুলো পড়তে শুরু করলাম : প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ··· । তারপর নিজের মনেই বললাম, "বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি, ···তোমরা হারিয়ে গেলে কেন?"

এমন সময় চোখ গেল কম্পিউটার ডিসপ্লে প্যানেলের দিকে। ফরেস্ট-এক্স স্টেশনে পৌঁছতে আর আধঘণ্টা বাকি। এই সময়টুকু দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

অটো-টানেল স্টেশনের পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে একটা বিশেষ বোতাম টিপলাম। মাথার ওপর থেকে গাড়ির স্বচ্ছ ছাদ সরে গেল। দরকারি একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি থেকে। ছাদ আবার জায়গামতো বসে গেল। পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে রিকগ্‌নিশান লক করে দিলাম। আমি ছাড়া এই গাড়ি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। গাড়ির কম্পিউটার-চোখ শুধুমাত্র আমাকে চিনতে পারলেই দরজা খুলবে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ঘেরাটোপে ঢাকা স্টেশনের এক নির্জন কোণে কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে এসে দাঁড়ালাম। হারিয়ে যাওয়া ওই চারজনকে নিয়ে যখন আমি ফিরে আসব তখন আমার জন্য বাড়তি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে এই কম্পিউটার টার্মিনাল। এই স্টেশনটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অধীনে। সুতরাং, এখন এখানে মানুষ বলতে একমাত্র আমি।

কম্পিউটার চালু করে টার্মিনালের বোতাম টিপে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি ঠিকমতো স্টেশনে পৌঁছেছি এবং এক্ষুনি কাজে নামছি। তারপর প্যাকেট খুলে জারকোনিয়াম অক্সাইডের আস্তরণ দেওয়া বিশেষ ধরনের সিনথেটিক পোশাক বের করে পরে নিলাম। এই পোশাক আগুন, তাপ, জল ও জীবাণুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। জেনারেটর গান, লেসার ব্লাস্টার, বিপার ইত্যাদি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ঠিকমতো পরীক্ষা করে পোশাকের নানা জায়গায় ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর ট্রান্সমিটার ও ঘন

খাবারের টিন কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরোলে সব সময়েই দেখেছি শরীর ও মনের ওপরে একটা ধাক্কা লাগে। অথচ বাইরে আমি সব মিলিয়ে প্রায় দুশো ঘণ্টারও বেশি থেকেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে বাইরের জগৎটাকে সব সময় নতুন বলে মনে হয় কে জানে!

মাঝ-বেলার সূর্যের কিরণ পিঠের ওপরে আছড়ে পড়ছে। বাতাস বইলেও সেটা পোশাকের জন্য টের পাচ্ছি না। তবে দেখতে পাচ্ছি, লম্বা-লম্বা ঘাসের ঝোপ এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সামনে দূরে ছোট-বড় পাথুরে টিলা। আর অসমান জমিতে আগাছার জঙ্গল। বাইরের নির্জন বিশালতা আমাকে যেন একটু ভয় পাইয়ে দিল।

কিছুটা দূরেই চোখে পড়ছে ফরেস্ট-এক্স। ঘাসের ঝোপ আর আগাছার জঙ্গল সেদিকপানে যতই এগিয়েছে ততই যেন ঘন হয়েছে, আর উচ্চতায় বেড়ে উঠেছে। তারপর শুরু হয়েছে সবুজ পাতায় ঢাকা মহীরুহের জটলা।

পকেট থেকে গ্রাফিক্স রুট-ম্যাপটা বের করে নিলাম। তারপর রওনা দিলাম।

জঙ্গলের ভেতরে কয়েক পা এগোতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরল আমাকে। জঙ্গল আমি আগে যা দেখেছি সবই ছবিতে—কম্পিউটার সিমুলেশনে। কিন্তু সত্যিকারের একটা প্রাচীন জঙ্গলের মধ্যে কেমন এক বিচিত্র গন্ধও মিশে আছে। আর সেই সঙ্গে রয়েছে নানা শব্দ। কয়েকটি পাখির ডাক বলে আন্দাজ করতে পারলাম। কিন্তু অন্য শব্দগুলো কিসের?

স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে পা ফেলতে বা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎই পায়ের কাছে সাপের মতো কী একটা নড়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ব্লাস্টার তাক করে ফায়ার করলাম। সাদা আর বাদামি ডোরাকাটা সরীসৃপটার মাথায় ছোট-ছোট দুটো শিংয়ের মতো কী রয়েছে। আর তার মাঝে একথোকা কালো চুল। ওটার শরীর মাঝখান থেকে দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল। টুকরো দুটো কিলবিল করে নড়ছিল। আমি সেটা লক্ষ করছিলাম। এই প্রাণীটার কথা ব্রিগেডিয়ারের কম্পিউটার প্রিন্টআউটে পাইনি। এই রহস্যময় জঙ্গল হয়তো এরকম বহু অজানা-অচেনা প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছে। আর তাদেরই কেউ হয়তো ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি।

তখনই চোখ পড়ল আরও দুটো অদ্ভুত প্রাণীর দিকে। চেহারায় ভোঁদড়ের মতো, তবে লম্বায় প্রায় দেড়গুণ। আর সামনের পায়ে ধারালো বিশাল নখ, গায়ের রং সবুজ, তার ওপরে কালচে ছোপ। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আগাছার ঝোপ চিরে সরীসৃপটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। সামনের নখে দুটো টুকরো দুজনে বিঁধিয়ে ছিটকে চলে গেল ঝোপের আড়ালে।

আমি এক পা পিছিয়ে এসে ব্লাস্টার তাক করেছিলাম, কিন্তু ফায়ার করিনি। মনে হয়েছিল, আমার এই পোশাক ভেদ করে চট করে কোনও ক্ষতি ওরা করতে পারবে না।

প্রাণী দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতেই আমি সামনে পা বাড়ালাম। এগুলোর ছবি কম্পিউটার প্রিন্টআউটে দেখেছি। মার্কেনস্ক। একই সঙ্গে তৃণভোজী এবং মাংসাশী। এরা খায় না এমন জিনিস নেই। তবে মৃত প্রাণীদের শরীরে দাঁত-নখ বসাতে এরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।

ক্রমেই সূর্যের আলো গাছের অসংখ্য পাতায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে। শ্যাওলা-ধরা বড়-বড় গাছের গুঁড়ির গায়ে নানা রকমের পরজীবী লতা। তাদের কোনও কোনওটায় ফুটে রয়েছে বিচিত্র আকার এবং রঙের বাহারি ফুল। আর তাদের ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে রংবেরঙের একঝাঁক প্রজাপতি। এইসব প্রজাপতি ও ফুলের নিখুঁত ছবি আমি দেখেছি। তবে আসল জিনিসটা চোখের সামনে দেখে কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয়। কী যে হল, জীবাণুর ভয় না করেই হাতের দস্তানা খুলে একটা গোলাপি ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। গোলাপি ফুলটার পাপড়িগুলো সুষম ছন্দে কাঁপতে লাগল, আর তার রং পালটাতে লাগল ধীরে-ধীরে। গোলাপি-লাল-বেগুনি-নীল-হলদে-গোলাপি····

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। একটু পরেই ফুলটা হলদে রঙে তৃতীয়বার পৌঁছে তার রং-বদলের খেলা শেষ করল। রামধনু ফুল ফরেস্ট-এক্স-এর অলঙ্কার। আমি মুগ্ধ চোখে তখনও ফুলটাকে দেখছিলাম।

সেই কারণেই পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণকারীকে দেখতে পাইনি। সুতরাং প্রথম আঘাতের ধাক্কা আমাকে ছিটকে ফেলে দিল বুনো ঘাসে ছাওয়া ভেজা মাটিতে। মাথা ঠুকে গেল কোনও বিশাল গাছের শক্ত শেকড়ে। আর তখনই আক্রমণকারীকে চোখে পড়ল। বুলবোয়া! দু'পেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী। হাত বলে কিছু নেই, তবে দেহে অসম্ভব শক্তি। গায়ে একটুও লোম নেই। বড়-বড় লাল চোখ। লম্বা ধারালো দাঁত। পিছনে কুমিরের মতো মোটা কাঁটাওয়ালা লেজ।

অদ্ভুত গর্জন করে বুলবোয়াটা আমার ওপরে দ্বিতীয়বার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই আমি বাঁ হাতে ব্লাস্টারের ট্রিগার টিপলাম। বুলবোয়ার বিশাল মাথাটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওটার গর্দান থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল, আর পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে ভারী বাতাসে। জমি কাঁপিয়ে শব্দ করে আছড়ে পড়ল জন্তুটার বিশাল দেহ। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তাজ্জব করে দেওয়া ক্ষিপ্রতায় প্রায় এক ডজন মার্কেনস্ক কোথা থেকে হাজির হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতদেহটার ওপরে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক করে নিলাম। দস্তানাটা হাতে পরে নিয়ে আরও জোরে পা চালালাম। একটা জিনিস আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল। মার্কেনস্করা কেমন করে মৃতদেহের খোঁজ পায়? ওরা যেভাবে কোনও সদ্য মৃত প্রাণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাতে মনে হয়, ওই নিখোঁজ চারজন যদি এই জঙ্গলে মারাও গিয়ে থাকে তবু তাদের কোনও চিহ্নই আমি পাব না। কিন্তু কোনও-না-কোনও সূত্র যে আমাকে পেতেই হবে! বেশ চিন্তিতভাবে আমি পথ চলতে শুরু করলাম আবার। মাথার পিছনটা অল্প-অল্প ব্যথা করছিল।

জঙ্গল ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। বেলা পড়ে আসার ঢের আগেই চারদিক আঁধার হয়ে আসছে। রাতটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সুতরাং পুরনো নিয়ম মেনে একটা জুতসই গাছ বেছে নিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। কয়েকটা বড়-বড় ডালের জোড়ের কাছে গুছিয়ে বসলাম। তারপর পকেট থেকে টেপ-রেকর্ডার বের করে এখন পর্যন্ত যা-যা হয়েছে সব বিবরণ বলে গেলাম। টেপ বন্ধ করে বিপারটা অন করে দিলাম। এই বিপারের সঙ্কেত সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের মেইনফ্রেম কম্পিউটারে পৌঁছে যাবে। তা থেকে ওরা জানতে পারবে আমি এখন জঙ্গলের ঠিক কোন জায়গায় আছি।

সামান্য খাবার খেয়ে নিয়ে আমি শোবার আয়োজন করলাম। আলো সরে গিয়ে আঁধার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। কানে আসছে নানা বিচিত্র শব্দ। তার মধ্যে কয়েকটা সুর বেশ মিষ্টি। রাতের কোনও পাখি জেগে উঠল নাকি?

একটু পরে যখন ঘুমে চোখ বুজে এল তখন রামধনু ফুলটার রং-বদলানো পাপড়ির কথা আমার মনে পড়ছিল।

সে-রাতে অনেক বছর পর আমি স্বপ্ন দেখলাম। আমাকে ঘিরে অসংখ্য রামধনু ফুলের দল পাগলের মতো তাদের পাপড়ির রং পালটে চলেছে।

সকালে ঘুম ভাঙল পাখির গানে। রেকর্ড-করা এই গান আগে অনেক শুনেছি। আমাদের যে-কোনও শহরে বহু কৃত্রিম বাগিচা আছে যেখানে নকল ফুল ফোটে, যন্ত্রের পাখিরা উড়ে বেড়ায়, গান গায়। কিন্তু ঝকঝকে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে, অসংখ্য রঙিন ফুল ছুঁয়ে যে-গান এখন ভেসে আসছে তার আকর্ষণ ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। পাতার ফিসফিস শব্দ আর পাখির সুর যেন একে অপরের যুগলবন্দী।

গাছ থেকে নেমে তৈরি হয়ে আবার শুরু করলাম পথ চলা। চলতে চলতে টের পেলাম একটা খসখস শব্দ। না, একটা নয়, অনেক। আমাকে অনুসরণ করে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের আড়ালে কারা যেন চলেছে আমার পাশাপাশি। আমি পথ চলা থামালে সেই শব্দগুলোও থেমে যাচ্ছে। কারা এভাবে লঘু পায়ে অনুসরণ করছে আমাকে ?

উত্তরটা জানা দরকার। তাই পকেট থেকে খুদে অস্ত্রসম্ভারের প্যাকেটটা বের করলাম, তা থেকে বেছে নিলাম একটা সাউণ্ড ট্র্যাকার। তার ছুঁচলো মুখে ঘুমের ওষুধ মাখানো একটা ছুঁচ লাগিয়ে আন্দাজে ভর করে ফায়ার করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ কানে এল। আমি ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ্য করে। আগাছার ঝোপ আর লতাপাতার ঝাড় সরিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই চোখে পড়ল আমার অনুসরণকারীদের একজনকে। শব্দভেদী সাউণ্ড ট্র্যাকার নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। একটা মার্কোনিক্স।

বুঝলাম, মার্কোনিক্সের দল আড়ালে থেকে আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। ওরা বোধহয় আন্দাজ করেছে, আমার সঙ্গে পথ চললেই ওরা মৃতদেহ পাবে, ওদের খিদে মিটবে। তা সে মৃতদেহ আমারই হোক বা অন্য কোনও প্রাণীর।

ঘুমন্ত মার্কোনিক্সটার শরীর থেকে সাউণ্ড ট্র্যাকারটা তুলে নিয়ে সরে আসা মাত্রই প্রায় হাফ-ডজন মার্কোনিক্স ওটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল ওদের নির্মম কাটাছেঁড়া। ওরা বোধহয় সাউণ্ড ট্র্যাকারটা তুলে নেবার অপেক্ষায় ছিল। কারণ বিচিত্র চেহারার সাউণ্ড ট্র্যাকার একটা প্রাণীর শরীরে বিঁধে থাকা অবস্থায় ওরা ঠিক এগোতে সাহস পাচ্ছিল না।

আবার চলতে শুরু করলাম জঙ্গলের পথ ধরে। এবং টের পেলাম, একই সঙ্গে মার্কোনিক্সদের গোপন অনুসরণও শুরু হয়েছে। হোক। ওদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এভাবে কতদিন খোঁজ করব আমি ? ফরেস্ট-এক্স-এর ঘন জঙ্গলে, অন্ধকারে, শত্রুসঙ্কুল পরিবেশে এরকম এলোমেলো খোঁজ করে কোনও ফল পাওয়া যাবে কি ?

এইসব ভাবতে-ভাবতে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা ভারী কিছু আমার পিঠের ওপর পড়ে গড়িয়ে গেল মাটিতে। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্লাস্টার রেডি। কাঁটাওয়ালা একটা বিশাল সাপ। সারা গায়ে লাল আর রুপোলি ডোরা, আর তারই মাঝে শিরদাঁড়া বরাবর ধারালো সরু কাঁটা। চোখ দুটো নীল। আধো-আঁধারির মাঝে জ্বলছে দপদপ করে। না, এটার কথা রিপোর্টে নেই। কিন্তু প্রাণীটার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিবশ করে দিল। সাপটা বাতাস কেটে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ছোবল ছুঁড়ে দিল আমার পা লক্ষ্য করে, আর একই সঙ্গে লেজের কাঁটাওয়ালা দিকটা আছড়ে দিতে চাইল আমার গায়ে। ক্ষিপ্রতায় কোনও প্রাণীকে পরাস্ত করাটাই অপারেশন ডিভিশনের অপারেটরদের পেশা। সুতরাং ব্লাস্টার চালালাম। সাপটার শরীরের খানিকটা অংশ মিলিয়ে গেল বাতাসে। ওটা আমার পায়ে ছোবল মেরেছিল, কিন্তু স্টেইনলেস স্টিলের পাতে মোড়া বিশেষ ধরনের জুতো সেই ছোবল ভোঁতা করে দিয়েছে।

যথারীতি মার্কোনিক্সের দঙ্গল হামলে পড়ল সাপটার দেহের ওপরে। আমি সেদিকে না তাকিয়ে চলতে শুরু করলাম। আর ঠিক তখনই একটা সন্দেহজনক শব্দ আমার কানে এল, কারও পায়ের শব্দ। আমার পাশাপাশি চলেছে।

জঙ্গলের লতাপাতায় আমার হাত-পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছি, তখনই একটা গাছে আমার হাত লাগতেই খুব অস্পষ্টভাবে জলতরঙ্গের সুর বেজে উঠল। অদ্ভুত ঢিমে তালে বাজতে লাগল সেই বাজনা। আমার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। এ কোন ঘুমপাড়ানি গাছ ! এর কথা তো রিপোর্টে নেই ! বাজনার সুরটা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। আমি ঘোর-লাগা মানুষের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের জন্য পুরোপুরি ভুলে গেলাম নতুন পায়ের শব্দটার কথা। চেহারায় সাধারণ এই গাছ কোথা থেকে পেল স্বর্গীয় এই জলতরঙ্গের সুর ?

সংবিৎ ফিরতেই চলা শুরু করলাম এবং নতুন পায়ের শব্দটা আবার শোনা গেল। যেন ফরেস্ট-এক্স-এর মোহময় নেশা কাটাতেই আমি রীতিমত হিংস্রভাবে জেনারেটর গান বের করে নিলাম। তারপর শব্দ আন্দাজ করে এক সঙ্গে পুরো এক মিনিট লো-লেভেল ফায়ার করলাম। আর্তনাদ অথবা গোঙানির মতো একটা শব্দ হল। দূরের একটা ঝোপে কেউ যেন নড়াচড়া করল। আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজে বের করলাম শিকারকে। লতাপাতার জালে জড়িয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষ !

মানুষটার চেহারা ও পোশাক বড় অদ্ভুত।

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। খালি গা। কোমরে একটা নোংরা

কাপড় জড়ানো। আর ডান হাতের কাছেই পড়ে রয়েছে কাঠের ছুঁচলো ফলা লাগানো একটা বল্লম। এটা দিয়ে কি আমাকেই আক্রমণ করতে চাইছিল এই জংলিটা ?

ফরেস্ট-এক্স-এ-কোনও মানুষ আছে বলে জানতাম না। তাই একটু অবাক হলাম। অসাড় লোকটাকে ভাল করে দেখতে লাগলাম। তখনও ঝোপের আড়াল থেকে অল্পস্বল্প শব্দ পাচ্ছিলাম। বোধহয় মার্কোনিক্সদের দল উসখুস করছে। সুতরাং ঠিক করলাম, লোকটাকে সঙ্গে নেব। এর জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখব কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।

ঝুঁকে পড়ে দেহটা তুলে নেওয়ামাত্রই বৃষ্টি শুরু হল। মুখ তুলে ওপর দিকে দেখলাম। এক টুকরো আকাশও চোখে পড়ছে না। শুধু ঘন পাতায় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ। লক্ষ করলাম গাছের ডাল বেয়ে সরসর করে এগিয়ে চলেছে বেশ কয়েক রকমের ছোট-বড় চিত্র-বিচিত্র সাপ। বৃষ্টির জল ওদের চঞ্চল করে তুলেছে।

আমি জংলি মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর-পর লোকটাকে মাটিতে নামিয়ে দম নিচ্ছিলাম। হঠাৎই একসময়ে খেয়াল হল, জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ঘন কালো মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে। বৃষ্টি তখনও ধরেনি।

এর পর খুব তাড়াতাড়ি জঙ্গল ফিকে হয়ে এল। আর একই সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নতুন একটা শব্দ কানে আসছিল। গাছ-গাছড়ার ফাঁক দিয়ে মাঝারি মাপের একটা পাহাড়ের অংশ চোখে পড়ল। তার একটু পরেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মন যেন একটা ধাক্কা খেল।

অসাড় দেহটাকে ভিজে মাটির ওপরে নামিয়ে রেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম সামনের দৃশ্য।

বৃষ্টি এখনও পড়ছে। তবে ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি। ফলে তার মধ্যে দিয়ে দেখতে অসুবিধে হল না। আমার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মিটার দূরে একটা বিশাল হ্রদ। তার নীল জল চিকচিক করছে। হ্রদের কোল ঘেঁষে একটা পাহাড়। একটু আগে এই পাহাড়টাকেই আমি জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখেছি। পাহাড়ের মাথায় আর একপাশে অনেক গাছ চোখে পড়ছে। তাদের মাথায় মেঘ ফিকে হয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের নানা রঙের আলো। আর পাহাড়ের মাথায় লুকনো কোনও স্রোতস্বিনী থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ছে নীচের হ্রদে। তারই শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম জঙ্গলের ভেতর থেকে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা হ্রদের জলতলে পড়ে যেন খই ফুটছে। আর তারই গা থেকে ঠিকরে পড়ছে শেষ বিকেলের আলো। ঝরনার জলের ধারা থেকে বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল শত শত জলকণার রেণু। তাদের গায়ে ফুটে উঠেছে রামধনুর বর্ণালী। এতক্ষণ বাতাসের জোর বোঝা যায়নি। এখন তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

পায়ের কাছে একটা অচেতন দেহ ফেলে রেখে আমি সার্কাসের সঙের মতো মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃষ্টি আমি আগে দেখেছি। পাহাড়ও আমি দেখেছি। দেখেছি হ্রদ, ঝরনা, পড়ন্ত বিকেল, জঙ্গলের গাছপালা আর রঙিন ফুল। আমি জানি, এগুলোর নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এইসব জিনিস একসঙ্গে একই জায়গায় আমি কখনও দেখিনি। ফলে এখন টের পেলাম, প্রকৃতির এইসব টুকরো টুকরো ছবি জোড়া লেগে গোটা ছবিটা তৈরি হলে পর তার আকর্ষণের কোনও তুলনা নেই।

এরই মধ্যে বৃষ্টি থামল। মেঘ সরে পরিষ্কার হল আকাশ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ডুবে যাওয়া লাল সূর্যকে কিছুটা দেখা গেল। পিছনের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল পাখির ডাক আর অচেনা কোনও প্রাণীর চিৎকার। প্রকৃতির মধ্যে ওরাও আছে, আমরাও আছি।

এমন সময় পায়ের কাছে অচেতন হয়ে পড়ে থাকা মানুষটা এক ঝটকায় উঠে বসে আমার পা ধরে এক টান মারল। আমি ঘোর লাগা অবস্থাতেই টাল খেয়ে পড়ে গেলাম ঘাস-জমিতে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ব্লাস্টার বের করে ফায়ার করার জন্য উঁচিয়ে ধরলাম।

আমাকে ঠিক না চিনতে পারলেও জংলিটা বোধহয় লেসার ব্লাস্টার চিনতে পারল। তাই দু' হাত মাথার ওপরে তুলে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, "প্লিজ ডোন্ট শুট ! ডোন্ট শুট !...."

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দু' হাত মাথার ওপরে রেখে লোকটাও উঠে দাঁড়াল ধীরে-ধীরে। ওর সভ্য কথাবার্তা আমাকে চমকে দিয়েছিল। ব্লাস্টার উঁচিয়ে রেখেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে তুমি ?"

লোকটা বলল, "সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফ জুওলজিস্ট সত্যদেব সিং।"

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখতে লাগলাম। ফরসা শরীর রোদে-জলে কালচে, মুখে চুল-দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, পরনে বনবাসীর কৌপিন। আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের কী প্রাগৈতিহাসিক দশা ! কিন্তু কেন ? আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, রঘুনাথ মহান্তিই বা কোথায় ? সে কথাই জিজ্ঞেস করলাম সত্যদেব সিংকে। সেইসঙ্গে নিজের পরিচয়ও দিলাম। বললাম, কেন আমি এসেছি।

সত্যদেব বলল, "চলুন যেতে যেতে সব কথা বলছি।"

সূর্য ডুবে গেলেও শেষ বিকেলের আলো রয়ে গেছে। ঝরনার রিমঝিম শব্দ অনেক জোরালো মনে হচ্ছে এখন। আমরা দু'জন এগোলাম পাহাড়ের দিকে। কারণ সত্যদেব বলল, পাহাড়ের ও-পিঠেই নাকি সবকিছুর উত্তর রয়েছে।

আমি প্যাকেট থেকে খাবার বের করে সামান্য খেলাম। সত্যদেবকে সেই খাবার সাধতেই সে বলল, "থ্যাংক য়ু, দাস। এখন এসব খাবারে আমাদের রুচি নেই। রোজকার শিকারে যা মেলে তাই আগুনে সেঁকে খাই। আর তা ছাড়া রয়েছে বহু রকম ফলমূল। সবই অভ্যেস হয়ে গেছে।"

একটু থেমে সত্যদেব আবার বলল, "আজ আমাকে দেখে আপনি যেমন আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তেমনই বিক্রম শর্মাকে এখানে প্রথম যখন খুঁজে পাই তখন আমি আর রঘুনাথ মহান্তিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কল্পনাতেও ভাবিনি, একজন আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী এরকম পালটে যেতে পারে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম শর্মা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম পাগল বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক নয়, শর্মা হয়ে গেছে প্রকৃতি পাগল। ও আমাকে বলেছিল, সিং একসঙ্গে এত সুন্দর জিনিস আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এই ঝরনা, পাহাড়, হ্রদ, ফুল, পাখি, এসব দেখে আমিও বুঝেছিলাম, ওর কথা কী মর্মান্তিক সত্যি। শহরের ঘেরাটোপে বসে কম্পিউটারে আঁকা প্রকৃতির ছবি দেখে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় না।"

ফাঁকা জমি পেরিয়ে যখন আমরা এবড়োখেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করছি তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সত্যদেব বলল, "এখনও অনেকটা পথ বাকি। রাতটা এখানেই কোথাও পার করে দিলে ভাল হয়।" সুতরাং তাই করলাম।

একটা বড় মাপের টিলার ওপরে চড়ে বসলাম দু'জনে। একটা ছোট গাছে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আমি আকাশ দেখতে লাগলাম। সত্যদেব বলতে শুরু করল আবার, "বিক্রম শর্মা

আমাদের নিয়ে গেল রণবীর সেনের কাছে। কথা বলে বুঝলাম তারও ওই একই অবস্থা। কৃত্রিম শহরগুলোয় সে আর ফিরে যেতে চায় না। ওখানে নাকি একটাও আসল জিনিস নেই। সবই মানুষের তৈরি, নকল। তারপর…"

সত্যদেব সিং বলে যাচ্ছিল একটানা। আর আমার নেশা ধরে যাচ্ছিল— হারিয়ে যাওয়ার নেশা। আমি রং বদলানো রামধনু ফুলের ঝাঁক দেখতে পাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছি তরুলতার জলতরঙ্গ আর পাখির ডাক, আমার চোখের সামনে হ্রদের নীল জলে বৃষ্টির খই ফুটছে, গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণায় রামধনুর ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের কোলে অস্ত যাওয়া সূর্যের চোখ জুড়নো রং, আর আকাশে মেঘের দলে কোলাকুলি।

আমি ভুলে যাচ্ছিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, টেপ-রেকর্ডার, ব্লাস্টার, জেনারেটর-গান আর কম্পিউটারের কথা। কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোল আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী।

এমন সময় সর্বনাশের মতো মাথার ওপরে কালো আকাশে তারা ফুটতে শুরু করল।

ফুরফুর করে বাতাস বইছিল। ঝরনার জলের রিমঝিম বাজনা এখন আরও মাতাল। তারই মধ্যে সত্যদেব কথা শেষ করে গুনগুন করে একটা গান ধরল। গানের কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হল যেন গানটার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। ঘুমে ঢলে পড়ার আগে শেষবারের মতো দেখলাম, সত্যদেব মাটিতে চিতপাত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনে গান গেয়ে চলেছে।

জঙ্গলের ভেতরে ভোর হয়েছিল একরকম ভাবে। আর এইখানে খোলা আকাশের নীচে সকাল হল একেবারে অন্যরকম।

পিছনে জঙ্গল থাকার জন্য আমরা এখনও ছায়ায় ঢাকা। কিন্তু সকালের রোদ গিয়ে পড়েছে দূরের একটা পাহাড়ে, হ্রদের জলের মাঝামাঝি, আর বহতা স্রোতস্বিনীর ওপরে। নীচের ফাঁকা জমিটাকে এখান থেকে কিছুটা ছোট দেখাচ্ছে। বেশ কিছু নাম-না-জানা বড়সড় পাখি এসে ভিড় করেছে হ্রদের কিনারে। সেখানে কয়েকটা মার্কোনিক্সকেও চোখে পড়ল। পাখির কিচিরমিচির শব্দ হয়তো নেহাতই কোলাহল— কিন্তু আমার বেশ লাগছিল।

সত্যদেব চিতপাত হয়ে ঘুমিয়েছিল। ওকে ঠেলা মেরে ডাকলাম। ও উঠে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, "চলুন, এবারে আমরা এগোব। আট-দশ ঘন্টার পথ।"

হাঁটতে-হাঁটতে দুপুর বেলা নাগাদ আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে হ্রদের ওপারে কিছুটা জায়গা ছেড়ে আবার শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। সত্যদেব বলল, "আপনাকে এতক্ষণ বলিনি। রণবীরের ভীষণ জ্বর হয়েছে। মনে হয় কোনও ইনফেকশন। আপনার সঙ্গে কোনও ওষুধপত্র আছে?"

আমি বললাম, "আছে।"

বাকি পথটুকু ঢালু হওয়ায় আমরা বেশ তাড়াতাড়িই নেমে এলাম। জায়গাটায় গাছগাছালি রয়েছে, কিন্তু ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। তারই মধ্যে দিয়ে বৃষ্টিভেজা মাটিতে পা ফেলে আমরা এগোলাম। একটু পরেই পৌঁছে গেলাম ওদের আস্তানায়। এবং আমার অবাক হওয়ার তখনও বোধহয় কিছুটা বাকি ছিল।

আকাশে ওড়ার কথা □ কুড়ি

১৯১১ : বিশ্বের প্রথম বিমান-ডাক

বিশ্বের প্রথম সরকারি বিমান-ডাক-বহন ঘটেছিল ভারতে। ১৯১১ সালে যুক্তপ্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) এলাহাবাদে এক প্রদর্শনী হয়েছিল। এই উপলক্ষে কিছু ফরাসি ও ইংরেজ বৈমানিক বিমান নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের কসরত দেখাতে। প্রদর্শনীর সংগঠকরা এলাহাবাদের এক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস তৈরির জন্য অর্থসংগ্রহ করতে এক অভিনব ব্যবস্থা নিলেন। তাঁরা ফরাসি বৈমানিক অঁরি পেকের অনুমতিক্রমে এক বিশেষ বিমান-ডাকের ব্যবস্থা করেন। এর জন্য বিশেষ বিমান-ডাক মাসুল নেওয়া হয়েছিল ও ডাকবিভাগ এর জন্য এক বিশেষ ডাকমোহর ব্যবহার করেছিলেন। এটি ঘটে ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলবেলা। অঁরি পেকে তাঁর ছোট্ট হাম্বার-সমের বিমানে এলাহাবাদের প্রদর্শনী ময়দান থেকে প্রায় ৬০০০ চিঠি নিয়ে উড়ে ৫ মাইল দূরে নৈনি জংশনে জেলখানার পাশের মাঠে নামেন। প্রতিটি চিঠিতে ছিল ডাকবিভাগের দেওয়া এক বিশেষ মোহর। এই ধরনের চিঠি ছাড়া কয়েকটি বিশেষ কার্ডও তৈরি হয়েছিল, যাতে পেকে তাঁর বিমানের আসনে বসে আছেন—এই ফোটো ছিল। এগুলিতে পেকে তাঁর নিজের নাম স্বাক্ষর করেন।

পেকের স্বাক্ষরিত একটি কার্ডে বৈমানিককে হাম্বার-সমের বাইপ্লেনে দেখা যাচ্ছে

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকেলের নরম আলোয় আমার চোখে পড়ল লতাপাতায় ছাওয়া এক মনোরম কুটির। তার চালে অসংখ্য রঙিন ফুল ফুটে আছে। আর সামনে জ্বলছে একটা আগুনের কুণ্ড। তার থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট পুকুর— তাতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। সূর্যের ছায়া পড়েছে সেখানে। আর কুটিরের গা ঘেঁষে বিশাল বাগান। তবে মানুষের হাতে তৈরি বাগান নয়, প্রকৃতির খামখেয়ালি বাগান। আশ্চর্য অমিত্রাক্ষর। এত সব রংবাহারি ফুল, তোরা কোথায় লুকিয়ে ছিলি ?

সত্যদেব আমাকে কুটিরের ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরটা আবছা অন্ধকার। মেঝেতে শুকনো পাতার ওপরে রণবীর সেন শুয়ে রয়েছে। দু' চোখ বোজা। গায়ে কয়েকটা পাতার প্রলেপ। আর ওর মাথার পাশে বসে রয়েছে রঘুনাথ মহান্তি। সত্যদেব আমাকে বসতে বলল। পরিচয় করিয়ে দিল মহান্তির সঙ্গে। রণবীর সেন কথাবার্তার শব্দ পেয়ে দুর্বলস্বরে কী যেন বলল, চোখ মেলে তাকাল।

রঘুনাথ বলল, "বিক্রম শর্মা শিকারে গেছে।"

সত্যদেব ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে-গড়া একটা কলসি থেকে জল গড়িয়ে রণবীরকে দু-এক ঢোক খাওয়াল।

লক্ষ করলাম, ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বলে কিছু নেই। শুধু ছোট-বড় কয়েক টুকরো কাঠ আর শুকনো ঘাসপাতা।

রণবীরের কপালে হাত রাখলাম। গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার পোশাকের পকেট হাতড়ে ওষুধের প্যাকেট বের করলাম। একটা ট্যাবলেট বেছে নিয়ে ওর মুখে দিলাম। রণবীর ম্লান হাসল, অস্পষ্টভাবে বলল, "আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন ?"

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। চার-চারজন সেরা বিজ্ঞানীর কী পরিণতি ! ওদের ফেরানো আমার পক্ষে আর কি সম্ভব ?

সত্যদেব বলল, "দাস, আপনি রণবীরকে কোনও রকমে নিয়ে যান। এখানে থাকলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না।"

আমি চুপ করে রইলাম। ব্রিগেডিয়ারের কথা মনে পড়ছিল। উনি বলছিলেন কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা। আমাদের অজানা অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। যে বুলবোয়ার চাইতেও শক্তিশালী, হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর। মোহিনী প্রকৃতি ! এই চারজন বিজ্ঞানীর মধ্যে এই একটা জায়গাতেই দারুণ মিল : প্রকৃতি ওদের টানে।

আমার মনের মধ্যে তোলপাড় চলছিল। এই প্রথম 'যদি, মনে করি, ধরা যাক' এই সব শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া একরাশ কাল্পনিক কথা আমার মাথার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছিল। আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অপারেশন ডিভিশনের কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী, সুশোভন দাস, কল্পনায় বারবার টলে পড়ে যাচ্ছিলাম।

সত্যদেব আমাকে বাইরে নিয়ে এল। বাগানের কাছে গিয়ে আমরা বসলাম।

হঠাৎই সত্যদেব জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, দাস, বলুন তো, ফুল আমাদের কী কাজে লাগে ?"

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখলাম, মরা বিকেলের রোদ ওর মাথায়,দাড়িতে এসে পড়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার যুক্তি কার্যকারণ ইত্যাদি ক্রমশ তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

সত্যদেব বলল, "অনেক প্রশ্ন নিয়ে কখনও আমরা ভাবিনি। অবশ্য ওই কৃত্রিম শহরের ঘেরাটোপে বসে তা ভাবা সম্ভবও নয়। যেমন, প্রজাপতি আমাদের কী কাজে লাগে ? কিংবা চাঁদ-তারা না দেখলে কি কোনও ক্ষতি হয় ?"

আমার চোখের সামনে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আর দূরে গাছের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। আমার মনে হল, অস্ত-যাওয়া সূর্য না দেখতে পেলে কি কোনও ক্ষতি হয় ?

আমি চুপচাপ বসে সত্যদেবকে দেখছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে দেখি কুটির থেকে রঘুনাথ ও রণবীর বেরিয়ে আসছে। রঘুনাথ দু' হাতে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসছে ওকে।

সত্যদেব তাড়াতাড়ি উঠে গেল ওদের কাছে। রঘুনাথ বলল, "কী করব, শুনছে না। বলছে, বাগানে নিয়ে যেতে।"

ওরা দুজনে রণবীরকে এনে বাগানের নরম ঘাস-জমিতে শুইয়ে দিল। রণবীর সেন, সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নামজাদা এনটোমোলজিস্ট—পতঙ্গবিজ্ঞানী, তখন বিহ্বল চোখ মেলে ধূসর আকাশ, রঙিন ফুল, অস্তায়মান সূর্য আর প্রজাপতি দেখছে।

রঘুনাথ একটু উঁচু গলায় বলল, "সেন, তুমি দাসের সঙ্গে শহরে ফিরে যাও। সেখানে তুমি সেরে উঠবে।"

রণবীর সেন প্রকৃতির দিক থেকে চোখ সরাল না। শুধু হাসল, বলল, "মহান্তি, তোমার কি মনে হয় না শহরের একশোটা জীবনের চেয়ে এইখানে এইভাবে মারা যাওয়াটা অনেক বেশি দামি ?"

সত্যদেবের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও আমার হাত চেপে ধরল। এমন সময় দেখা গেল, বিক্রম শর্মা জঙ্গলের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। হাতে ঝুলছে ছোটখাটো কোনও প্রাণীর মৃতদেহ।

কাছাকাছি এসেই মৃতদেহটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল বিক্রম। দৌড়ে এল আমাদের পাশে। একপলক আমাকে দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ল রণবীরের ওপরে। রঘুনাথ রণবীরের কপালে হাত রাখল। সত্যদেব ধরল ওর কব্জি। সূর্য ততক্ষণে ঢলে পড়েছে। সিসের আস্তর দেওয়া অন্ধকার নামছে জঙ্গলে। প্রজাপতিরা বেশির ভাগই চলে গেছে, শুধু কয়েকটা আশ্চর্য নিশাচর প্রজাপতি বাগানে উড়ছে। ওদের ডানার রং আধো-আঁধারিতে প্রতিপ্রভ হয়ে জ্বলছে। ঠিক একইভাবে জ্বল-জ্বল করছে কয়েকটা রঙিন ফুলও।

রণবীর সেদিকে একবার দেখল। তারপর অস্ফুটস্বরে কী একটা বলে চোখ বুজল। আচমকাই ওর ঘাড়টা কাত হয়ে গেল একপাশে।

বাকি তিনজন ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার মনে হল, কান্নার কি কোনও দাম আছে ! কিন্তু টের পেলাম আমার চোখ জ্বালা করছে।

সত্যদেব চোখ ঢেকে বসে ছিল। অন্ধকার থিতিয়ে বসছে। আগুনের কুণ্ডের লালচে আলো আমাদের মুখে-গায়ে। জঙ্গল থেকে পাখি ডাকছিল। আর শোনা যাচ্ছিল হিংস্র গর্জন। ঝরনার জলের কুলুকুলু শব্দ এখন কানে আসছে।

ঠিক সেই সময়ে আকাশের সন্ধ্যাতারা আমার চোখে পড়ল। আকাশের প্রথম চোখ। আমাদের দেখছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সারা গায়ে এক অসহ্য জ্বালাপোড়া। ছটফট করতে করতে সমস্ত পোশাক-আশাক-জুতো সব খুলে ফেললাম। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, ব্লাস্টার, জেনারেটর-গান—সব। ওরা তিনজন এবারে অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল।

আর আমি দেখছিলাম, অন্ধকার বাগানে ফুটে থাকা উজ্জ্বল রঙিন ফুল, নিশাচর রঙিন প্রজাপতি, সন্ধ্যাতারা। শুনছিলাম, ঝরনার শব্দ, রাতপাখির ডাক, পাতার ফিসফিস।

জঙ্গলের দুরন্ত বাতাস আমার বুক-পিঠ, মুখ-চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, প্রতি একশো বছর অন্তর বেশ কিছু মানুষ ফরেস্ট-এক্স-এর আকর্ষণে চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

কোনও বাধাই সেই হারিয়ে যাওয়া রুখতে পারবে না।

ছবি : দেবাশিস দেব

গাবলু
মিঠাই মহল
মিঠাই মহল
মিঠাই মহল
8-6
গাবলু
2-12

অপরূপা মান্ডু

কবিতা রায়

মধ্য প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে বিন্ধ্যাচলের শেষভাগে মান্ডু। মান্ডুকে অনেকে বলত 'শাদিয়াবাদ' বা 'সিটি অব জয়'।

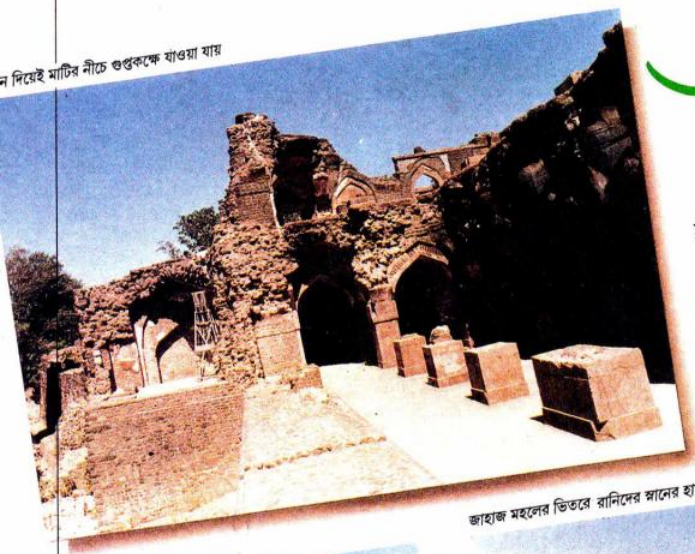

ন দিয়েই মাটির নীচে গুপ্তকক্ষে যাওয়া যায়

জাহাজ মহলের ভিতরে রানিদের স্নানের হামাম

প্রকৃতি

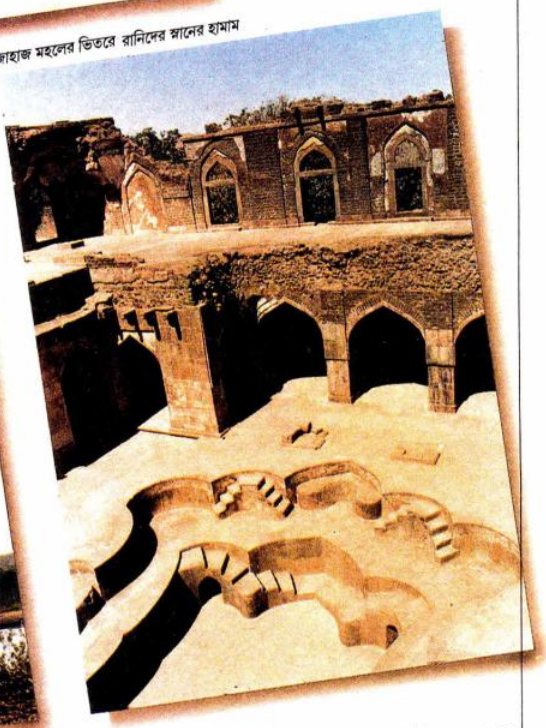

ফোটো : জয়ন্ত চৌধুরী

ডিসেম্বরের এক কুয়াশা-মাখা সকালে সপরিবারে ইন্দোর বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। সকাল আটটায় মাণ্ডুর বাস ছাড়বে বলে অনুসন্ধান অফিস একটু আগেই জানিয়েছে। সেখানেই আজ আমাদের যাবার পালা। অপেক্ষমাণ যাত্রীদের মধ্যে মাণ্ডু কেউ যাচ্ছে কি না তাই খুঁজছি। যদি দু-একজন তেমন সঙ্গী মেলে। বাস ছাড়ার আধ ঘণ্টা আগে টিকিট দেবে। কিন্তু এক ঘণ্টা আগেই দু-তিনজন কাউন্টারে দাঁড়াতে আমরাও এগোলাম। এখানেই আলাপ হল অশোক লাড নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। উনিও মাণ্ডু যাবেন। সঙ্গে স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে। আমরাও মাণ্ডু যাচ্ছি শুনে আমাদের সঙ্গী হলেন। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে ইন্দোর ছেড়ে আমাদের বাস চলতে শুরু করল মাণ্ডুর উদ্দেশে।

মাণ্ডুর অপরূপা প্রকৃতি ও মধ্যযুগীয় স্মৃতিসৌধগুলি দেখার বাসনা ছিল অনেক দিনের। বর্ষাকালে মাণ্ডুর প্রাকৃতিক দৃশ্য দু' চোখ ভরে দেখার মতো। ওই সময় সমস্ত পাহাড় সবুজের চাদর জড়িয়ে নেয়। এ ছাড়া গিরিখাদ থেকে প্রবল উচ্ছ্বাসে ঝরনার মতো জল নেমে আসে। কিন্তু বর্ষার সময় মাণ্ডু যাওয়ার পথে অনেক অসুবিধে।

নীলকান্ত মন্দিরের সিঁড়ি

মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে বিন্ধ্যাচলের শেষভাগে মাণ্ডু। মাণ্ডুকে অনেকে বলত 'শাদিয়াবাদ' বা 'সিটি অব জয়'। একাদশ শতকে মালব রাজ্যে সংস্কৃতির বিপুল বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু চর্তুদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন খিলজি, লোধি ও হোরি সম্প্রদায়ের পাঠান রাজারা। বিশেষ করে মামুদ শা (১৪৩৯-১৪৬৯) এবং গিয়াসুদ্দিনের (১৪৬৯-১৫০০) আমলে মাণ্ডু সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ও প্রকৃতির রূপে নিজেকে কখন যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। সংবিৎ ফিরল অশোকবাবুর কথায়। ইন্দোর থেকে মাণ্ডু যাওয়ার বাস দিনে মাত্র একবার যায়। ঠিকমতন গেলে সময় লাগে সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা। দূরত্ব প্রায় ১০০ কি· মি· । বাসে বসেই ঠিক করে নিলাম অশোকবাবুদের সঙ্গে মাণ্ডুতে একই জায়গায় থাকব। এতক্ষণে আমাদের বাস বিপজ্জনক কাকড়া-খো গিরখাদ পেরিয়ে গিয়েছে। মাণ্ডু-দুর্গের বিশাল বিশাল দরওয়াজা পেরিয়ে মাণ্ডুর জামা মসজিদের প্রায় কোল ঘেঁষে বাসটা দাঁড়িয়ে গেল বিশ্রাম নিতে।

হিন্দোলা মহল

সেদিন ছিল হাটবার। সপ্তাহে একদিন হাট বাস এখানে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের আলোয় জামা মসজিদের কোল-বরাবর গ্রাম্য এই হাটের বিচিত্র পসরা আমাদের মন কেড়ে নিল। মুহূর্তে আমাদের দীর্ঘ বাসভ্রমণের ক্লান্তি মুছে গেল। অশোকবাবুরা জৈন ধর্মশালায় গিয়ে উঠলেন। আমরাও অশোকবাবুর অতিথি হয়ে ধর্মশালায় উঠলাম।

ধর্মশালায় আমাদের জিনিসপত্র রেখে হাট দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সেইসঙ্গে জামা মসজিদ ও আশরফি মহল। দামাস্কাসের বিরাট মসজিদের আদলে তৈরি জামা মসজিদ ভারতে পাঠান স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। জামা মসজিদের বিশালত্বে ও তার নির্জনতায় আমরা বাকহারা হয়ে গেলাম। বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম বিশাল বিশাল খিলানগুলি কীভাবে পাথরের গোলাকৃতি গম্বুজকে ধরে রেখেছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। যাঁরা এই আশ্চর্য সুন্দর সৌধটি তৈরি করেছিলেন তাঁদের শিল্পরুচি অসামান্য। জামা মসজিদের গঠন শুরু করেন সুলতান হোসঙ্গ শাহ এবং শেষ করেন মহম্মদ শাহ খিলজি। ১৪৫০-৫৪ খ্রিস্টাব্দে ৬১টি গম্বুজ-বিশিষ্ট এই মসজিদটি তৈরি হয়েছিল, এর মধ্যে তিনটি গম্বুজ খুবই বড়। মার্বেল পাথরে তৈরি দরজা-জানালার বাজুর আঙ্কিক, সাজসজ্জা ও দেওয়ালে সূক্ষ্ম জালির কাজ বিশেষ সুন্দর। দেওয়ালে এখনও প্রোজ্জ্বল নিলা ও মার্বেল টাইলের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। হিন্দু স্থাপত্যের বহু নিদর্শনও রয়েছে।।

জামা মসজিদ দেখে রাস্তার অন্য দিকে আশরফি মহল দেখতে গেলাম। বেশ কিছু সোপান পেরিয়ে তবে আশরফি মহল বা খাজাঞ্চিখানায় পৌঁছনো গেল। এখানে নাকি শুধু স্বর্ণমুদ্রা রাখা হত। তাই এরকম নামকরণ। মহম্মদ খিলজির রানা কুম্ভজয়ের প্রতীক বিজয়স্তম্ভ এই মহলের কাছেই রয়েছে। প্রায় সাত তলা উঁচু এই স্তম্ভ ধ্বংস হয়ে এখন অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র ৩০ ফুট।

এর পরই জামা মসজিদ ও আশরফি মহলের গা-ঘেঁষে রাস্তায়-বসা হাট দেখার পালা। অনেকটা আমাদের গ্রামের চালা-করা হাটের মতন।

সন্ধের আগেই ধর্মশালায় ফিরে এলাম। কারণ জৈনদের নিয়মানুযায়ী সন্ধের আগেই ভোজনপর্ব চুকিয়ে ফেলতে হবে। সন্ধের পর চাঁদের আলোয় ধর্মশালার উঠোনের বিশাল বটগাছটার দিকে চোখ ফেরাতেই অসংখ্য সাদা বক-জাতীয় পাখি চোখে পড়ল। চাঁদের

রাঙা মাটির পথ

আলোয় সে-এক রহস্যময় মায়াবী অনুভূতি। সন্ধ্যারতি শুরু হতেই আমরা মন্দিরে গেলাম। সাধারণ লোকের থাকবার জায়গা হিসেবে ধর্মশালাটি বেশ ভাল।

পরদিন ভোরেই একটা অটোরিকশ ভাড়া করে আমরা মাণ্ডুর অন্যান্য জায়গা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই গেলাম অনেকটা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে রানি রূপমতীর স্মৃতিসৌধে। ভোরের আলোয় তখন সেখানে এক অনন্ত নীরবতা। স্মৃতিসৌধের উপরে দু'দিকে দুটি হাওয়া-ঘর। রানি রূপমতী

গ্রামের পথে

প্রতিদিন এখান থেকে নর্মদা দর্শন করতেন ও সেইসঙ্গে চলত তাঁর সঙ্গীত সাধনা। হাওয়ামহল থেকে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই পাহাড়-ঘেরা দিগন্তরেখায় অপরূপা প্রকৃতি। বিন্ধ্যাচলের এমন অপরূপ দৃশ্য বোধ হয় এখান থেকেই দু'চোখ ভরে দেখা যায়। হাওয়ামহলে ওঠার সরু সিঁড়ি বোধ হয় নিরাপত্তার জন্যই তৈরি হয়েছিল। নীচের স্নানাগারটিও আধুনিক। সৌধের চূড়া থেকে নীচে দেখা যাচ্ছে বাজবাহাদুরের মহল। শোনা যায়, রাজা বাজবাহাদুর ভালবেসেছিলেন রাজপুতানি রূপমতীকে ও তাঁর সঙ্গীতকে।

রূপমতী মহল থেকে আমরা এসে উপস্থিত হলাম বাজবাহাদুরের প্রাসাদে। আফগান স্থাপত্যের সূক্ষ্ম নমুনা এখানেও রয়েছে। মালবের শেষ রাজা বাজবাহাদুর প্রাসাদটি তৈরি করেছিলেন ষোড়শ শতকে। মাঝে চওড়া উঠোন ঘিরে চারদিকে বড়-বড় হলঘর। মাঝে রয়েছে একটি সুন্দর জলাধার। বাজবাহাদুর প্রাসাদ থেকে নীল আকাশ আর রূপমতী মহলের দৃশ্য সত্যিই অপরূপ। বাজবাহাদুর মহলের কাছেই লাল পাথরে বাঁধানো নিথর কালো জলের এক কুণ্ড রয়েছে। হিন্দুযুগের স্মৃতি বিজড়িত এই কুণ্ডের নাম রেওয়াকুণ্ড। এই কুণ্ড থেকেই বাজবাহাদুর প্রাসাদে জল সরবরাহের এক সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। একটু দূরে জলোওলনের ধ্বংসাবশেষও চোখে পড়বে। পরে রানি রূপমতী এই কুণ্ডের সংস্কার করেন।

অটোরিকশ চালক জানাল এবার আমরা যাব নীলকণ্ঠ বা শিবের মন্দিরে। মন্দিরটি দুই পাহাড়ের খাদে। বিশাল পাথরের মোট ৬১টি

মাণ্ডুর পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে অতীতের স্মৃতি

সিঁড়ি ভেঙে নেমে মন্দির দেখলাম। মন্দিরে শিবের ঠিক মাথায় ঝরনার জল এসে পড়ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা এই জলধারা নাকি কখনও বন্ধ হয় না। কথিত আছে, প্রাচীন হিন্দু রাজারা মাণ্ডুদুর্গের এই নির্জন স্থানে মহাকালের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থা অবশ্য স্থায়ী হয়নি। কালক্রমে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। এই মন্দিরগাত্রে খচিত কারুকার্যে তারই প্রমাণ রয়েছে। তবে মারাঠা রাজারা এই মন্দিরে পুনরায় নীলকণ্ঠের পূজা শুরু করেন। চারদিকে উপত্যকা শ্রেণীর মাঝখানে এই শান্ত জায়গাটি ভীষণ সুন্দর।

নীলকণ্ঠ মন্দির দেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম জাহাজ মহল, হিন্দোলা মহল প্রভৃতির উদ্দেশে। কিছু দূর গিয়ে ড্রাইভার ইকো পয়েন্টে গাড়ি দাঁড় করাল। সামনে একটা পাথর রয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে সামনের প্রাচীন দুর্গের মতো বাড়ির দিকে মুখ করে চিৎকার করলে প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ইকো পয়েন্ট থেকে আমরা গেলাম হিন্দোলা মহলে। হিন্দোলা মহলের সারি সারি ঢালু দেওয়ালে রয়েছে অপরূপ স্থাপত্যরীতির নিদর্শন। মাঝে উঁচু দীর্ঘ অভ্যর্থনাগৃহ, দোতলায় ছোট-ছোট ঘর। উপরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির বদলে নীচ থেকে ঢালু রাস্তা দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। বেগমসাহেবাদের যাতে কোনও কষ্ট না হয় তার জন্যই মনে হয় এই ব্যবস্থা। হিন্দোলা মহলের সারি সারি ঢালু দেওয়ালে লোহার কড়া এখনও রয়েছে। বেগমরা নাকি এখানে বিরাট বিরাট দোলনায় দুলতেন। সে-কারণেই এর নাম হয়তো হয়েছে হিন্দোলা মহল।

হিন্দোলা মহলের পাশেই রয়েছে চম্পা বাড়ড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একটা বড় হলঘর দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বড়-বড় খিলানের উপর ছাদ, তার উপরে মাটি।

বাজবাহাদুর প্রাসাদের অভ্যন্তর

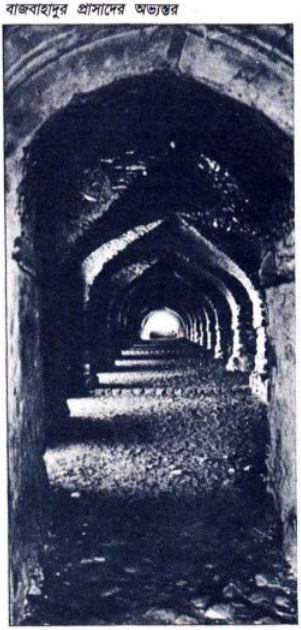

এমনকি, এর নীচেও আর-একটি তলা রয়েছে। আলো ও হাওয়া চলাচলের জন্য রয়েছে অসংখ্য মিনারিকা, হিন্দোলা মহল ও চম্পা বাড়ড়ির পাশে একটি বিশাল দ্বিতল মহল রয়েছে। তার মধ্যে স্নানাগার, ফোয়ারা ও পাথরের পাইপ দিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা আধুনিক কারিগরিবিদ্যাকে হার মানায়। রয়েছে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ারও সুন্দর ব্যবস্থা। স্নানাগারের উপরে গম্বুজে ছিদ্রযুক্ত মিনারিকাগুলো এমনভাবে তৈরি যে, বৃষ্টি হলেও কোনও অসুবিধে হয় না। হিন্দোলা মহলের পশ্চিমে রয়েছে বিরাট সংস্কারহীন এক জলাশয়। নাম মঞ্জুতালাও। এখান থেকেই প্রাসাদে জলসরবরাহ করা হত। চম্পা বাড়ড়ির নীচে যেসব গুপ্তকক্ষ আছে তার সঙ্গে তালাওয়ের যোগাযোগ আছে। গ্রীষ্মকালে এই ঘরগুলিকে ঠাণ্ডা রাখতে এরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল।

হিন্দোলা মহলের প্রায় সামনেই অবস্থিত বিশালাকার জাহাজ মহল। জাহাজের আকারে এই সুন্দর দ্বিতল প্রাসাদটি সুলতান গিয়াসুদ্দিন তৈরি করেছিলেন। জাহাজ মহলের একদিকে মঞ্জুতালাও, চম্পা বাড়ড়ি ও আর-একদিকে কাপুরতালাও (পাথরে বাঁধানো জলাশয়)। সরোবরমুখি বারান্দার জাফরির কাজ খুব সুন্দর। সারা প্রাসাদে যে কত দরজা ও জানালা আছে তার ইয়ত্তা নেই। জাহাজ মহলকে দূর থেকে দেখলেই মনে হবে যেন এক প্রমোদতরী জলে পাড়ি দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। চাঁদনি রাতে সরোবরের স্থির জলে জাহাজ মহলের প্রতিবিম্ব দেখতে অপূর্ব লাগে।

এবার আমাদের মাণ্ডুর শেষ দেখার জিনিস হোসঙ্গ শাহর স্মৃতিসৌধ। ভারতের মধ্যে এটি প্রথম শ্বেতপাথরের তৈরি স্থাপত্য। চমৎকার গঠনরীতি ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য এই সমাধিটি বিখ্যাত। হোসঙ্গ শাহ নিজে এই সমাধিটি তৈরি আরম্ভ করলেও এটি সম্পূর্ণ করেন তাঁর পুত্র। শোনা যায় সম্রাট শাজাহান নাকি তাজমহল তৈরি করার পূর্বে তাঁর কারিগরদের এই অপূর্ব স্থাপত্যশিল্পকে দেখে আসতে বলেছিলেন। উঁচু চাতালের উপর চতুষ্কোণ এই স্মৃতিসৌধ একটি বড় ও চারটি ছোট গম্বুজ নিয়ে গঠিত। সাদা পাথরে জাফরিকাটা নকশা ও মোজাইকের কাজ দেখে বিস্মিত হতে হয়। হোসঙ্গ শাহের স্মৃতিসৌধ দেখে মাণ্ডুকে বিদায় জানালাম। ফেরার বাসে চড়ে বসলাম আমরা। শেষ বিকেলের আলোয় পিছনে পড়ে রইল—মাণ্ডু, তার অপরূপা প্রকৃতি ও ইতিহাস নিয়ে।

ফোটো : জয়ন্ত চৌধুরী

সেন্ট টমাস' গার্লস' স্কুল

১৭২৭ সাল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত ততদিনে বেশ শক্ত হয়ে গেছে। তবে, সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের গুরুত্বটিও ইংরেজরা সম্যক উপলব্ধি করেছিল। নানা জায়গায় সরকারি এবং বেসরকারি প্রচেষ্টায় গড়ে উঠছিল ছোট-বড় সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ১৭২৭ সালে সে উদ্দেশ্যেই কলকাতার ডালহৌসি অঞ্চলে (৮ মিশন রো) সেন্ট অ্যানড্রিউস চার্চের চত্বরে স্থাপিত হল একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়। ১৭৮৯সালের ২১ ডিসেম্বর সেন্ট টমাস দিবসে গঠিত হল 'ফ্রি স্কুল সোসাইটি'। জন্ম নিল আরও একটি বিদ্যালয়। কিছুদিনের মধ্যে এই দুটি বিদ্যালয়ের সম্মিলনে স্থাপিত হল বিখ্যাত'ফ্রি স্কুল', যে স্কুলের নামে কলকাতার একটি রাস্তা ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, অধুনা মির্জা গালিব স্ট্রিট। সেই 'ফ্রি স্কুল' এখনও 'সেন্ট টমাস' ডে স্কুল' নামে একই জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কলকাতার ইউরোপিয়ান ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনের কথা ভেবে বিদ্যালয়ের পত্তন হলেও, সমাজের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের কথাও মনে রাখা হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানিই বহন করত সেইসব দুস্থ ছাত্রদের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার। ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন বিদ্যালয়ের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। রাজা গোপীমোহন দেব, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয়রাও জুগিয়েছেন যথাসাধ্য উৎসাহ।

১৭৯৫ সালে জাস্টিস লা মাস্ত্রির বাড়িটি কিনে নেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ১৮২০ সালের প্রথম দিকে 'বার্ষিক কলিকাতা লটারি'-র মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কিছু আয় হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সৈন্যদের পরিত্যক্ত একটি বাড়ি স্কুল কর্তৃপক্ষ কিনে নেন। ১৮৮২ সালে বিদ্যালয় 'সরকারি পরিদর্শন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৫ সালে নির্মিত হয় খিদিরপুরের বাড়ি। ৪নং ডায়মন্ডহারবার রোডের বিস্তৃত সবুজ প্রাঙ্গণে যে-বাড়ি কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের কলকাকলিতে ২০০ বছরের ইতিহাস গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে নিজস্ব মহিমায়। খিদিরপুর ব্রিজ পেরিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে বাঁ দিকে রেখে ডান হাতে চিড়িয়াখানা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে ট্রাম লাইন ধরে ডান দিকে এগোলেই সেন্ট টমাস' স্কুল। একই

লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধুলো, কুইজ, যোগব্যায়াম, ব্রতচারী, সমাজসেবা, শিল্পসংস্কৃতি সব বিষয়েই মেয়েদের আগ্রহ জাগাবার চেষ্টা করেন সুযোগ্য শিক্ষিকারা। প্রার্থনায় চার্চসঙ্গীত গাইবার সঙ্গে সঙ্গে নানা কথামালার সাহায্যে সমাজ এবং দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রীদের। পঁচিশে বৈশাখ পালিত হয় সাড়ম্বরে।

অধ্যক্ষ

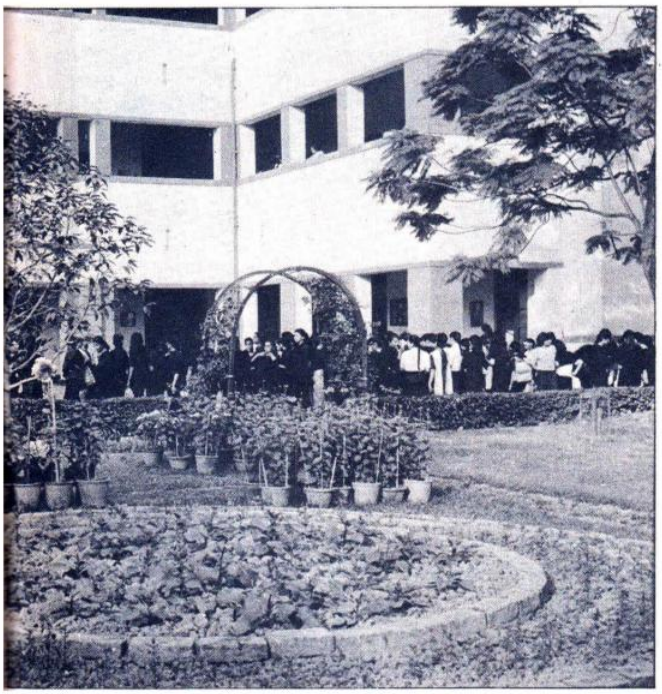

মনোরম পরিবেশে সেন্ট টমাস'গার্লস'স্কুল

ক্যাম্পাসের দু'দিকে ছেলেদের ও মেয়েদের বিভাগ। প্রধান ফটক ধরে বাঁ দিকের রাস্তায় ঘুরে গেলে 'সেন্ট টমাস' গার্লস'স্কুল'। এখানে নার্সারি, কিন্ডার গার্টেন থেকে শুরু করে দশম এবং দ্বাদশ (কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞানসহ) শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। শিক্ষা-মাধ্যম ইংরেজি। দিল্লি শিক্ষা পর্ষদের অধীন এই বিদ্যালয় যুগপৎ ঐতিহ্য এবং গুণগত উৎকর্ষের সম্মিলনে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী।

বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্বকে দিল্লি শিক্ষা পর্ষদ যথাক্রমে ইন্ডিয়ান সারটিফিকেট অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (ICSE) এবং ইন্ডিয়ান সেকেন্ডারি সারটিফিকেট (ISC) নামে অভিহিত করে থাকে। ইংরেজ আমলের সিনিয়ার ক্রেম্বিজ পরীক্ষাই ICSE-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। বিশেষত, এখানে শিক্ষা এবং পরীক্ষা-মাধ্যম ইংরেজি। ইংরেজির পাঠক্রমও তুলনায় কিছুটা ব্যাপক। বস্তুত, এই শিক্ষাক্রমে ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। ত্রি-স্তর ভাষা শিক্ষার ফলে এখানকার ছাত্রীরা হয়ে ওঠে অনেক বেশি সপ্রতিভ, সাবলীল। তিনটি ভাষা-শিক্ষা এই পাঠক্রমে বাধ্যতামূলক। ইংরেজি প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা রূপে রয়েছে মাতৃভাষা (বা অন্য বিকল্প ভাষা), এবং তৃতীয় ভাষা হিন্দি। অবশ্য তৃতীয় ভাষা সবক্ষেত্রে হিন্দি নাও হতে পারে। একটি বাঙালি ছাত্রীর কথা যদি ধরা যায়, তা হলে তার প্রথম ভাষা ইংরেজি, দ্বিতীয় ভাষা বাংলা (হিন্দিও সে পছন্দ করতে পারে), তৃতীয় ভাষা হিন্দি (দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি হলে তৃতীয় ভাষা বাংলা পড়তে হবে তাকে)। আবার, একজন অবাঙালি ছাত্রীর দ্বিতীয় ভাষা যদি হয় হিন্দি, তৃতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা হবে তার আবশ্যিক। এই স্কুলের চৈনিক ছাত্রী অ্যাঞ্জেলা হুয়াং-এর দ্বিতীয় ভাষা বাংলা। সে এ-বছর ISC পরীক্ষা দেবে। সিলেকশন (টেস্ট) পরীক্ষায় বাংলায় তার প্রাপ্ত নম্বর ৬০%। তামিল মেয়ে মেরি মার্থা পল-এরও দ্বিতীয় ভাষা বাংলা। কেবল তাই নয়, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কেউ যদি বাংলা বা হিন্দির পরিবর্তে অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা শিখতে চায়, তা হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সে-সুযোগও করে দেন। এই বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্রী মণিপুরি, নেপালি, নাগা বা মিজো ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নিয়েছে। তবে, সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় তাকে অনুমতি দেওয়া এবং লক্ষ রাখার বেশি কিছু করতে পারে না। যেহেতু সমস্ত ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের সুযোগ একটি বিদ্যালয়ে থাকা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ভাষা শেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণতই ছাত্রীর নিজস্ব ব্যাপার।

> কলকাতার ইউরোপিয়ান ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনের কথা ভেবে বিদ্যালয়ের পত্তন হলেও, সমাজের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের কথাও মনে রাখা হয়েছিল।

সেন্ট টমাস'গার্লস'স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক বা ISC-তে বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য তিনটি বিভাগই রয়েছে। ICSE-তে ষষ্ঠ বা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রান্নাবান্না, সূচিশিল্প, অঙ্কনবিদ্যার সঙ্গে গত বছর থেকে কমপিউটার বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ছাত্রীরা নিজস্ব পছন্দ এবং প্রবণতা-অনুযায়ী সুযোগ্য শিক্ষিকার কাছে এইসব বিষয়ে পাঠ নেয়। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদে মাধ্যমিক স্তরে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখার ব্যবস্থা না থাকলেও, দিল্লি বোর্ডে তা রয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০০ ছাত্রীকে ৭৫ জন শিক্ষিকা সযত্ন শ্রমে, মেধায়, অনুপ্রেরণায় স্বয়ংভর করে তুলছেন। গত ১৫ বছরের বোর্ড-পরীক্ষায় কেউ অকৃতকার্য হয়নি। 'চার্চ অব নর্থ ইন্ডিয়া' থেকে বিদ্যালয়-পরিচালনার মূল খরচ অনুদান হিসেবে পাওয়া যায়। সরকার কেবলমাত্র শিক্ষিকাদের মহার্ঘ ভাতার টাকা দেন। কলকাতার বিশপ স্কুল

অপালা বরাট

সুনেত্রা গুপ্ত

চান্দ্রেয়ী পুরকায়স্থ

শাঁওন সাহা

পারমিতা দে

প্রথম ছাত্রীরা

দ্বাদশ (কলা বিভাগ) শ্রেণীর ছাত্রী অপালা বরাট একাদশ শ্রেণীতে ৭২% নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, দিল্লি পর্ষদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হারে 'পয়েন্ট' দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।) কেবল লেখাপড়াই নয়, বইপড়া, বিতর্ক, শব্দসন্ধান এবং কুইজের প্রতিও তার অসীম আগ্রহ। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালবাসে সে। দেবব্রত বিশ্বাস, সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র তার প্রিয় গায়ক-গায়িকা। ভবিষ্যতে আই.এ.এস. বা ব্যারিস্টার হওয়ার স্বপ্ন আছে তার।

একাদশ শ্রেণীর বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সুনেত্রা গুপ্ত। তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৭৩%। পড়াশোনার সঙ্গে ধ্রুপদ সঙ্গীতেও তালিম নিচ্ছে সে। ভীমসেন যোশী তার প্রিয় গায়ক। গল্পের বই পড়তেও ভালবাসে সে। চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট হওয়াই তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য।

চান্দ্রেয়ী পুরকায়স্থ একাদশ শ্রেণী থেকে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম হয়ে দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠেছে ৭১৯ নম্বর পেয়ে। ওর প্রিয় বিষয় রসায়ন। পদার্থবিজ্ঞান এবং অঙ্কও ভাল লাগে। বড় হয়ে বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করতে চায়। চান্দ্রেয়ী মণিপুরী নাচ শেখে। ছবি আঁকতে এবং গল্পের বই পড়তে ভীষণ ভাল লাগে ওর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ওর প্রিয় লেখক।

খুব সপ্রতিভ মেয়ে শাঁওন সাহা। দশম শ্রেণী থেকে ৮৯.৫% নম্বর পেয়ে একাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে সে। শাঁওন যে কেবল লেখাপড়াতেই সেরা, তা নয়। বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ তার। লেখালিখি, ছবি আঁকা, বিতর্ক, কুইজ, নৃত্য নানা বিষয়ে তার সমান আগ্রহ। ইংরেজি সাহিত্য বেশি পড়লেও সমরেশ বসু বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তার প্রিয় লেখক। আই.এ.এস. হওয়াই তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য।

দশম শ্রেণীর ছাত্রী পারমিতা দে নবম শ্রেণীর একটি বিভাগে ৭২% নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। সারাদিনে স্কুল বাদে আট ঘণ্টা পড়াশোনায় অতিবাহিত করে সে। তার প্রিয় শখ গান-শোনা আর বই-পড়া।

উত্তরপ্রদেশের মেয়ে জয়া শ্রীবাস্তব কেবল নবম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়েই দশম শ্রেণীতে ওঠেনি, গত সিলেকশন (টেস্ট) পরীক্ষায়ও তার স্থান প্রথম। প্রাপ্ত নম্বর ৭৭%।

পরিচালন-সমিতির চেয়ারম্যান, তা ছাড়া অধ্যক্ষ, শিক্ষিকা-প্রতিনিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনজন প্রতিনিধিও আছেন সমিতিতে।

অধ্যক্ষ ছায়া বিশ্বাসের সমস্ত জীবনই শিক্ষাক্ষেত্রে নিবেদিত। ১৯৮৩ সালে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-ভার গ্রহণ করার আগে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের 'সেন্ট টমাস' ডে স্কুল'-এ ছিলেন দশ বছর। তার আগে প্রাট মেমোরিয়াল-এ সহ-শিক্ষিকা এবং সহ-অধ্যক্ষ হিসেবে ষোলো বছর কাজ করেছেন। তাঁর শিক্ষকতা-জীবন শুরু লরেটো স্কুলের (বউবাজার) বাংলার শিক্ষিকা হিসেবে।

অধ্যক্ষ হয়েও তিনি আগে নিয়মিত ক্লাস নিতেন, কিন্তু এখন বিদ্যালয়ের পরিচালন-কর্মের ব্যস্ততায় তা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, "আমি আমার মেয়েদের বলি, তোমরা শিক্ষার যে সুযোগ পেয়েছ, তার ভাগ অন্তত একজনকে দাও। অন্তত একজন নিরক্ষরকে অক্ষর চেনাও। ইংরেজিতে লেখাপড়া শেখা মানে কিন্তু সাহেব হয়ে যাওয়া নয়। আমি ওদের ভারতীয়বোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। আপাতভাবে মনে হতে পারে আমাদের স্কুল কেবল ধনীদের জন্য। কিন্তু অনেকেই জানেন না, অনেক দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ছাত্রীকেও এখানে অবৈতনিক পাঠ দেওয়া হয়।" ছাত্রীদের উদ্দেশে তাঁর উপদেশ, "তোমাদের শিক্ষা যেন দেশের কাজে লাগে।"

বাংলার শিক্ষিকা দীপা মুখোপাধ্যায় জানালেন, প্রার্থনায় চার্চসঙ্গীত গাইবার সঙ্গে-সঙ্গে নানা কথামালার সাহায্যে সমাজ এবং দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রীদের। পঁচিশে বৈশাখ পালিত হয় সাড়ম্বরে। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নানা ভাষার নাটক, আবৃত্তি এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধুলো, কুইজ, যোগব্যায়াম, ব্রতচারী, সমাজসেবা, শিল্পসংস্কৃতি সব বিষয়েই মেয়েদের আগ্রহ জাগাবার চেষ্টা করেন সুযোগ্য শিক্ষিকারা। সহ-অধ্যক্ষ শ্রীমতী মাসকুরিন, দীপা মুখোপাধ্যায়, শর্বরী দাশগুপ্ত, ইরা বর্মন, শুচিস্মিতা রাহা, শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জনা রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বললেই তা বোঝা যায়। শাঁওন সাহা, জয়া শ্রীবাস্তব, নন্দিনী ভট্টাচার্য কুইজে, খেলাধুলোয় সেনেলা মার্টিন, যোগ-ব্যায়ামে অন্তরা চৌধুরীর বিবিধ কৃতিত্বও এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

বিশাল স্কুলবাড়ির পেছন দিকে রয়েছে হস্টেল। বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক মেয়ে চারজন অভিজ্ঞ মেট্রনের অভিভাবকত্বে এখানে থাকে। স্কুলের গ্রন্থাগার, পরীক্ষণাগার এবং রান্নাঘরটি (রন্ধনবিদ্যার ছাত্রীদের জন্য) সত্যিই দেখবার মতো।

বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজি শেখা বিষয়ে নিবেদিত-প্রাণ শ্রীমতী বিশ্বাসের পরামর্শ, "ভুল বলো, কিন্তু বলো। ভুল বলতে-বলতেই ঠিক বলা শিখবে। টিভি-রেডিওতে বেশি করে ইংরেজি অনুষ্ঠান দ্যাখো, শোনো। ইংরেজি বই, খবরের কাগজ পড়ো। ইংরেজি আসলে খুব সহজ ভাষা। অভ্যাস এবং ভয় তাড়ানোটাই বড় কথা।"

গৌতম ঘোষদস্তিদার

ফোটো : দিলীপ ব্যানার্জি

হালুম হলেই বাঘ হয় না

আবুল বাশার

বিনুমাসির বাড়িতে ঢোকামাত্রই মাসি চোখ বড়-বড় করে বললেন, "সেদিন রাত্রে দরজা না খুলে খুব জোর বাঁচা বেঁচে গেছি শ্রীদীপ। প্রথমত, বাঘটা সিধু নয়। দ্বিতীয়ত, গতকাল সার্কাসের লোকেরা দুধুলির জঙ্গলে বাঘটাকে ছাঁদা জাল দিয়ে ধরেছে। উফ্! কী ভয়ঙ্কর! ভোরবেলা টংকা বলে গেল বাঘটা ওরা পেয়েছে।"

মেজদা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "চল্ শ্রীদীপ, নস্করপুর গিয়ে একবার বাঘটাকে দেখে আসি।"

মাসি ত্বরিত জবাব করলেন, "কোথা পাবি! সে কি আর আছে! গতকালই বিকেলে দল উঠে বিহার চলে গেল। আমারও তো শখ হয়েছিল একবার বাঘটাকে দেখে আসি। ন'বউ এসে বললে, বাঘ হারিয়ে দলের মন সাঙ্ঘাতিক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খেলাও আর জমছিল না। দর্শক হচ্ছিল না। সাইত খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে ওরা তাঁবু গুটিয়ে উঠে গেল।"

মেজদা প্রথমে মুখে আফসোসের শব্দ করল, "ইস্!"

"কী হল?" মাসি আর আমি সমস্বরে বলে উঠি।

মেজদা গম্ভীর হয়ে বলল, "বুঝতে পারছি না, সিধুকাকা খাঁচায় করে বিহার চলে গেল কি না!"

"তা হলে! হায় হায়! এখন কী হবে রে মেজো? আমি যে পুষতে চেয়েছিলাম সিধুকে! একেই বলে কপাল! আমার প্রেসটিজ চলে গেল বিহার। বাংলার রয়েল বেঙ্গল কোথায় চলে গেল রে! আমি যে সিধুর সম্মানে দামি পাথরের প্লেট করতে দিয়েছি 'বাঘ হইতে সাবধান'! তার কী হবে? ন'বউয়ের কাছে আমার আর মুখ থাকল না রে! আমি যে গলা বড় করে বললাম, দেখে নিও বউ, সার্কাসের বাঘ দেখা হল না বটে, তবে আমার ঘরেই বাঘ আসছে!"

বিনুমাসি কপাল চাপড়ে উঠলেন। এই ধরনের হাহাকার শুনে মেজদা বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও মাসি, আগে চিন্তা করতে দাও। কাকা বাঘ হয়েছে এ-কথা ঠিক। তবে সে এই জঙ্গলে থাকতে গেল কেন? টংকা লোকটা ভাল নয়, ও মানুষ চালান দেয়। কাকাকে চালান করতেই পারে।"

মেজদার কথায় আরও ঘাবড়ে গেল বিনুমাসি। আরও কপাল চাপড়ে হায়-হায় করতে লাগলেন। মেজদা আরও চিন্তা করে বলল, "মুড়কি আমাদের মায়াপুরী সার্কাস দেখতে বলেছে বারবার করে। বলেছে, হালুম হলেই বাঘ হয় না। তা হলে সার্কাসের বাঘটা কি বাঘ নয়? অনেক কিছুই রটনা হয়। রিং-মাস্টারকে খুবলেছে, এসব কথা মিথ্যাও হতে পারে। আবার এমন হতে পারে, ওটা হয়তো আসল

বাঘই ছিল। জঙ্গলে এসে ধরতে না পেরে সিধু গুনকেই ধরে নিয়ে গেছে টংকা। আসল বাঘটা জঙ্গলেই থেকে গিয়েছে।"

চিন্তার আর অন্ত থাকল না। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। রাত হল। রাত ন'টার সময় ছেলে কোলে করে ন'বউ বেড়াতে এল। সিঁড়ি দিয়ে ভয়ে-ভয়ে উঠছিল। পাছে বাঘে হালুম করে! কাঁপা-কাঁপা গলায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়াল, "কই গো বিনু, তোমার বোনপো-রা তো এসেছে দেখছি। বাঘ কোথায়? আয় চিতলি, ভয় করিসনে।"

চিতলি ওর বারো বছরের মেয়ে। আঁচল ধরে সঙ্গে এসেছে। মেয়েকে ফের সাহস দিয়ে ন'বউ বলল, "তুই তো মায়াপুরী সার্কাসের ডাঁশা বাঘ দেখেছিস! বিনুর বাঘ তেমন হবে না। পোষামানা জিনিস, প্যাঁচার দলের জিনিস না। খাসা বাঘ। আয়।"

প্যাঁচার দল শুনে মেজদা বলল, "মায়াপুরী সার্কাসের ছাপ কি প্যাঁচার ছাপ চিতলি?"

"হ্যাঁ গো!" নাকের নোলক নেড়ে জবাব করল চিতলি।

"বাঘটা!"

"আসল রয়েল বেঙ্গল।"

"খোঁচা মেরে দেখেছ?"

"তাই কি পারি! তবে হাঁ করেছিল একবার খেলোয়াড় যখন মাথা গলাবে মুখের ভিতর, সেই হাঁ মাকালফলের মতো টকটকে লাল। বোঝা যাচ্ছিল, এ জিনিস মানুষ পেলে ছাড়বে না। তবে যখন দুধুলি থেকে ধরে নিয়ে গেল তখনও দেখেছি, একেবারে রোগা হয়ে গিয়েছে। খেতে না পেলে যা হয়। সেই সময় কেউ-কেউ কাঠি দিয়ে খোঁচা মেরেছে, কোমর বেঁকে যায়। ঠাণ্ডা একেবারে!"

মাসি সঙ্গে-সঙ্গে স্থানকাল পাত্র ভুলে গিয়ে বলে ফেললেন, "ও নির্ঘাত সিধু! অমন রোগা কে হবে!"

ন'বউ শুধোল, "সিধু কে?"

সামাল দেবার জন্য মাসি বললেন, "ও ন'বউ, তোমায় বলা হয়নি, আমি যে বাঘটা বোনপোদের দিয়ে আনাচ্ছি, তার নাম সিধু। সিদ্ধ বাঘ কিনা!"

ন'বউ মাসির কথা ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, "কই দেখাও সেই বাঘ, দেখি একবার!"

চিতলি বলল, "প্যাঁচার দলটা আরও ছোট ছিল। তখন একটা বাচ্চা বাঘ খেলা দেখাত। বাবা সেই গল্প করছিল। একেবারে মানুষের মতো স্বভাব। পরদা ঠেলে একটুখানি ঢুকে তিন-চার বার ছোট-ছোট লাফ মেরে পালিয়ে যেত। এক পলকের খেলা। জোকার টংকা তখন পরদা ঠেলে ঢুকে এসে বলত, লজ্জা পেয়েছে, বাচ্চা কি না! তাইতে বাবারা হেসে মরে যেত!"

ন'বউ বলল, "তোমার বাঘও কি লজ্জায় সামনে আসছে না? কই ডাকো!"

আমি বললাম, "এই বাঘ কিন্তু রোদ সয় না। খুব আয়েসি।"

ঠিক তখনই বাইরে দারুণ গর্জন, "হালুম!"

মাসি বাঘ আসছে এই আশায় বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ নিয়েছেন। নতুন পোল বসেছে বাড়ির সামনে। মাথার উপর বাল্ব জ্বলছিল। হালুম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে লোডশেডিং হয়ে গেল। ভয়ে ন'বউ আর চিতলি চিৎকার জুড়ে দিয়ে অন্ধকারেই বাড়ি ছেড়ে পালাল। সিঁড়ির কাছে একটা কম পাওয়ারের বাল্ব একটু বাদেই জ্বলে উঠতেই দেখলাম, আমাদের দিকে পিঠ রেখে বাঘটা বসে রয়েছে।

মাসি ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মেজদা মাসিকে নিষেধ করতে পারল না। সারারাত বাইরে শিশিরে ভিজল বাঘটা। এ সিধুই কি না কে বলবে!

সিধু তখন দুধুলির জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। কী করবে বেচারি। মেজদা অনেক ভেবেচিন্তে দরজা খুলে দিতে চেয়েছিল রাত বাড়লে।

মাসি সাহস করেননি। আমরা মায়াপুরী সার্কাসের খোঁজে বার হলাম তারপর।

দলটা বেশি দূর যায়নি। বিহারের দিকে অগ্রসর হয়েছিল বটে, কিন্তু হঠাৎ কী মনে করে পায়রাতলিতে তাঁবু ফেলেছে। আমরা দলটাকে ধরতে পারলাম। বাঘের খেলাও দেখলাম। সত্যিই বাঘ। আমরা গ্যালারির একেবারে নীচের থাকে মাটির কাছে বসে ছিলাম। বাঘের লেজটা মেজদার মুখে চাঁটি মেরে চলে গেল। একটু বাদে শুরু হল এক-চাকার সাইকেল চড়ে মেয়েদের রাউন্ড রেস। রানির মতো সুন্দরী দেখতে বড় মেয়েটার মাথায় সেই সোনামুখী ময়ূর-রঙা টায়রা ঝিকমিক করছে।

মেজদা বলল, "এ নিশ্চয় মানুষখেকো বাঘ।

বললাম, "তা হলে মাসির বাড়ির ওটা কে? সিওর সিধুকাকা। টায়রাউলির টায়রাই বা কেন?"

মেজদা বলল, "চল, ফেরা যাক। সব বোঝা গেছে।"

আমাদের খোঁজখবর করে ফিরতে দু'দিন দেরি হয়েছিল। মাসির বাড়িতে এসে দেখি মাসি খুব গম্ভীর। বাড়িতে ঢুকতেই লেখা চোখে পড়ল—'বাঘ আছে'। দেওয়ালে সাঁটা। বুঝলাম সিধুকাকা এসে গিয়েছে।

আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে মাসি বললেন, "তোরা কোনও কাজের না। অযথা বেচারি বাইরে হিম পোয়াল। বাঘের গলায় সর্দি বসে গিয়েছে। ও যে সিধুই জোর করে বলার মতো সাহস মেজোটার নেই। চটবাবা আমাদের ঠকায়নি। আসল জিনিসই দিয়েছে। সিধু সেই কবে থেকে দুয়ার আঁচড়াচ্ছে। সার্কাসের বাঘটাই যত গণ্ডগোল করল।"

"গণ্ডগোল বাঘ করেনি। করেছে টংকা। টংকাই হল চটবাবা। সারা তল্লাট ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করতে সময় লাগবে। আমি যা বললাম মাথায় রেখো।" বলল মেজদা।

মাসি বললেন, "তোর কথার ঠিক নেই। চটবাবা যেই হোক, ওর মন্ত্রের জোর আছে। আমি বাঘ পুষছি, সেটাই বড় কথা। আয়, সিধুকে একবার দেখে যা। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।"

মেজদার মধ্যে কোনও তাগিদ দেখা গেল না।

বলল, "দেখার কী আছে! ও তোমরাই বসে-বসে দ্যাখো। মা এসে একবার বাঘের মুখ দেখে যাক। ন'বউকে দেখাও। এর মধ্যে আমি টংকার ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি। চটবাবা সিধে লোক না।"

মেজদা একটা সাদা কাগজে পাশাপাশি দুটি ছবি এঁকে দেখাল টংকাই চটবাবা। একটা তো জোকার টংকার ছবি। ঢলঢলে পাজামা, পাট্টা রং। গায়ে ঢিলে ট্রাউজার শস্তা কাপড়ের। পায়ে গুঁফো চটি। এই হল টংকা। পাশেও সেই টংকা। চটপরা। হাতে ঝুলছে দুটি জলপড়া ঘটি। এবার দ্যাখো, গোঁফদাড়ি এঁকে দিলেই চটবাবা হয় কি না। বয়সও বেড়ে যায়। লোকটা জোকার নয়, ঠগ।"

বললাম, "ছবিতে প্রমাণিত হলেও, বাস্তবে প্রমাণ করবে কীভাবে?"

মেজদা বলল, "আর-একবার কুমড়োজোল যাওয়া দরকার। আমার ধারণা হয়, এই ছোট সার্কাস দলটা কিছু নয়। চটবাবা আরও অনেক বড় কারবারি। মাসি বুঝবেন না। তোকে কিছুকাল মাসির কাছেই মাঝে-মাঝে এসে থাকতে হবে। বাঘটার গতিবিধি লক্ষ রাখতে হবে।"

মনে-মনে ভাবলাম, একথা বিনুমাসিকে বলাই যাবে না। মাসি তা

হলে আঘাত পাবেন। আমরা সিধুকে পাহারা দিচ্ছি, একথা মাসি কল্পনাও করতে পারেন না। এমন করে সিধুকে নিয়ে পড়েছেন যে, মনে হচ্ছে, সিধু যেন মাসির ছোট্ট শিশুটি। ওকে তিনি ঘর থেকে বার করতেও চান না, পাছে রোদ লেগে সিধুর কোনও কষ্ট হয়। কাঁচা দেহে তাপ লেগে কোনও ক্ষতি হয়।

মেজদা বিনুমাসির বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় আমাকেই কেবল বলে গেল, "ঘাট করেছি শ্রীদীপ। আমার কারণেই সিধুকাকা বাঘ হয়েছে। আমাদের বাড়ি-ছাড়া হয়েছে। এখন যদি মাসি শোনেন আমি তোকে পাহারা রেখে যাচ্ছি, তা হলে বলবেন, বাঘ হয়েও সিধু শান্তি পেল না।"

"তা তো বলবেনই। কান্নাকাটিও করবেন।"

"স্বপ্নটা যখন সত্যি হয়, মানুষ তখন ব্যাপারটা সত্যিই হয়েছে কি 'না যাচাই করে না। হয়েছে মনে হওয়াটাই সব। মাসি শুধু সিধুর হালুম শুনেই সব সাব্যস্ত করেছেন। আকাঙ্ক্ষা বলো, আর শখই বলো, মানুষকে একবার পেয়ে বসলে হয়, সেই বশে মানুষ মন্ত্রপড়া-জীবের মতো এমন এক দশায় পড়ে যে, চোখ খুলে রেখেও দেখতে পায় না। দেখছ না, সিধুকে ঘরের বাইরে অবধি আনতে চাইছেন না মাসি। অথচ বাঘের একটু রোদ পোয়াতেও তো ইচ্ছে করে। যাকগে। আমি চললাম।" বলে মেজদা চলে গেল।

মা-বাবা সিধুকাকাকে দেখতে এলেন। বাবা প্রায় চুপচাপ থাকলেন। আবছা অন্ধকারে উঁকি মেরে খানিকটা দেখে বললেন, "মেজোকে অ্যাটাক করেনি সেই রক্ষে! এখনও বোধবুদ্ধি যায়নি। বাঘ হলে কারই-বা মাথার ঠিক থাকে! ভাল। খুব ভাল। অ্যাদ্দিনে বিনুর সত্যিকার স্ট্যাটাস এল। এত্ত টুকুনই কুকুরে ওর লজ্জা করত। তবে একটা কথা বলে যাই, বুড়ো বাঘ কবে আছে কবে নেই। মরে-টরে গেলে খবর দিও। আর যাই হোক, মানুষ কখনওই বাঘ হয়ে মরতে চায় না। মানুষ হয়েই মরতে চায়।"

বাবার কথায় মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সেই কান্না যে এত ছোঁয়াচে তা কে জানত। মায়ের কান্নার ধাক্কা গিয়ে লাগল ঘরের ভিতরের বাঘটার বুকে। নইলে বাঘটা অমন গরগর করে উঠবে কেন? গরগর তো নয়, বাঘের গলায় যেন কান্না গুঁড়ো হয়ে ঝরতে লাগল। বাঘটা কিছুটা দরজার মুখের কাছে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চকিতে সরে চলে গেল।

মা বললেন, "বাঘ হলে কী হবে, মানুষ ছিল তো! ভগবানের জীব সবই বুঝতে পারছে।"

মাসি বললেন, "তা কেন পারবে না! আমি ওকে রাজার সুখে রেখেছি। মশারি দিয়েছি। খাট দিয়েছি। বড় থালায় করে খেতে দিই। রান্না খাবারই দিই। কাঁচা মাংস দিয়েছিলাম, ছুঁয়েও দ্যাখেনি। বুঝলাম, ওসব খাবে না। ব্রাশে করে দাঁত পর্যন্ত মাজে, জানো! বাথরুম করে, ঘনঘন টয়লেটে ঢুকছে, বার হচ্ছে। আয়নায় মুখ পর্যন্ত দ্যাখে। ও যখন মানুষ ছিল মাথাটা অবধি আঁচড়াত না, আয়না দেখত না। এখন কত শখ! মাঝে-মাঝে হাসে। বাঘের হাসি তো দ্যাখোনি। দেখলে মনে হবে, পশুরও মন আছে। তা ছাড়া অনেক রাতে ও যেন 'বিনু-বিনু' বলে ডাকছে মনে হয়। আসলে মনেরই ভুল। বাঘ কি ডাকতে পারে!"

মা বললেন, "যাক, এসব কথা আর কারও সামনে বলিসনে। যদি জেনে ফ্যালে বাঘটা মানুষ ছিল তা হলেই গেছে।"

"ও মা! তাই কি বলা যায়! বলি কি তোমরাও চেপে রেখো। নইলে আমার সব যাবে।"

বাবা বললেন, "কিছুই যাবে না। সিধু যখন হালুম করতে পারে, তাই যথেষ্ট।"

মা বাবাকে সঙ্গে করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় নিলেন সেদিন। আমি মাসির কাছেই থেকে গেলাম। মাসি তাতে খুশিই হলেন। ন'বউ এবেলা-ওবেলা বাঘটাকে দেখে যাচ্ছে। বাঘের প্রশংসা আর মাসির সুনাম করার ব্যাপারে ওর মুখের কামাই নেই।

এইভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন ন্যাড়া রেলিংহীন ছাদের উপর থেকে নীচে চোখ গেল আমার। নীচে বাবুদের বালাখানার কাছে গলির ভিতর দিয়ে বাবুদেরই প্রকাণ্ড ষাঁড়টা যাচ্ছিল। গলির দু' পাশে পুরনো দেশলাই সাইজের ইটের দেওয়াল তোলা পথ। দেওয়াল-ঘেরা একদিকে বিরাট পুকুর, অন্যদিকে ক্লাব। দেওয়ালের গা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সারিবদ্ধ নারকেল, দেবদারু আর ইউক্যালিপটাস গাছের সারি চলে গেছে অনেক দূর সুরকিতলার হাট পর্যন্ত। গলি-পথের উপর এই সব গাছপালার ছায়া ঘন হয়ে পড়েছে। দু'-চারটি রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া এবং অন্যান্য গাছও রয়েছে। ফুল ফুটলে যেন আকাশে আগুন ধরে যায়। অশোকগাছের চিরল ছায়াও পড়ে পথের উপর। ছায়ার এমন নকশা, নকশার মৃদু হাওয়া লাগা নড়াচড়া দেখলে মনটা কেমন এলোমেলো লাগে। মনটা কোথায় হারিয়েও যায়। সঙ্কীর্ণ গলিতে বাবুদের জিপগাড়ি কোনওমতে ঢুকতে পারে। দু'খানি গাড়ি পাশাপাশি চলা অসম্ভব।

এ-পথ প্রায় নির্জনই থাকে। শরতের সাদা মেঘের মতোই এর পথিকও মন্থর আর হালকা চালে হেঁটে যায়। এই গলির ভিতর কখনও ঝগড়া বাধে না। হঠাৎ এমন একজনকে ওই পথের উপর দেখতে পাই যে, খুবই অবাক লাগে। ও কেন এই পথে ঢুকেছে? এলই বা কেন? ও যে মুড়কি!

ও যদি চোখ তোলে আমাদের এই ছাদে আমার উপর চোখ পড়তে পারে। যদি নাম ধরে গলা তুলে ডাকি মুড়কি শুনতে পাবে। হাত নেড়ে ওকে ডেকে উঠতে যাব এমন সময় মনে কেমন খটকা লাগল। মনে পড়ে গেল :

চট চটিতন খিড়কি
বাবার ছেলে মুড়কি

হাত তুলে নেড়ে ওকে ডাকতে গিয়ে মুখের শব্দ আর মৃদু নেড়ে ওঠা হাত একসঙ্গে থেমে গেল। ভাবলাম এই ছাদের উপর থেকে সরে যাব কি না। মুড়কি যদি আমায় দেখে ফ্যালে সেটা কি ভাল হবে! ইতস্তত করছি, এমন সময় কী দুর্ভাগ্য, মুড়কি আমায় দেখে ফেলল। চোখে-চোখ পড়ামাত্র পথের উপর ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে। মনে হল তার পা দু' খানি মাটিতে গেঁথে গেছে, সে আর নড়তে পারছে না।

মুড়কি বাবুদের বালাখানার দিকে আসছিল, পথটা বটতলা ঘুরে আমাদের পথে এসে পড়েছে। কোথায় এসেছে ছেলেটা? দেখি কি, মুড়কি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই ফিরে যাচ্ছে। আমার ওকে ঘোর সন্দেহ হল। মনে হল, আমাকেই সে ভয় পেয়েছে। দ্রুত ছাদ থেকে সিঁড়ির কাছে এলাম। সিঁড়ি ভেঙে নেমে পথে পড়লাম। খুব তাড়াতাড়ি বটতলা ঘুরে বাবুদের পথে এসে উঠলাম। পথের এ-প্রান্তে আমি। দেখতে পেলাম দীর্ঘপথের ও-প্রান্তে ততক্ষণে চলে গেছে মুড়কি। দ্রুত পা চালাচ্ছে। হঠাৎ পিছন ফিরে আমাকে দেখতে পেয়েই দৌড়তে শুরু করল সেই কুমড়োজোলের বাবার ছেলে।

তবে বেচারির কাছে আমার একটা কথাই জানার আছে, সার্কাসের সার্ভিস একজন সামান্য কিশোরের চলে যায় কী করে? কী তার অপরাধ ছিল? তার সব কথা যে বোঝাও যায় না।

তোমাদের জন্য সাম্প্রতিক আনন্দ-সম্ভার

ষষ্ঠীপদ
চট্টোপাধ্যায়ের

দুরন্ত কৌতূহলকর কাহিনী

পাণ্ডবগোয়েন্দা

দাম ১৫·০০

তিন বন্ধু—বাবলু, বিলু, ভোম্বল। দুই বোন—বাচ্চু ও বিচ্ছু। আরও একজন রয়েছে এই দলে। এই পাঁচজনের নিত্যসঙ্গী এক কালো কুকুর, পঞ্চু। এদের সবাইকে নিয়েই ছোটদের দারুণ রকমের প্রিয় রহস্যভেদী দল—পাণ্ডবগোয়েন্দা। ক্ষুদে এই গোয়েন্দাগোষ্ঠীর বুকে দুর্জয় সাহস, বাহুতে দুর্দম শক্তি। দু-ঘা খেলে চার ঘা ফিরিয়ে দিতে জানে এরা। এদের অভিযান মানেই তাই ঘটনার ঘনঘটা। এহেন পাণ্ডবগোয়েন্দার দল সেবার ঠিক করল, প্রিয় কুকুর পঞ্চুর জন্মদিন পালন করবে। বিশাল পরিকল্পনা, বিরাট আয়োজন। কী হবে না হবে এ-নিয়ে আলোচনা জমতে না জমতেই আচমকা বদলে গেল কর্মসূচী। অদ্ভুতভাবে এদের হাতে এসে পড়ল এক থলি দুর্মূল্য হিরে—বোম্বাইয়ের এক কুখ্যাত চোরাচালানকারীর মুখের গ্রাস। এই হিরের থলিকে কেন্দ্র করেই শুরু হল পাণ্ডবগোয়েন্দাদের নতুন তথা অষ্টাদশ অভিযান। সুদূর বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত সেই অভিযানেরই এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী এই গ্রন্থে। প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

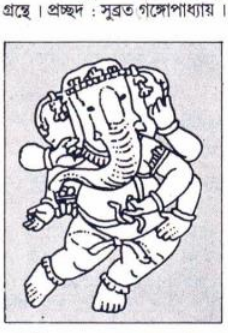

চিত্রা দেব-এর

দুর্দান্ত কিশোরকাহিনী

সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান

দাম ১২·০০

দুশো বছর ধরে সিদ্ধিদাতা গণেশের একটা ছোট্ট মূর্তি ছিল মল্লিক পরিবারে।

সযত্নে-সঙ্গোপনে বড়রা লুকিয়ে রাখতেন সে-মূর্তির রহস্য। এভাবেই চলছিল কয়েক পুরুষ।

একদিন সবার চোখের সামনে থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে গেল সেই মূর্তি। মল্লিকবাড়ির ছেলে রূপেন ছুটে এল তার বন্ধু সঞ্জয়ের কাছে। দারুণ তুখোড় ছেলে এই সঞ্জয়। সব শুনে সে নিজেই ভার নিল সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান-রহস্যের জট-খোলার।

মূর্তির সঙ্গে কিংবদন্তীর মতো জড়িয়ে রয়েছে একটি নাম—সে-নামের অর্থও গণেশ—গণপতি মল্লিক। এই গণপতি মল্লিকই দুশো বছর আগে নিয়ে এসেছিলেন রহস্যজড়ানো গণেশমূর্তিটি, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহারাষ্ট্রের কিছু মানুষ, আছে লোভ-প্রতিহিংসা-ঘৃণা আর পেশোয়া বাজীরাওয়ের হিরে। সঞ্জয় কি পারবে এই রহস্যের সমাধান করতে ? দুশো বছরের পুরনো ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে-থাকা তথ্যকে উদ্ধার করতে ?

শেষ পর্যন্ত কীভাবে রহস্যের সমাধান হল, তাই নিয়েই এই তীব্র কৌতূহলকর ও চমকপ্রদ কাহিনী। প্রচ্ছদ : বিমল দাস।

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

ডজন ডজন গল্প

সত্যজিৎ রায়ের

এক ডজন গপ্‌পো ১৫·০০
আরো এক ডজন ১২·০০
আরো বারো ১২·০০

এবারো বারো ১২·০০
একের পিঠে দুই ২০·০০

সত্যজিৎ রায়ের আরও বই

ফটিকচাঁদ (উপন্যাস) ১২·০০
যখন ছোট ছিলাম (স্মৃতিকথা) ১৫·০০
মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প ১০·০০

সুজন হরবোলা ২০·০০
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম ১৬·০০
তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ ১০·০০
ব্রেজিলের কালো বাঘ ১৫·০০

সত্যজিৎ রায়-সম্পাদিত

সেরা সন্দেশ ৬০·০০

কর্নেল সরকারের রহস্যভেদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

বলে গেছেন রাম শর্মা ১৬·০০
সবুজ সঙ্কেত ১২·০০

মুড়কি পালাচ্ছে দেখে আমিও ওকে তেড়ে গিয়ে ধরে ফেলব ভেবে ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু মুড়কি বোধ হয় প্রাণপণে ছুটছিল। সুরকিতলার হাটের কাছে এসে ভিড়ের মধ্যে ছেলেটি হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভিড় ঠেলে ঠেলে ওকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা যে না করলাম তা নয়, কিন্তু ওকে আর কোথাও দেখা গেল না।

বাড়ি ফিরে আসতেই মাসি বললেন, "কদিন ধরে আমার খুচরো পয়সা তাকের উপরের প্লেট থেকে চুরি যাচ্ছে। তুই নিয়েছিস ?"

বললাম, "তা কেন নেব ? নিলে তোমায় বলে নেব।"

"চিতলিরা যখন-তখন ঢোকে, তারাই কি নিয়ে পালাচ্ছে ?" মাসি সন্দেহ প্রকাশ করে কপাল কুঁচকোন।

খুচরো পয়সার কথা আমার মাথায় তেমন ঢুকছিলই না। আমার তখন অন্য চিন্তা। দু' দিন পরে আবার সেই দুপুরবেলা একইভাবে মুড়কিকে ছায়া-ছড়ানো পথের উপর দেখলাম। আমায় দেখতে পেয়ে মুড়কি আবার পালাল। একথা মাসিকে বলে লাভ নেই। মাসি অনর্গল পয়সা হারানোর কথা গাওনা করে চলেছেন।

বললাম, "দ্যাখো মাসি ! পয়সা হারানো নতুন নয়। তোমার হিসেব কে রাখে। যখন মোটা টাকা খোয়া যাবে, তখন বলবে। তোমারও গেরো কম না। বাঘের ডাক যত, নাম ফেটেছে সাতগুণ। তাইতেই হাঙ্গামা হয়। লোক আসা-যাওয়ার কামাই নেই। বাচ্চারা ঢুকছে হামেশা। আর পয়সা রাখো হেথা-হোথা। সামলে রাখলেই পারো !"

মাসি বললেন, "আমি বাবা অত মনে রাখতে পারিনে। বাঘ সামলাব না পয়সা গুনব !"

"তা হলে দুঃখ করছ কেন ?"

"ওরে দুঃখ নয়। চোর-টোর ঢুকছে কি না দেখব না ? এই হতে-হতে যদি বড় কোনও চুরি হয়ে যায় !"

"একটা অত বড় বাঘ রয়েছে তোমার সংসারে। চুরি বললেই চুরি ! তা হলে আর 'বাঘ আছে' লিখে রাখার মানে কী ? চিকিই তো যথেষ্ট ছিল !"

এইভাবে চলছিল। সন্ধেয় সেদিন চাঁদ উঠেছিল হ্যাজাক জ্বেলে দিয়ে। জ্যোৎস্না টইটই করছে। মাসি ধূপচি করে এঘর-ওঘর ধূপ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। জ্যোৎস্নার ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা ধোঁয়া। একটা কুণ্ডলী ভেসে গিয়েছে ছাদের এক কোণে। কুণ্ডলীর তলায় বসে আছে বাঘটা। মনে হচ্ছে ওর মাথার উপর চিতামুণ্ডীর সাদা মেঘ লেগেছে। আমি বাঘটাকে অনুসরণ করছি। মেজদা বলেছে, গতিবিধি লক্ষ রাখতে।

বাঘটা চাঁদের দিকে চেয়েছিল। মনে হল, বসে-বসে কাঁদছে সিধু। চোখ মুছে নিচ্ছে আপন মনে। বাঘের এমন কান্না কি বুড়ো হলে হয় ?

ডাকলাম, "সিধুকাকা ! তুমি মাসির রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তুমি অমন করে চাঁদ দেখলে মন খারাপ করে।"

বাঘটা কি আমার কথা শুনে একটুখানি নড়েচড়ে বসল ? একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলও আমাকে। আমি বাঘটার পিছনে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে-সঙ্গে সে টের পেয়ে গেল। দু'হাতে মুখ ঢাকল লজ্জায়। তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে ব্যাঘ্রসুলভ গ্রীবাতাড়না করল দু'পাশে। একটা খুদে লাফ মারল ছাদের উপর। সঙ্গে-সঙ্গে ঝনাৎ করে শব্দ হল।

যত সে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে ঝনঝন ঝুনুকঝুন ঝনাৎ, খুচরো পয়সার শব্দ ক্রমাগত বেজে চলেছে। সে লজ্জা পেয়ে থেমে পড়ছে। দু' হাতে মুখ ঢাকছে। আবার লাফ দিচ্ছে ছোট করে। এইভাবে সে সিঁড়ির মুখে এল। তারপর চুপ করে বসে থাকল।

আমি ওকে অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চোখে লক্ষ করলাম। তারপর মাসিকে বলব বলে ঘরে ঢুকে ভাবলাম, মাসিকে বলা এখনই ঠিক হবে না। মাসি হইচই বাধিয়ে তুলবেন। একথা ভেবে আবার বাইরে এসে দেখি সিঁড়ির মুখে বাঘটা বসে নেই।

কোথায় গেল ভেবে ছাদে এসে দেখলাম, সে নেই। ঘরেও ঢোকেনি। তবে গেল কোথায় ? বাঘের ঘরটায় এই প্রথম আমি ঢুকে পড়লাম। ঘরের কোণের জানলাটা দেখি খোলা। এখানে দাঁড়ালে কী আশ্চর্য, বালাখানার পথটা দিব্যি হাতের তালুর মতো স্পষ্ট চোখে পড়ে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। পথে নেমে দেখি নির্জন রাস্তায় জ্যোৎস্না মেখে-মেখে বাঘ লাফ মেরে-মেরে বটতলা ঘুরে বালাখানার পথে গিয়ে পড়ল। আমি ছুটলাম। মানুষ যখন বাঘ হয়, তখন কী চমৎকার ঘটনাই না হতে পারে ! বাঘের গা থেকে ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে। মনে হল গ্রামগঞ্জের মানুষ খুচরো পয়সা বাজাতে বাজাতে হাটে বিকিকিনির সওদাগিরি করতে চলেছে।

আমি দেখলাম বাঘের গায়ে গাছপালার পাতা চুঁইয়ে আসা নকশার বাহার। আর দেখলাম, মুড়কি এসেছে। দূর থেকে হলেও ও যে মুড়কি ছাড়া অন্য কেউ তা মনে হল না।

বাঘটা মুড়কিকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে যেন মুড়কির বুকের শব্দ শুনছে। গাছের আড়াল থেকে দেখলাম, মুড়কি কথা বলছে না। একটু বাদেই মুড়কি চলে গেল। বাঘটা দ্রুত ফিরে আসতে লাগল। এবার ওর গা থেকে ঝুনঝুন ঝনাৎ শব্দের কোনও সাড়া নেই দেখলাম। কোনওই শব্দ নেই তার। মুড়কি তা হলে এ পথে এই বাঘের কাছেই আসে !

মেজদাকে এই ঘটনার কথা বলার জন্য নিজেদের বাড়ি এসে শুনলাম দাদা কুমড়োজোল থেকে ফেরেনি। মাকে এইসব কথা বলব কি না ভাবছি, এমন সময় মেজদা ফিরে এল চারদিন পর।

বলল, "আমি যখন ফিরছি ছইতোলা গাড়ি করে ঝুঝকিঝোরা থেকে একদল বাচ্চা মেয়েকে টংকা চালান নিয়ে গেল। এর কোনও প্রতিকার নেই। কারণ কুমড়োজোলের মেয়েদের তাদের বাপ-মা টাকার বিনিময়ে টংকার হাতে তুলে দিচ্ছে। এত অভাব যে এমন করে বিক্রি করাটা যে অন্যায়, তা ওদের বোঝানোও মুশকিল। পুলিশকে যদি বলি পুলিশ কিছুই করবে না। এজন্য করবে না যে, কুমড়োজোলের অধিবাসীদের তরফ থেকে কোনও প্রতিবাদ নেই। ভেবেছিলাম টংকাকে পুলিশে দেব।"

আমি বললাম, "পুলিশে দেবে যদি তবে তৈরি হও।"

"কী করে ?" মেজদা অবাক হয়ে জানতে চাইলে।

"সিধুকাকা বিনুমাসির খুচরো টাকা চুরি করেছে। তারপর সেই টাকা মুড়কির হাত দিয়ে কোথায় পাঠাল বুঝতে পারছি না। তবে মুড়কি তো চটবাবার ছেলে। মনে হচ্ছে টংকার হাত আছে এই চুরির পেছনে।"

মেজদা কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "এ তো ভারী ভাবনার কথা হল ! এই রকম সন্দেহই আমি করেছিলাম। বাঘটাকে খুব কড়া করে পাহারা দেওয়া দরকার। সুযোগ পেলেই টাকা-পয়সা হটিয়ে দেবে। কুমড়োজোলে দু' দিন ছিলাম, এই দু'দিনে মুড়কিকে দেখতে পেলাম না। আমার খারণা হয়, মুড়কি টংকার সঙ্গে রয়েছে। এখনও সন্ধে হয়নি, সাকার্সের ওখানে গেলে আমরা দু'জনকেই পেয়ে যাব। একটা কথা যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে, মুড়কির চাকরি চলে গেল কেন ?"

বললাম, "সেই কথাই তো আমিও চিন্তা করে চলেছি।"

এই সময় মা ঘরে ঢুকে আমাদের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বললেন,

"দ্যাখো বাপু ! সন্দেহ করছ কাকে ? বাঘকে না মানুষকে ? যদি বাঘটাকে করো, আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি মানুষকে সন্দেহ করো আমার বলার আছে।"

মেজদা স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, "আমরা বাঘটাকেই সন্দেহ করি। দ্যাখো মা, তোমার আগেকার সেই সরল সিদে বোকা সিধু আর নেই। এখন সে বাঘ হয়ে অনেক চালাক হয়েছে। যার মন্ত্রে ওর বাঘ হওয়া, সে হল সার্কাস ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর ব্যবসায়ী। লোকটা সাঙ্ঘাতিক !"

মা বললেন, "টংকা যাই হোক, আমার দেখার কথা নয়। সিধু চালাক হয়েছে বলছ, কিন্তু তোমরা দু'জন তো আরও চালাক নিশ্চয়ই। টংকা যদি সিধুকে দিয়ে চুরি করায় তবে খুচরো পয়সা নেবে না। সিন্দুক লুট করবে। তোমাদের গোয়েন্দাগিরির বুদ্ধি দেখে হাসি পাচ্ছে।"

বললাম, "কিন্তু মা ! আমি নিজে খুব ভাল করে দেখেছি, বাঘটা খুচরো পয়সা বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, মাসি কতটা সচেতন সেটা পরীক্ষা করছে।"

মা বললেন, "তা হলে মাসিকে পাঁচশো টাকা প্লেটের উপর ফেলে রাখতে বলো, দ্যাখো সিধু ছুঁয়ে দেখছে কি না ! এসব হল ফালতু সন্দেহ ! কুমড়োজোল গিয়েছিলে, কই মুড়কি ছেলেটার আসল পরিচয় তো জেনে আসতে পারোনি !"

মেজদা বলল, "জেনেছি বইকী ! ওর এক মা আছে। বিধবা। এক বছর হল বাপ মরেছে। ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। সবাই ওখানকার চটবাবার ভয়ে তটস্থ। ভাল করে কথা বলতেই চাইছে না। ভাবছে, আমি ওদের ক্ষতি করতে গিয়েছি। তো ওর মা বললে, 'টংকা আগে মুড়কিকে সঙ্গে করে হাটে-হাটে লাল কাপড়ের চৌকা করে, মাটিতে চারখানা কাঠি পুঁতে লাল কাপড় দিয়ে চৌকোনো করে ঘিরে ভানুমতীর খেলা দেখাত। মুড়কির জিভ কেটে লোককে তাক লাগাত। আসলে মুড়কি জিভের তলে রাখত আলতা ভেজানো সাইকেলের সিটের ভিতরের স্পঞ্জ। টংকা যখন ছুরি বাগিয়ে ধরত, তখন সে স্পঞ্জটা জিভ দিয়ে ঠোঁটের উপর ঠেলে ধরত। তখন টংকা কচাং করে কেটে লোককে দেখাত সে মুড়কির জিভ কেটে ফেলেছে। ধোঁকার জিনিস। টংকা একটা ধোঁকাবাজ তোমাকে বলছি। টংকাই মুড়কিকে সার্কাসে নিয়ে গেল। সেটা আর এক ধোঁকাবাজি। যাও, অনেক বলেছি। আর নয়। তুমি সরকার থেকে খবর করতে এসেছ তাই না ?' বললাম, 'না গো মাসি, তা নয়। তুমি আর-একটু বলো।' মুড়কির মা বললে, 'আর নয় বাছা। তবে তোমায় বলি।' বলে মুড়কির মা বললে :

চট চটিতন ফক্কা
সিধুই করে রক্ষা।"

মেজদা বলল, "আমি শুনে তো থ। মুড়কির মাকে কতবার জানতে চাইলাম সিধু কে ? কিছুতেই বললে না। ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে।"

মা অবাক হয়ে মেজদার দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, "তা হলে দু'ভাই মিলে সার্কাসেই যাও এখন।"

সার্কাসে এলাম সাইকেল চড়ে। তখন সন্ধের শো অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবু আমরা টিকিট কেটে ঢুকলাম। তারপর বাজনা-চৌকির পাশ দিয়ে সোজা পরদা ঠেলে সার্কাসের বাইরে যেখানে ছোট-ছোট তাঁবু ফেলা হয়েছে সেখানেও মুড়কিকে খুঁজছিলাম। হঠাৎ জোকার টংকা এগিয়ে এসে বলল, "কী চাও এখানে ?"

মেজদা বলল, "আমরা মুড়কিকে খুঁজছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে একজন তাঁবুর ভিতর থেকে জবাব দিল, "মুড়কি এখানে কাজ করে না।"

টংকা ছোট তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আমাকে দেখে বলল, "দাদা তো বাঘ হয়ে গিয়েছে শুনছি।"

মেজদা আমার বলার আগেই বলে উঠল, "মুড়কি কাজ করে না জানি। কিন্তু এসেছিল কি না জানতে চাইছি।"

টংকা বলল, "দ্যাখো ভাই ! ওকে তো আমরা দু'বছর আগে ছাড়িয়ে দিয়েছি। এখন যদি ও এসে থাকে, তা হলে দ্যাখো কোথাও দর্শকদের মধ্যে হয়তো টিকিট কেটে সার্কাস দেখছে।"

"টিকিট কাটবে কেন ? ও তোমাদের দলে ছিল, খাতির নেই ?"

"বা রে ! এখন তো আর নেই। টিকিট কাটতে হবে ওকে। আমরা চল্লিশ হাজার খরচ করে সুন্দরবনের বাঘ এনেছি সার্কাসে। বাব্বা, কম কথা নয়।"

আর একজন ফস করে বলে উঠল টংকার পাশে থেকে। এবং আরও একটু যোগ করল, "আরে মুড়কির দাম আর কত ছিল ! ধরো চার পয়সা। ও এখন নাচাগানা করে। ভানুমতীর খেলায় ওই নাচ শিখেছিল এই আমাদের টংকাবাবার কাছে। তাই দেখিয়ে বেড়ায়। বেধবা মা কী করবে আর !"

এমন সময় সার্কাসের প্রকাণ্ড তাঁবুর তলে দারুণ হইচই বেধে গেল। সবাই ছুটল সেদিকে। এদের কথা শুনে মনে হচ্ছে মুড়কি এখানে আসেনি।

সার্কাসে এখন আগুনের খেলা চলছে। আগুন লাগার ভয়ে দর্শক-আসনে ত্রস্ত চিৎকার হওয়ায় এই হইচই। হইচই থামলে টংকা ফিরে এল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আর কেনও কথা বলল না। কেউই আর কথা বলতে চাইছে না দেখে আমরা চলে আসছিলাম, এমন সময় সহসা দেখি মুড়কি বাইরের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

যারা এতক্ষণ ওর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করছিল, তারাও ওকে দেখে আশ্চর্য হয়েছে। কে একজন সার্কাসের ভিতর থেকে টংকাকে ডেকে নিয়ে এল। আমরা দু'ভাই বাজনা-চৌকির কাছে পরদা ঠেলেই পরদারই আড়াল হয়ে ঘটনা দেখতে থাকলাম।

এখন সার্কাসে আর কোনও চিৎকার নেই। বর্শা খেলা শুরু হবে। ভয়ানক শান্ত স্তব্ধতা। এখন ফিসফাস করলেও শোনা যাবে। মুড়কি চাদরের তলা থেকে একটা মুখ-আঁটা থলে বার করে টংকার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, "সব এনেছি। আর কিচ্ছু নেই। যা ছিল সব দিয়েছে।"

বলে মাথা নিচু করে মুড়কি চলে গেল। টংকা হাতের তালুতে থলেটা উপর থেকে নীচে ফেলে যেন ঝনাৎ শব্দের ওজন পরীক্ষা করল দু'-তিনবার।

আমরাও আর দাঁড়াইনি। বেরিয়ে আসার সময় গায়ে ধাক্কা লেগে গেল টায়রাউলির সঙ্গে। দেখলাম এ টায়রা সিধুর বউয়ের।

সাইকেল মেরে বিনুমাসির বাড়ি এসে হাঁফ ছাড়লাম। মনে হল চটবাবা খুব শৌখিন লোক। সার্কাসের মেয়েটির গলায় বিছেহারও দিয়েছে।

মাসির সোফায় বসে পড়লধপাস করে মেজদা। আমি বসলাম আরও একটু উঁচু সোফায়। মেজদা বলল, "আমার কাছে এখন সবকিছুই জলের মতো পরিষ্কার। মুড়কির চাকরি চলে গেল কেন যখন বুঝতে পারলাম তখনই চটবাবার মন্ত্রের ফাঁকিও ধরা পড়ে গেল। তোর মাথায় ঢুকেছে ব্যাপারটা শ্রীদীপ ? শুধু তাই না, আমি অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলাম।"

আমি কথা বলে ওঠার আগেই মাসি এসে সামনে দাঁড়ালেন। চোখ বড়-বড় করে বললেন, "খুচরো পয়সাই নয়, আমার পাঁচশো

টাকা চুরি গেছে। লখনউয়ের বড়পিসি নববর্ষের গ্রিটিং পাঠিয়েছিল একখানা সুন্দর ফুল-আঁকা খামে করে, আমি তারই ভেতর পাঁচখানা একশো টাকার নোট রেখেছিলাম। প্লেটের উপরই ছিল। পাশে পড়েছিল খুচরোগুলো। সেই খামখানাও গেছে।"

মেজদা বলল, "রহস্যের আর কিছুই রইল না। আমাদের চোখের সামনে সেই উপহার, মাসি তোমার সেই উপহার মুড়কি যত্ন করে টংকার হাতে তুলে দিল।"

"মুড়কি?" বিনুমাসি অসম্ভব অবাক হলেন।

"হ্যাঁ, একটা ছেলে। মাসি, তোমার সব টাকাপয়সা ওই বাঘটা চুরি করেছে।"

মাসি একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "অসম্ভব।"

"হ্যাঁ মাসি, সম্ভব।"

"হতেই পারে না। তাই যদি হয়, তা হলে বলব আমার কোনও টাকাপয়সাই চুরি হয়নি। এমনকী বলব, বড়পিসি আমায় কোনও গ্রিটিং পাঠায়নি। ব্যস!"

মাসি রাগ করে অন্যদিকে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ আর সামনেই এলেন না।

মেজদা ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে চিন্তিত স্বরে বলল, "মুড়কি আবার আসবে। ওকে হাতেনাতে ধরতে হবে। তবেই মাসির বিশ্বাস হবে।"

এদিকে মাসি সারারাত আমাদের সঙ্গে আর কথাই বললেন না।

মাসি কথা বলছেন না দেখে দাদার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। রেগেমেগে সে ওই রাতেই সাইকেল হাঁকিয়ে বাড়ি চলে গেল। সকালবেলা মাসি আমায় ব্রেকফাস্ট খেতে দিয়ে একখানা শক্ত আর মোটা সুতোর কোমর-জালি সামনে ঝুলিয়ে দেখালেন। বললেন, "এটা মেঝেয় পড়েছিল। দিদিকে গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আয়। আমার মনে হচ্ছে এটা সিধুর জালি। ও নিশ্চয়ই কোমরে বাঁধত। তা ছাড়া এ জিনিস আসবে কোথা থেকে!"

বললাম, "এতে নিশ্চয়ই কাঁচা টাকা ছিল। মাকে কী দেখাব মাসি! আমি জানি, সিধুকাকা এতে করে টাকা-পয়সা জমাত। আমি ওর কোমরে জড়ানোর এই জালিতে পুরনো রুপোর পঞ্চম জর্জের ছাপ মারা টাকা দেখেছি।"

"এই টাকা নিশ্চয়ই সিধু চুরি করেনি।"

"না। তা করবে কেন? ও তো ওর নিজের টাকা।"

"তা হলে এই জালি খালি হল কী করে? তোরা রহস্যের সন্ধানে কুমড়োজোল পর্যন্ত গিয়েছিলি। এবার বলে দে, এই জালি খালি হল কী করে আর আমার মেঝেয় পড়েই বা থাকল কী করে?"

বললাম, "আমার মাথায় কিছুই আর ঢুকছে না মাসি। বেশ কড়া করে দুপুরে একটা ঘুম দিতে হবে। এই রহস্যের কিনারা হয়ে গেলে পড়াশোনায় মন দিতে হবে।"

"বেশ, তাই করিস।"

বলেই মাসি বাঘের ঘরে ব্রেকফাস্টের একটা ভর্তি প্লেট চৌকাঠের কাছে রেখে দিলেন। একটু বাদে বাঘটা এসে চট করে সেই প্লেটটা সড়াত করে টেনে নিয়ে ঘরের অন্ধকারে চলে গেল।

মাসি বললেন, "দেখেছিস! একেবারে মানুষের মতো।"

ফুলের মতো করে আহ্লাদে হেসে উঠলেন মাসি। মাসি যে খুবই ছেলেমানুষ তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না।

দুপুরে আমি বেঘোরে ঘুমোলাম। ঠিক তখন ঘটনাটা ঘটল।

বাঘটা আবছা আঁধার-লেপা ঘর থেকে ধীরে নিঃশব্দে পা ফেলে-ফেলে বার হয়ে এল। আমার খাটের কাছে মাথার দিকে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে তার হাত বাড়াল শব্দহীন। কপালে এসে

আলতো স্পর্শ দিতে লাগল সিধুকাকার হাত। চুলের ভিতর বাঘের আঙুল মোলায়েম ছন্দে বিলি কেটে চলল। আমার খুব আরাম বোধ হচ্ছিল। ঘুম আরও গাঢ় হচ্ছিল।

বাঘ আমার বুকে-গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমন করে চিরকালই কাকা আমায় সোহাগ দিয়েছে। মাঠের মধ্যে বটতলায় শুয়ে থেকেছি এই মানুষটির পাশে। মৃদু হাঁফ-টানা ভাঙাচোরা বুকের ভিতর শিস্ বাজত, কান পেতে শুনেছি। কাকা বলত, "আমার বুকটাতেও হাত বুলিয়ে দে শ্রীদীপ।"

সিধু গুনের হাতের ছোঁয়ায় ঘুমের ভিতর সেই সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ চটকা লেগে আমার ঘুম যখন চটে গেল, দেখলাম বাঘটা তখনও আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

আমি কিছুটা ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাব, এমন সময় বাঘটা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে দু' চোখে কেমন এক আকুতি ফুটিয়ে তুলল। তারপরই ঝট করে হাত তুলে নিয়ে চার হাত-পা মেঝেয় ফেলে লাফ মেরে ওর ঘরে ঢুকে গেল বাঘটা।

আমি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকলাম ভয় মেশানো কেমন এক আচ্ছন্নতার ভিতর। মা বলেন, ঠাকুন্দা এই মানুষটিকে ওর ছেলেবেলায় উঠোনে উপুড় করে ফেলে পিঠের উপর কাপড়কাচা লম্বা পিঁড়ি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই ছিল কাজে ভুল করার শাস্তি। কাকার জিভ ঝুলে পড়ত মাটিতে, চোখ উলটে যেত। তবু

মানুষটা কিসের মায়ায় সেই সংসারে পড়ে থাকল কে জানে ! অবশ্য আমার বাবা কখনও ওকে কোনও কঠোর শাস্তি দিয়েছেন এমন কথা শুনিনি, দেখিওনি কখনও । বরং বাবাকে মাঝে-মাঝে ধমক দিত সিধুকাকা । সেই মানুষটা না শেষে কেমনধারা হয়ে গেল ।

বোধ হয় আমাদের সে কখনওই বিশ্বাস করেনি । ভাবত, আমরা মনিব আর সিধু কাজের লোক মাত্র ।

যাই হোক । সন্ধে হয়েছিল । বাঘ ফের চাঁদ দেখতে ছাদে এল । এই সময় ন'বউ বিনুমাসির কাছে কী যেন বলতে এসে বলতে পারছিল না । কাপড়ের তলায় ন'বউ ওর একখানা হাত লুকিয়ে রাখছিল সর্বক্ষণ ।

মাসি প্রশ্ন করলেন, "ওভাবে হাত লুকোচ্ছ কেন, কী আছে তোমার মুঠোয় ?"

ন'বউ বলল, "লজ্জা করছে ভারী । অভয় দাও তো একটা নজ্জার কতা নিবেদন করি ।"

লজ্জার তরাসে ন'বউ লজ্জাকে 'নজ্জা' আর কথাকে 'কতা' উচ্চারণ করছিল লাজুক জড়তায় ।

মাসি বললেন, "বলোই না । লজ্জা কিসের !"

"নজ্জা বললে নজ্জা ! এই মাথা যে কেটে পড়ে যায়নি সেই খুব !"

"আহা ! তাই বলে আমার সামনে লজ্জা করছ কেন ?"

"তুমি বলেই বলা যাচ্ছে !"

"বেশ তো, বলো !"

কাপড়ের তলা থেকে ন'বউ লুকনো হাতখানা বার করব-করব করছে, এমন সময় বাইরে বাঘটা হালুম করতেই ভয়ে ন'বউ হাত গুটিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল নিমেষে । একদিন কবে নাকি লোডশেডিং-এর সময় বাঘটা ঘর থেকে বার হয়ে ওর কোলের বাচ্চার মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে বলেছে, "সুখী হও ।"

অন্ধকারের ঘটনা, সেই থেকে বাচ্চা তিনদিন টানা একজ্বরি ছিল, ধুকধুকির কাছে সুতোয় করে তাবিজ ঝোলাতে হয়েছে । ফলে হালুম শুনলেই বেচারি আর দাঁড়ায় না । এত জোরে হুড়মুড়িয়ে ছোটে যে পায়ে কাপড়ের ছাঁদা লেগে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হয় ।

হালুম শুনে বাইরে আসি । ছাদ থেকে নয়, রাস্তায় হালুম হয়েছে । দ্রুত নেমে আসি পথে । দেখি মেজদা বাঘটার পথ আটকাবার চেষ্টা করেছিল, দাদার মুখে থাবা মেরেছে । এটা নিশ্চয়ই অ্যাটাক ।

মেজদাও ছাড়বার পাত্র নয় । ছুটে গিয়ে মুড়কিকে ধরে ফেলল । বাঘটা আর একবার মেজদার পিঠে লাফিয়ে উঠে ধাক্কা মেরে হালুম হালুম করতে করতে দুধুলির জঙ্গলে ঢুকে গেল । মেজদা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেও দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গিয়ে ফের মুড়কির হাত চেপে ধরল আরও শক্ত করে ।

মুড়কিকে হিড়হিড় করে টেনে এনে বাড়িতে এক প্রকার গলা ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে ঠেলে তুলল । তারপর ছোট একখানি ঘরে ঠেলে দিল সজোরে । হাতের থলেটা জোর করে কেড়ে নিয়ে বিনুমাসির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "বিশ্বাস তো করোনি । এবার হাতেনাতে ধরেছি । যাও, আগে সিন্দুক খুলে ঝোলাটা ঢোকাও । তালা ঠিক করে লাগিয়ে চাবি নিজের কাছে রাখো !"

রাত্রে হিম পড়ল বেগতিক । চাঁদ কুয়াশায় ঢেকে যেতে লাগল বার বার । দুধুলির জঙ্গলে কুয়াশা ভরে গেল । গাছের পাতা ভিজে গেল । পাতা চুঁইয়ে শিশিরের জল কুয়াশার জল ঠাণ্ডার জল বাঘটার মাথায় চুঁইয়ে পড়তে লাগল । বুড়ো বাঘ কিছুই করতে পারল না । সারা রাত জীবনের এক সীমাহীন লজ্জায় অপমানে হিম পোয়াতে থাকল । তার মনে পড়ল ছেলেবেলার চাঁপাফুলি রোদ আর শিউলির গন্ধ আর দিগন্ত ছড়ানো সাদা কাশফুলের পৃথিবীকে । তার তখন মায়ের কথা মনে হল । কুমড়োজোলের খড়ের ঘর, মাটিতে নিকনো মেঝে আর উঠোন, উঠোনে মায়ের হাতে আঁকা আতপজলের আলপনা । সেই আলপনা মায়ের সঙ্গে এঁকেছিল মুড়কির মা বিমলি । সিধুর বোন ।

ভোরে বন্ধ ঘর থেকে বার করা হল মুড়কিকে । বিচার বসে গেল । মা আর বাবাকে ডেকে আনলাম আমি । মেজদার নির্দেশে । ন'বউ কাপড়ের তলায় হাত লুকিয়ে একটা চোর দেখতে এসেছে ।

মেজদার কড়া প্রশ্ন, "তুমি কে ?"

উত্তর, "আমি মুড়কি ।"

প্রশ্ন, "বাড়ি কোথায় ?"

মুড়কি বলল, "কুমড়োজোল ।"

প্রশ্ন, "মা-বাবার পরিচয় ?"

উত্তর, "বাবা শ্রীপতি গুন । গত বছর কলেরায় মরেছে । মা বিমলি চোকলা । বিয়ের আগে চোকলা বিয়ের পর গুন !"

"চটবাবা কে ?"

"টংকা ।"

"টংকা কে ?"

"আমার ছোট মামা ।"

"তা হলে মামা-ভাগ্নেয় যোগসাজসে বিনুমাসির ঘরে চুরি করলে ? বলো, জবাব দাও ।"

মুড়কি মাথা নিচু করে রইল কিছুক্ষণ । তারপর চোখ তুলল ।

প্রশ্ন, "তুমি সার্কাসে চাকরি করতে ?"

"হ্যাঁ ।"

"বাঘ সাজতে ?"

"হ্যাঁ ।"

"সবই টংকার কারসাজি । আগে ভানুমতীর খেলা দেখাতে ?"

"হ্যাঁ, ম্যাজিক, গান আর খেলা ।"

"বেশ । তা হলে বলো, কত টাকা চুরি করেছ ?"

"চুরি করিনি ।"

মিথ্যা বলায় তেড়ে মারতে গেল মেজদা । বিনুমাসি মেজদাকে আটকালেন ।

প্রশ্ন, "সার্কাসে যখন সত্যিকার বাঘ এল, তখন তোমার চাকরি চলে গেল !"

"হ্যাঁ ।"

"তা হলে বাঘ বড় না মানুষ বড় ?"

"মানুষই বড় ।"

"আরে রাখো ! তোমার দাম তো মাত্র চার পয়সা ।"

মুড়কি বলল, "সেটা তো পোশাকের দাম । বাঘ সাজতাম বলে চার পয়সা । আসলে মানুষের দাম অনেক । টংকা আমাদের দ্যাখে না । আমার বিধবা মাকে বড়মামা তো দ্যাখে ! তবে চারপয়সায় সার্কাসের বাঘ হওয়া যায় । বাড়ির বাঘ হতে গেলে রুপোর টাকা লাগে ।"

"এসব কথার মানে কী ? কে তোমার বড়মামা ?"

"সিধু গুন !"

"কী বললে ?"

"সিধু গুন আমার বড়মামা ।"

ঘরের মধ্যে কেমন এক চাপা গুঞ্জন উঠল । মা আর বাবা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন । বিনুমাসি খুব নরম আর বিস্ময় ভরা চোখে মুড়কিকে দেখছিলেন ।

ন'বউ সোফায় বসে আঁচলের তলায় ঢুকিয়ে রাখা হাতখানা মৃদু-মৃদু নাড়ছিল । গতকাল সে তার লজ্জার কথা বলে শেষ করতে

পারেনি। আজ বলতে এসে বাঘের মুখে পড়েনি বটে, তবে এমন এক দ্বিধায় পড়েছে যে কথা বলার সুযোগই পাচ্ছে না, ফের তার কথা না বললেও নয়।

হঠাৎ বিনুমাসি কী মনে করে অন্য ঘরে উঠে গেলেন। মিনিট দুই পর ফিরে এলেন। ওঁর হাতে জালি।

মাকে দেখিয়ে শুধোলেন, "সিধুর গেঁজে তো দিদি?"

মা বললেন, "হ্যাঁ। কোথায় পেলি?"

"মেঝেয় পড়েছিল।"

"কেন?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছিনে।"

বলে মাসি মুড়কির চোখে চাইলেন সপ্রশ্ন।

মুড়কি বলল, "রুপোর থালা, বিছেহার, টায়রা, টিকলি সবই বড়মামা চটবাবাকে দিয়েছে।"

মুড়কি বলতে বলতে থেমে গেল। মেঝেয় বসে থাকা ওর চোখ দুটি ঈষৎ ছলছল করে উঠল। দম নিল খানিক।

বলল, "টংকাবাবাকে বড়মামা খুব ভয় পায়। এতসব দেওয়ার পরও জোকারটার মন উঠল না। বলল, গেঁজের রুপোর টাকাগুলি দিতে হবে। নইলে আমার যেমন পোশাক কেড়ে নিয়ে সার্কাস থেকে 'দূর হ' বলেছিল, তেমনি করবে, বড়মামার পোশাক কেড়ে নেবে। টংকাই সিধুকে বাঘ করেছে সে কথা ফাঁস করে দেবে।"

বাবা শুধোলেন, "তারপর তুমি কী করলে?"

মুড়কি বলল, "আমি আর কী করব? মাকে দ্যাখে না টংকাবাবা। আমার সঙ্গে বড় একটা কথাও বলে না। বাবাগিরি আর জোকারি ওর কাজ। ওর তাঁবেদারি সবাই করে। কুমড়োজোলের সারা তল্লাট বাবার খাসতালুক, মানুষকে যে বাঘ বানায় সে তো ঠিক। সবাই মনে করে কুমড়োজোলের পশুপাখিও বাবার বশ। বাবারই নামগান করে। আমি তো ভানুমতীর নাচ ছাড়া কিছুই জানি না।

"চিরল চিরল ছায়া রে
কুমড়োজোলের মায়া রে
মায়াবতী ভানুমতী
ডিগডিগাডিগ ডিগা রে..."

"এই গানটা জানি। ডিগবাজি দিতে-দিতে গাইতে হয়।"

আবার থামল মুড়কি। আবার ওর চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। এই ছেলেকে সারারাত ঘরে বন্দী রাখা হয়েছিল।

ন'বউ পুলকিত হয়ে বলে উঠল, "তারপর? ওর কাপড়ের তলায় হাতখানা নড়ে উঠল।"

মুড়কি বলল, "হঠাৎ একদিন টংকাবাবা আমাকে ডেকে বললে, 'তোর বড়মামা কষ্টে আছে। পথ বাতলে দিচ্ছি, চলে যা। ওর কাছে রুপোর টাকা আছে, নিয়ে আসবি। আমার দলের মেয়েদের রুপোর হালকা নাক-বালা করে দেব। বলবি, যদি না দিতে চায়, হুঁশমন্ত্র পড়ব। হুঁশ মানে চৈতন্য। সে যে কাজের লোক সিধু, টের পাবে। যা চলে যা।'"

"তারপর তুমি বালাখানায় এলে?" বাবার প্রশ্ন।

"হ্যাঁ। কিন্তু বাড়িটা চিনতে পেরেও ঢুকতে পারি না। একদিন সন্ধেয় চাঁদ উঠল, দেখি, একটা বাঘ তোমাদের এই ছাতে বসে আছে। তার আগে মামা আমাকে জানলা দিয়ে দেখেছিল। সেই মামা এখন জঙ্গলে পড়ে আছে। মামার হুঁশ হয়েছে বলে আসতে পারছে না। মাঝে থেকে মামার সব গেল। এখন ওই খালি গেঁজে কী হবে, তাই ফেলে দিয়েছে।"

মুড়কি সামান্য থামল।

বলল, "আমাদের যেতে দাও মাসি। আমরা চুরি করিনি।"

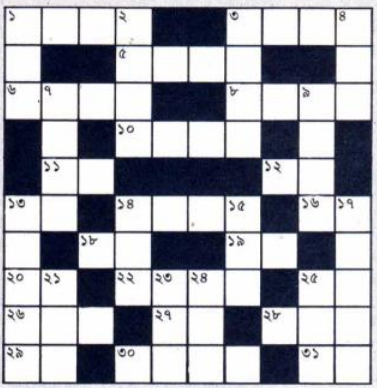

সংকেত : পাশাপাশি : (১) আসর। (৩) শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষক। (৫) ধনুর্ধর। (৬) মণিপুর-রাজকন্যা, মহাভারতের এক চরিত্র। (৮) যা ঘটছে। (১০) উত্তর ভারতের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। (১১) বানর। (১২) সেতু। (১৩) সংবাদ। (১৪) অদ্ভুত, বিশ্বাসের অযোগ্য। (১৬) এই ছোট্ট প্রাণীটিকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। (১৮) জল। (১৯) বিষ্ণু-কর্তৃক নিহত দুই অসুরের একজন। (২০) বৎসর। (২২) ব্যাকরণে স্বরভক্তি। (২৫) তারবাদ্যবিশেষ। (২৬) দুই চাকার বা তিন চাকার গাড়ি। (২৭) এ থেকে তেল বা নাড়ু। (২৮) সাপ। (২৯) যে-শব্দ প্রায়ই কারখানার আগে থাকে। (৩০) সদস্য, সভায় উপস্থিত ব্যক্তি। (৩১) দুই পক্ষ সমান হলে খেলায় বা যুদ্ধে কেউই যা স্বীকার করতে চায় না।

উপর-নীচ : (১) কিরণ। (২) রামমোহন রায় যে-প্রথা রদ করিয়েছিলেন। (৩) নেপথ্য। (৪) পতাকা। (৭) ত্রাতা। (৯) সংগীতের রাগবিশেষ। (১৩) এই পরীক্ষাই তো ক্লাসে ওঠায়। (১৪) ভাষাবিশেষ, যা থেকে বাংলায় অনেক শব্দ এসেছে। (১৫) বিষণ্ণ, দুঃখিত। (১৭) আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনা। (২১) পরীক্ষায় যা করা অনুচিত। (২৩) সহজাত অসামান্য ক্ষমতা। (২৪) ঘড়া। (২৫) বাজন বা বাতাস দেওয়া।

গত সংখ্যার সমাধান

পা	ল	ক	■	অ	জ	■	বি	হ	গ
স্থ	■	ন	■	স	ব	■	ভা	■	■
শা	ব	ক	■	ম	র	■	ব	খ	রা
লা	ল	ন	■	ত	দা	■	সু	র	জ
■	বা	■	ক	ল	র	ব	■	শা	■
গা	ন	■	র	■	■	ল	■	ন	ত
ভী	■	ব	পু	■	■	রা	হু	■	ম
ব	শ	■	ট	ম	ট	ম	■	ব	সা
ধ	ম	ক	■	হি	ং	■	অ	ন	চ্ছ
ম্বা	■	শা	ন্তা	■	■	মা	ঘ	■	ন্ন

রঞ্জন

ন'বউ বলল, "আমি একটা কথা কই।"

মেজদা বলল, "দাঁড়াও। তোমার কথা শুনছি পরে। আগে দেখা দরকার, ওই সিন্দুকে যে ঝোলাটা রেখেছেন বিনুমাসি, ওটায় কী আছে ?"

"কিছু নেই।"

"নেই বললেই কি হয়। ওটা দেখলেই সব ধরা পড়বে।"

"ওটা দেখো না দাদা! কিছু নেই ওতে!"

আমি বললাম, "একটা রহস্য আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

বাবা আমার দিকে চাইলেন। "বল!"

"ওই ঝনাৎ ঝুনঝুন!"

বিনুমাসি হা-হা করে হেসে ফেলে বললেন, "ওরে পাগল। ওটা রুপোর পঞ্চম জর্জের বাজনা! একটু সেকেলে!"

"তা না হয় হল! কিন্তু হঠাৎ সেদিন, তোমার পয়সা হারানোর পর বাঘের গা থেকে বাজনা বাজল কেন?"

মুড়কি বলল, "তাই বোঝোনি! গেঁজেয় টাইট হয়েছিল পয়সাগুলো। মামা যখন আমাকে দিতে যায় ভেবেছিল জালিটা কাছেই রেখে দেবে। পুরনো মায়া। কতকাল ধরে একটা-দুটো করে জমিয়েছে। তাই জালি থেকে পয়সা খসিয়ে বুকের তলার পকেটে নিয়েছিল। আমায় টাকাগুলো থলেয় ঢেলে দিয়ে গেঁজেটা দেখাল। একটা লম্বা করে শ্বাস ফেলে বললে, এ রেখে আর কী হবে! তবু ফেলল না রাস্তায়। মাসি কোথায় পেয়েছে মাসিই জানেন। মামার সব গেছে।"

মা বললেন, "হুঁশ তো হয়েছে। তাই রক্ষে।"

বাবা বললেন, "তাই বা আছে কোথায়—এতক্ষণ ও জঙ্গলে থেকে গেল! চলো, বুড়োকে একবার খুঁজে দেখি।"

"কিন্তু মাসির গ্রিটিং খামে ভরা পাঁচশো টাকা কোথায় গেল!" মেজদা সামান্য চেঁচিয়েই উঠল।

সবাই ওঠার চেষ্টা করছিল, মেজদার কথায় থেমে পড়ল। খুব বিরক্তির সঙ্গে বিনুমাসি সিন্দুকের থলে এনে টেবিলের উপর রেখে বললেন, "নাও, দ্যাখো কী আছে!"

ন'বউ বলল, "আমি বলি কি..."

মেজদা ধমক দেয়, "তোমায় কিছু বলতে হবে না।"

"আহা বলতেই দে না বাপু!" মা বললেন।

"আমার চিতলি মুখপুড়ি..."

"চুপ করো। আগে থলেটা খোলো তো মাসি!"

"বলি কি, কখনও এমন করে না। শুধু ওই, অমন সুন্দর একটা..."

"আহা খোলোই না!"

"হালুম!"

"ওই দ্যাখো!"

বলে ন'বউ কেঁপে উঠল। মাসির হাত থেমে গেল। বাঘ এসেছে। এত কথার পরও মনে হল বাঘই এসেছে। কেন মনে হল আমরা জানি না।

আবার হালুম।

বাইরে ছুটে এলাম আমরা। ছাদে এলাম। সিঁড়ির মুখ দেখলাম। কোথাও তাকে দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক দেখার পর ঘরে এসে দেখি মুড়কি নেই। ঝোলা হাতে করে সে সিঁড়ি ভেঙে পালানোর চেষ্টা করছিল। মেজদার হাতে ধরা পড়ে গেল।

গালে একটা ঠাস করে চড় দিয়ে মেজদা ওকে মেঝেয় এনে দাঁড় করালে ঘরের ভিতর।

এবার সে নিজে হাতেই ঝোলাটা উপুড় করতে যাবে এমন সময় আবার হালুম। এই ছিল বাঘটার শেষ সম্মানের ডাক।

মেজদা শুনল না।

উপুড় হল ঝোলা।

কাগজ মোড়া রুটি, তরকারি আর শুকনো মিষ্টি।

কারও মুখেই কোনও কথা সরছিল না।

বাঘটা এবার সোজা ঢুকে এল ঘরে। মাথা নিচু করে বসল মেঝেয়।

বলল, "আমার ভাগ থেকে বিমলির জন্য দিয়েছি দিদি। এতবার হালুম করলাম, তোমরা শুনলে না। তা কেন শুনবে, বাঘ তো আর হতে পারিনি। চ মুড়কি, আমরা যাই।"

"কোথায় যাবি সিধু!"

মা হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।

ন'বউ বলল, "সেই তখন থেকে বলছি, একবার শোনো, একবার শোনো। আমার কথায় কেউ কান দিচ্ছে! সুন্দর ফুল আঁকা ছাপ দেখে চিতলি লোভ সামলাতে পারেনি। এই নাও। চোর হয় মানুষ। বাঘ কি হয়? আমায় মাফ করে দিও বিনু। নইলে আর আসব না।"

বলে ন'বউ গ্রিটিং খাম আর কিছু খুচরো পয়সা টেবিলে রেখে দিয়ে চলে যাবার আগে কোলের বাচ্চাকে বাঘের কোলে বসিয়ে দিয়ে বললে, "নাও বাছা! ধরো মারো যাই করো, তুমি তো মানুষ! তুমিই বলো, বাচ্চা ছেলের চোখে লোভ, চোখে খিদে। তাই কি না! মানুষ হয়ে তুমি ভাল করলে বাছা!"

এই কথায় হু হু করে কেঁদে উঠল বৃদ্ধ সিধু গুন। তার কান্না দেখে মায়ের কান্না আর কিছুতেই থামতে চায় না। বাঘের পোশাকের ভিতর বদ্ধ থাকা, রুদ্ধ আঁধারে বন্দী, কথা না বলতে পারা সিধু আজ মানুষের মাঝে বসে আবার আর-একবার মানুষ হতে পেরে দুঃখে না আনন্দে কাঁদছে বোঝা যাচ্ছিল না।

তবে সে আর মায়ের সঙ্গে ফিরতে চাইল না। মুড়কিকে সঙ্গে করে পথে নেমে গেল। বিনুমাসির পায়ের কাছে চিকি এসে আহ্লাদে লুটিয়ে পড়ল।

বাঘের প্লেট নেমে গেল। তবে মাসির বাঘ পোষার শখ কিছুটা মিটেছে বইকী!

তবে আমার মনের মধ্যে চিতামুণ্ডী পাহাড়ের সাদা মেঘ কিছুতেই নড়ছিল না। সে এক ম্যাজিকের পাহাড়। জাদুমোড়া এক ফল্গু নদী বোধিতোয়া এখনও বইছে, বইছে সে এক স্রোত। ভাসছে মোচারঙের ডোঙা। চটবাবার সার্কাস সারা সংসারে ঘুরছে। মনে গান ভেসে আসে :

চিরল চিরল ছায়া রে,
কুমড়োজোলের মায়া রে...

কানে ভেসে এল সেই গান। হাটের মোড়ে লোকজন তামাসা দেখছে ভিড় করে। দেখি, সার্কাসের মতো ডিগবাজি করছে মুড়কি। হাতে পায়ে গায়ে উল্কি। বুড়ো সিধু ডুগডুগি বাজাচ্ছে। চড়াম-চড়াম করে বাতাসে যেন পায়রা ঝাপটানোর শব্দ। ভাঙাচোরা বুক। হাঁফানির টানে আর খিদেয় পেট সেঁধিয়ে গেছে। ভাগ্‌নের জিভ কাটার সময় হাত-পা কাঁপছে ওর থরথর করে। রক্ত ফিনকি দিয়ে গায়ে এসে পড়ল। জিভ কেটে যাওয়ার গোঁজলা তোলা অদ্ভুত আর্ত বোবা চিৎকার সহ্য করা যায় না। ফুঁসমন্ত্র আওড়াচ্ছে সিধু বিড়বিড় করে। টলে-টলে পড়ে, যেতে-যেতে মাটিতে শুয়ে থাকা ভাগ্‌নেকে দেখিয়ে ফাটা গলায় ধুঁকতে ধুঁকতে বলছে, "ইবার হুঁশ মন্তরে ছেলে তাজা হবে। শুয়ে আছে বাঘের বাচ্চা! আমি ওর বাপ। হালুম!"

(সমাপ্ত)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আরেব্বাস ! ভদ্রমহিলার লাঠিতে জোর ছিল বটে !
ভদ্রমহিলা ?···ভদ্রমহিলা পেলেন কোথায় ? আততায়ী আমার মাথায় মুগুর দিয়ে মেরেছে, সার ! ও মহিলা নয়, পুরুষ । বয়েস বাইশ, পিছনের দু'টি দাঁত নেই, পায়ে রবার-সোলের জুতো, আর ও 'স্যাটারডে পোস্ট' পড়ে ।
আপনি নিশ্চিত ?
হ্যাঁ ! এবার আর ও ফাঁকি দিতে পারবে না ! এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার কুকুর ফেরত পাবেন !
এটাই আমার সেরা কাজ ! আপনার একটা কুকুর হারিয়েছে তো ? শুধু একটা ?
এই নিন, সার··· সতেরোটা ধরে এনেছি । আর সবই অতি উত্তম জাতের কুকুর !···
?
বেশ করেছেন ! অজস্র ধন্যবাদ । তবে এর মধ্যেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে । এবার নিজেই তদন্তে নামব ।
শিকাগো ট্রিবিউন !··· নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড !···
বাহ্ ! জানলায় সাদা রুমাল···তা হলে ও টাকা দেবে !
আমাকে সব কাগজ একটা করে দাও !
এখনও কাগজে খবরটা নেই । তার মানে ও পুলিশে খবর দেয়নি !
মুনসাইন ক্লাব পানীয় পাওয়া যায়

আমেরিকায় টিন টিন

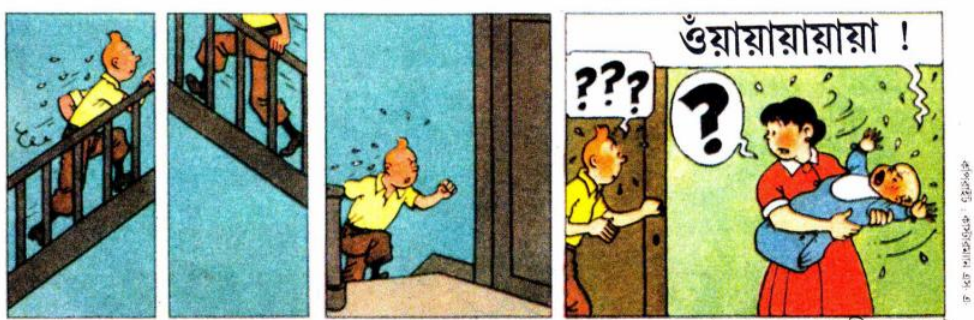

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাট ম্যান
শেরিফের হাত থেকে পালিয়ে ব্যাটম্যান আর রবিন বিগ টিম হেলের মাঠের ভেরায় চলেছে। বিগ টিম রুথ পার্কারের তেলসমৃদ্ধ জমি ভয় দেখিয়ে কিনতে চায়···
হয়তো···কিন্তু মনে রেখো, আমাদের কাজটা অবৈধ। আইন এখন ওদেরই পক্ষে!
আলো জ্বলছে। নিশ্চয় বিগ টিম আছে!
তখন, রুথের বাড়িতে···
শেরিফ, আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ দেব জানি না!
টিম খেপে যাবে। তবে আশা করি ওরা টিমের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করবে, আমি যা পারিনি!
বিগ টিমকে ফোন করে ওদের খোঁজে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে হবে মনে হচ্ছে···
ওদের খুঁজে না পেলেই ভাল!
একটু বাদে···
কী বলছেন, শেরিফ? ওদের পেয়েও ধরতে পারেননি? অপদার্থ!
শুনলে পিটি?
আমি কালা নই, আর মনেও শান্তি নেই!
তোমাদের দু'জনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলার আগে ওদের ধরো!
তা আর বলতে! ওরা পিছু নিয়েছে ভেবে চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে!
পিছু নিইনি, পিটি তোমাকে ধরেছি!
ওরা!
তেলের ব্যাপারে চুঁ মারছ, অ্যাঁ? এই নাও, তেলের নমুনা দ্যাখো!
ধন্যবাদ···
আর এই দ্যাখো চুঁ মারার নমুনা!
গুলি এড়িয়ে গেলে? এবার তা হলে ঘুসি সামলাও!
তেলে ব্যাটম্যানের পা পিছলে গেল···
তোমার শেষ ভুল!
ব্যাটম্যান···সাবধান!
ব্যাটম্যান!
চেঁচিয়ে লাভ নেই! ওর কানে যাচ্ছে না
দুটোকেই বেঁধে ফ্যালো! ওদের নাইট্রোগ্লিসারিন ট্রাকে সফরে পাঠাব!
9

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কালাঘর থেকে নেমে এসে ছত্তী চলে এলেন রাজপ্রাসাদে। ওপরে উঠে দেখলেন, লম্বা টানা বারান্দার মাঝখানে একটা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমার তীক্ষ্ণ।

ছত্তী থমকে দাঁড়িয়ে ভুরু কোঁচকালেন। লোহার দ্বারের ওপাশে রাজকুমারের থাকার কথা। সে এপাশে এল কী করে?

তা ছাড়া ওই মূর্তিটাই বা কার?

প্রথমে তিনি ভাবলেন, হাঁক-ডাক করে প্রহরীদের ধমকাবেন। তারপর তিনি নিজেই আস্তে আস্তে এগোলেন রাজকুমারের দিকে।

একটা পাথরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে তীক্ষ্ণ, তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

ছত্তী দেখলেন, সেই মূর্তিটা তলতাদেবীর। তিনি দারুণ চমকে উঠলেন।

রাজকুমারকে না ডেকে তিনি এগিয়ে গেলেন প্রহরীদের দিকে। যাকে সামনে পেলেন, তার চুলের মুঠি চেপে ধরে দাঁতে-দাঁত পিষে তিনি বললেন, "পামর, ওই মূর্তিটা এখানে কে এনেছে? কে এনেছে? শীঘ্র বল, নইলে এই মুহূর্তে তোর প্রাণ যাবে!"

ছত্তীর এরকম উগ্রমূর্তি দেখে প্রহরীটির প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে গেল, ভয়ে তার মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না।

ছত্তী আর-একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "এখনও চুপ করে আছিস?"

প্রহরীটি এবার কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "প্রভু, রাজবাড়ির বাগানে একজন শিল্পী এই মূর্তিটা গড়েছিল। আমাদের মহারানির মূর্তি। তারপর কে সেটা ওপরে নিয়ে এসেছে আমি জানি না।"

প্রহরীটির বুকে পদাঘাত করে ছত্তী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "মহারানির মূর্তি মানে কী রে, হতভাগা? কে মহারানি? জানিস না, এ-রাজ্যে এখন কোনও মহারানি নেই?"

অন্য প্রহরীদের দিকে রক্তচক্ষে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে এই মূর্তি ওপরে এনেছে?"

আর একজন প্রহরী বলল, "সেই শিল্পীই মূর্তিটা ওপরে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি দেখেছি!"

ছত্তী বললেন, "সেই শিল্পীকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করো। যাও, ছুটে যাও, তাকে ধরার পর আমাকে খবর দেবে। আর এই মূর্তিটাকেও সরিয়ে ফেলবে এই দণ্ডেই!"

তারপর ছত্তী ধীরে-ধীরে তীক্ষ্ণর কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে কোমল গলায় বললেন, "এখানে কী করছ, কুমার?"

তীক্ষ্ণ বলল, "কিছু না।"

ছত্তী বললেন, "এই মূর্তিটা দেখতে বিশ্রী হয়েছে। তাই এটা এখানে রাখা হবে না। আমি ভেঙে ফেলতে বলেছি!"

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞেস করল, "আমার মা কোথায়?"

ছত্তী বললেন, "তোমার মাকে তুমি আর দেখতে পাবে না। মাকে তুমি ভুলে যাও, কুমার। তুমি তো আজ নিজের চোখেই দেখলে, সকালবেলা তোমার মা তোমাকে দেখেও পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। উনিই তোমার বাবাকে হত্যা করেছেন। তোমার মা পাপীয়সী। অমন মাকে মনে রাখতে নেই।"

তীক্ষ্ণ চুপ করে গেল।

ছত্তী বললেন, "এবার শুয়ে পড়বে চলো। তোমার বাবা নেই, মা নেই, এখন থেকে আমিই তোমার বাবা ও মা।"

ছত্তী আদর করে তীক্ষ্ণকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। তীক্ষ্ণ কোনও আপত্তি করল না। ছত্তী চলে যাবার পর সে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ছত্তীও একটু পরে শুয়ে পড়লেন নিজের শয্যায়। চক্ষু বুজে তিনি কালকের রাত থেকে আজকের রাত পর্যন্ত সব ঘটনা ভাবতে লাগলেন। একদিনের মধ্যে কত কী হয়ে গেল। মহাশক্তিশালী রাজা মহাচূড়ামণি, যাঁকে অন্য কোনও রাজা হারাতে পারেননি, তিনি এখন নিহত। মহারানি তলতাদেবীর বুদ্ধির প্রশংসা করত সবাই, সেই মহারানি এখন অন্ধকার কারাগারে চিরজীবনের মতন বন্দিনী। চম্পক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন এই রাজ্য নিষ্কণ্টক। সিংহাসন ছত্তীর করায়ত্ত।

পরম নিশ্চিন্তভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন ছত্তী।

খানিকবাদেই তাঁর আবার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন, ঘামে ভিজে গেছে তাঁর সারা শরীর!

ঘুমের মধ্যে ছত্তী দেখেছেন একটা বাচ্চা ছেলের মুখ!

রাজা মহাচূড়ামণিকে খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেবার সময় দু'জন সাক্ষী ছিল। একজন মেষপালক আর তার সঙ্গে একটি ছেলে। ছত্তী সেই মেষপালকটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাছে ডেকে এনে তার মুণ্ডু কেটে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওই ছেলেটা যে পালিয়ে গেল! পৃথিবীতে ওই ছেলেটিই একমাত্র জানে যে, ছত্তীই রাজা মহাচূড়ামণির হত্যাকারী।

এই ছেলেটিকে তো বাঁচতে দেওয়া যায় না।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে ছত্তী দ্রুত পোশাক পরতে লাগলেন। উত্তেজনায় তাঁর শরীর কাঁপছে।

ঘর থেকে বেরোতেই প্রহরীরা উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাল তাঁকে। ছত্তী বললেন, "সেনানায়ক ভামহ কোথায়? শিগগির তাঁকে ডাকো!"

ছত্তী নিজেই দৌড়ে চলে এলেন রাজপ্রাসাদের বাইরে।

সেনানায়ক ভামহ তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জরুরি ডাক পেয়ে তিনি ছুটে এলেন।

ছত্তী তাঁকে একপাশে ডেকে বললেন, "তুমি শিগগির দশজন অতি বিশ্বাসী সৈন্যকে প্রস্তুত হতে বলো। আমার সঙ্গে যেতে হবে!"

ভামহ হাত জোড় করে বললেন, "এত রাতে কোথায় যেতে হবে, প্রভু?"

ছত্তী বললেন, "প্রশ্ন কোরো না! মনে রাখবে, আমার প্রত্যেকটি কথাই আদেশ। আমি অবিলম্বে রওনা হতে চাই। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।"

একটু পরেই দশজন অশ্বারোহী সৈন্য ও ভামহকে সঙ্গে নিয়ে ছন্ডী বেরিয়ে পড়লেন।

ভামহের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে-যেতে ছন্ডী বললেন, "আমি একটু আগে একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম, কুরালা নামে একটি গ্রামে একটি বালক আছে। এই বালকটির কপালে একটা তিল আছে। বড় অশুভ লক্ষণ। যার কপালে এইরকম তিল থাকে, সে বড় হয়ে রাজ-হত্যাকারী হয়। এই বালক নিশ্চিত বড় হয়ে আমাদের রাজকুমার তীক্ষ্ণকে হত্যা করবে! সুতরাং এখনই সেই বালকটিকে বন্দী করা দরকার। নইলে রাজ্যের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

শিউরে উঠে ভামহ কপালে হাত চাপা দিলেন। তাঁর কপালেও তো তিল আছে একটা!

ভামহের এই ভাবান্তর ছন্ডীর চোখ এড়াল না। তিনি বললেন, "তোমার কপালে যেটা আছে, ওটা তিল নয়, আঁচিল। ওতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু যাদের কপালে লাল তিল থাকে, তারা অতি সাঙ্ঘাতিক হয়! সুতরাং যে-কোনও উপায়ে এই বালকটিকে খুঁজে বার করতেই হবে। আজ রাত্রের মধ্যেই। যদি কখনও কোনও দিকের প্রজারা বিদ্রোহ করে, তখন তারা এই বালকটিকে কাজে লাগাতে পারে।"

অন্ধকার রাস্তায় ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ হতে লাগল। অশ্বারোহীরা এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।

কুরালা গ্রামটি পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায়। তারপর আর কোনও জনবসতি নেই।

সেই গ্রামের প্রান্তে এসে ছন্ডী ঘোড়া থেকে নেমে একটা পাথরের ওপর বসলেন। একজন সৈন্য একটি মশাল জ্বেলে তাঁর পাশে রাখল।

ছন্ডী বললেন,"এবার তোমরা যাও, গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ি তল্লাশ করো। এ-গ্রামের ছয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত সব ছেলেদের আমার সামনে এনে হাজির করাও।"

গ্রামটি একেবারে ঘুমন্ত। ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে। এরই মধ্যে সৈন্যরা এক-একটা বাড়িতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। ঘুম ভেঙে লোকেরা উঠে এলে সৈন্যরা তাদের ঠেলে ঢুকে পড়ছে ঘরের মধ্যে। বিছানা থেকে টেনে-টেনে তুলতে লাগল বাচ্চাদের। মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে শুধু ছেলেদের টেনে-টেনে আনতে লাগল বাইরে। ছন্ডীর সামনে।

ছন্ডী এক-এক করে তাদের পরীক্ষা করতে লাগলেন। মশালটা মুখের সামনে এনে দেখলেন ভাল করে। সকালবেলার ছেলেটিকে তিনি সামান্য একটুক্ষণের জন্য দেখেছিলেন, তবু ভোলেননি। ছেলেটির মুখ লম্বা মতন, টানা-টানা চোখ, টিকলো নাক, মাথা ভর্তি চুল, তার ডান দিকের ভুরুর ওপর বোধহয় একটা কাটা দাগ ছিল।

এক-একটি ছেলেকে সামনে দাঁড় করিয়ে ছন্ডী তার মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। কারও মুখ গোল, কারও নাক থ্যাবড়া। ছন্ডী তাদের বাতিল করে দিতে লাগলেন।

একজনকে মুখ লম্বাটে কিন্তু চোখ দুটো ছোট-ছোট। তবু ছন্ডী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর নাম কী?"

ছেলেটি জানাল যে তার নাম ভল্ল।

ছন্ডী জিজ্ঞেস করলেন, "তুই আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলি?"

ছেলেটি বলল, "কোথাও তো যাইনি, বাড়িতে ছিলাম।"

ছন্ডী বললেন, "তোর বাবা কোথায়?"

কে প্রথম

প্রথম কুমেরু-অভিযাত্রী দল

কুমেরু-অঞ্চল প্রথম অতিক্রম করেছিলেন ৫০ বছর বয়সের ব্রিটিশ ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ ভিভিয়ান ফুক্স-এর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি দল। ১৯৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর ওয়েডেন সাগরের স্যাকলটন-ঘাঁটি থেকে যাত্রা করে কুমেরু হয়ে ২১৫৮ মাইল পথ পেরিয়ে ১৯৫৮ সালের ২ মার্চ তাঁরা রস্ সাগরে অবস্থিত স্কট-ঘাঁটিতে পৌঁছন। এই অভিযানের প্রস্তুতিতে সময় লেগেছিল দু'বছর এবং এই প্রস্তুতির অন্তর্গত ছিল স্কট-ঘাঁটি থেকে শুরু করে সারা পথে সরবরাহকেন্দ্র স্থাপন। এই কাজটি করেছিলেন এভারেস্টবিজয়ী সার এডমন্ড হিলারির নেতৃত্বে একটি দল।

ফুকস্-এর অভিযাত্রীদল এই অভিযানে তুষার এবং বরফের ভিতরে চলবার উপযোগী বিশেষভাবে তৈরি ট্যাঙ্কের মতো ছ'টি গাড়ি সঙ্গে নিয়েছিলেন। এই পথে মারাত্মক বিপদগুলির মধ্যে একটি ছিল বরফের মধ্যে তুষারসেতুতে ঢাকা গভীর সব খাদ। কয়েকবার এইসব তুষারসেতু গাড়ির চাপে ভেঙে পড়ে এবং গাড়িগুলিকে নিরাপদ জায়গায় টেনে তুলতে হয়। এইসব গাড়ি এবং এই গাড়িতে-টানা স্লেজগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেগুলি প্রায়ই মেরামতের প্রয়োজন হয়। মেরামতের মধ্যে ঢালাই-এর কাজও ছিল এবং তা করতে হয়েছিল শূন্যাঙ্কের নীচে ৪০ ডিগ্রি উষ্ণতায়।

ছেলেটি বলল, "বাবা ওই তো দাঁড়িয়ে !"

ছেলেটির বাবাকে ডেকে আনানো হল। ছত্তী তাকেও দেখলেন। সে একটি নিরীহ, রোগা মতন লোক। ছত্তী বললেন, "এরা অন্য। সেই ছেলেটির বাবা বেঁচে থাকতে পারে না।"

আর-একটি ছেলেকে দেখা গেল, তার মুখ লম্বাটে, নাকও টিকলো। তার ডান দিকের ভুরুর ওপর অবশ্য কাটা দাগ নেই। কপালে তিল অবশ্য এ-পর্যন্ত একজনেরও দেখা যায়নি।

ছত্তী এই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই, তোর নাম কী রে ?"

ছেলেটি চুপ করে রইল।

ছত্তী ধমক দিয়ে বললেন, "উত্তর দিচ্ছিস না কেন ? তোর নাম জানিস না ?"

ছেলেটি তবু কোনও কথাই বলল না।

ছত্তী এবার ঠাস করে একটা চড় কষালেন ছেলেটির গালে।

একজন প্রৌঢ় লোক হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে এসে বলল, "প্রভু, ওকে মারবেন না, মারবেন না। ও কথা বলতে পারে না। আমার এই নাতিটা বোবা !"

এই কথাটা শুনে ছত্তীর আরও সন্দেহ হল। ভুরু কুঁচকে তিনি বললেন, "বোবা ? আমার সামনে মিথ্যে কথা বলছিস ? ছেলেটা বোবা কি না পরীক্ষা করে দেখছি। এর বাবা কোথায় !"

প্রৌঢ়টি বলল, "প্রভু এর বাবা মারা গেছে। আমি ওকে মানুষ করেছি।"

ছত্তী আরও সন্দেহের সঙ্গে বললেন, "ওর বাবা মারা গেছে ? কবে ?"

প্রৌঢ়টি বলল, "ওর বাবা মারা গেছে এক বছর আগে। জঙ্গলে গিয়ে ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সে প্রাণ দিয়েছে।"

ছত্তী বললেন, "একবছর আগে, না আজই সকালে সে মরেছে ?"

প্রৌঢ় বলল, "আজ নয় হুজুর, বছর পার হয়ে গেছে !"

ছত্তী হঠাৎ তাঁর মশালটা নিয়ে ছেলেটির হাতে ছ্যাঁকা দিয়ে দিলেন। ছেলেটি যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না।

ছত্তী বললেন, "হুঁ।"

তারপর একজন সৈন্যকে ডেকে বললেন, "ওর পা দুটো ধরে উলটো করে ঝুলিয়ে ধরো তো !"

সৈন্যটি সঙ্গে-সঙ্গে ছত্তীর আদেশ পালন করল।

ছেলেটির মুখ নীচে, পা দুটো ওপরে। সে ছটফট করছে, তবু চিৎকার করে উঠল না একবারও।

ছত্তী একটুক্ষণ সে-দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সত্যিই দেখছি, ছেলেটি বোবা ! এইটুকু ছেলের এতখানি সহ্য শক্তি থাকতে পারে না। ওকে ছেড়ে দাও !"

একে-একে সব বালককেই পরীক্ষা করে দেখলেন ছত্তী। কারও সঙ্গেই সকালের সেই ছেলেটির মিল পাওয়া গেল না।

একসময় ক্লান্ত হয়ে ছত্তী উঠে দাঁড়ালেন। তরপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, "ভামহ, গোটা গ্রামটাতেই আগুন লাগিয়ে দাও। দেখো, যেন কেউ পালাতে না পারে। সেই ছেলেটাকে এরা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, সেজন্য এদের সবাইকেই শাস্তি পেতে হবে। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৯ ডলার অথবা ২১ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

ম্যামথরা কেন লোপ পেল

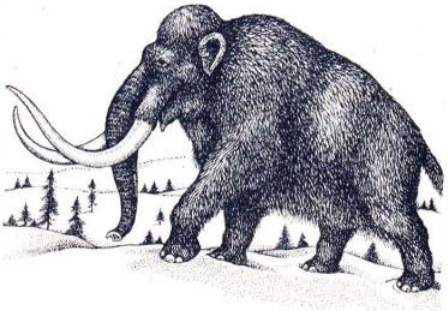

ম্যামথদের অবলুপ্তি নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানীরা অনেক কারণও দেখিয়েছেন এতদিন ধরে। কিন্তু ইদানীংকালে একটি আশ্চর্য তথ্য তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন, যাকে অংশত দায়ী করা চলে এত বড় প্রাণীটির বিলুপ্তির জন্য। বিরাট কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সে-ধরনের কিছু নয়, সামান্য নুনের অভাবে ম্যামথরা পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। একটি দুটো নয়, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ২০০টি জায়গায় ম্যামথ ফসিল খুঁজে পেয়েছেন একটি নুনের খনি অঞ্চলের চারপাশে। আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে, উষ্ণ যুগে, যখন উত্তর আমেরিকায় হিমবাহগুলি ধীরে ধীরে গলে পিছু হঠতে লাগল, পড়ে রইল শুধু আবর্জনা, মাটি আর কাদার স্তূপ, তখন তাতেই বুজে গেল অনেক নুনের খনি। আজকের আফ্রিকার হাতিরা যেমন মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়ায় নুনের সন্ধানে, কোনও খনির খোঁজ পেলে দাঁত দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে নুন বের করে, সেভাবে তাদের পূর্বপুরুষরাও খুঁজে ফিরত নুন। আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানীদের এই 'তত্ত্ব' কিন্তু বহুদিন ধরে প্রবাদ হয়ে টিকে আছে সাইবেরিয়ার ইয়াকুত উপজাতির মধ্যে। তারা বিশ্বাস করে ছুঁচোর মতো মাটির মধ্যে গর্ত করে বেড়াত ম্যামথরা। কিন্তু ধীরে-ধীরে ঘন আবর্জনা আর কাদার স্রোতের আড়ালে ঢেকে গেল নুনের গর্তগুলো। বিশাল এই প্রাণীগুলির পক্ষে বেঁচে থাকাও তখন কঠিন হয়ে পড়ল। আর এইসঙ্গেই এদের অবলুপ্তি পুরোপুরিভাবে ঘটিয়ে দিল নির্মম পশুশিকারিরা।

পিরামিড-রহস্য

বহুদিন ধরে বহু মানুষের ঔৎসুক্য আর প্রশ্ন জমা হয়ে আছে প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য মিশরের পিরামিডগুলিকে ঘিরে। কী করে অতদিন আগে মিশরীয়রা উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া প্রায় কুড়ি টন ওজনের এক একটি পাথরের চাঁই মাটির থেকে তিরিশ তলা অবধি উঁচুতে টেনে তুলতেন। কী করেই বা সমানভাবে সাজিয়ে রাখতেন একটার ওপর আর-একটা পাথর? এতকাল ধরে এভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, ক্রীতদাসরা বহুদূরের পাহাড়ের গা থেকে পাথর কেটে টেনে

নিয়ে আসত উত্তপ্ত মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে। কিন্তু অন্যরকম কথা বলছেন ফ্রান্সের জিওপলিমার ইনস্টিটিউটের রসায়ন-বিজ্ঞানী এবং ডিরেক্টর যোসেফ ডেভিডোভিট্স। তাঁর মতে, এই পাথরগুলি পাহাড়ের গা থেকে কাটা, বালির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে আনা বা তারপর টেনে তোলা, এর কোনওটাই হয়নি। এইসব চাঁই আসলে লাইমস্টোন কংক্রিকেটের, সিমেন্টের মতো ছাঁচে ফেলে তৈরি।

ডেভিডোভিট্স্ বলেন, বছরের পর বছর ধরে এইসব চাঁই স্বাভাবিক পাথর হিসেবে ভুল করা হয়েছে শুধুমাত্র সেগুলি অতি উচ্চমানের কংক্রিটের তৈরি বলেই।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

সাদা তিমির দেহাবশেষ

উত্তর নিউ ইয়র্কে দশ হাজার বছরের পুরনো একটি সাদা তিমির দেহাবশেষ মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, সেখানে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছিল একটি সমুদ্র, 'চ্যাম্পলেইন সি' দেহাবশেষটি পাওয়ার ফলে এই প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্রটির দক্ষিণ পশ্চিম সীমারেখা নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। সাদা তিমির বর্তমান দেহাবশেষটি ছাড়াও আর-এক স্তন্যপায়ী জীবের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল নিউ ইয়র্কে, যা লুপ্ত সমুদ্রটির প্রমাণ হিসেবে সাক্ষ্য দিতে পারে। ১৯০১ সালে প্ল্যাট্সবার্গে প্রথম খুঁজে পাওয়া হার্বার সিলের

ফসিলটি নিশ্চিন্তভাবে বলে দেয় যে, একসময়ে এখানে সত্যি-সত্যিই একটি সমুদ্র ছিল। সাদা তিমি বা বেলুগা অবশ্য আজও কিছু পাওয়া যায় সেন্ট লরেন্স নদীতে। কিন্তু এদের সংখ্যাও তাড়াতাড়ি কমে আসছে নদী দূষিত হওয়ার ফলে।

ধাঁধা

“এবারের ধাঁধাটা খুবই গোলমেলে, দেওয়া-নেওয়ার ধাঁধা।” ছোট্‌কা প্রথমেই বলল, “বাস্তবে এমন দেওয়া-নেওয়া চলে কি না জানি না। কিন্তু ধাঁধায় চলে, এবং বেশ ভালভাবেই চলে।”
এর পর সেই গোলমেলে ধাঁধাটা শোনাল ছোট্‌কা।
প্রথম ধাঁধা ॥ দুই বন্ধু। অমল ও কমল। অমল কমলকে তত টাকা দিল যত টাকা কমলের আগে থেকেই ছিল। টাকাটা নিয়ে কমল জিজ্ঞেস করল, অমলের কত টাকা পড়ে আছে। অমল যা বলল তাই শুনে কমল সেই পরিমাণ টাকা ফিরিয়ে দিল অমলকে।
অমল তক্ষুনি কমলের কাছে জানতে চাইল কত টাকা রয়েছে কমলের। কমল বলল। সঙ্গে-সঙ্গে অমল সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে দিল কমলকে। এই শেষ দানের পর অমলের পকেট একদম ফাঁকা হয়ে গেল।

কমলের পকেটে তখন মোট ৮০ টাকা।
শুরুতে কার পকেটে কত টাকা ছিল?
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ অর্ধেক হল সংখ্যাটির তিন ভাগের এক ভাগ। সংখ্যাটি কত?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

ভনবানীভব

গত সংখ্যার উত্তর ॥ (১)
প্রথমবার একজন সন্ন্যাসী ও একজন রাক্ষস ওপারে যাবে। রাক্ষস থেকে যাবে। সন্ন্যাসী নৌকো নিয়ে এপারে ফিরবে।
দ্বিতীয়বার দু'জন রাক্ষস ওপারে যাবে। একজন ওপারে থাকবে। একজন নৌকো নিয়ে ফিরবে এপারে।
তৃতীয়বার দু'জন সন্ন্যাসী ওপারে যাবে। একজন সন্ন্যাসী ও একজন রাক্ষস ওপার থেকে এপারে ফিরবে।
চতুর্থবার দু'জন সন্ন্যাসী ওপারে যাবে। একজন রাক্ষস, যে ওপারে ছিল, ফিরবে নৌকো নিয়ে।
পঞ্চমবার দু'জন রাক্ষস ওপারে যাবে। একজন ওপারে থেকে যাবে, অন্যজন নৌকো নিয়ে ফিরবে।
ষষ্ঠবার দু'জন রাক্ষস একসঙ্গে ওপারে যাবে।
(২) নন্দী। (৩) সাতপাঁচ।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

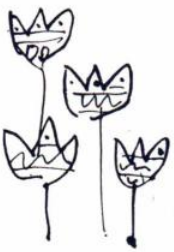

একটি গ্লাস ও একটি পয়সা নিয়ে এই খেলা। গ্লাসটি হবে প্লাস্টিকের কিংবা পেতলের, অথবা কাঁসার বা স্টেনলেস স্টিলের।
কোনওমতেই যেন স্বচ্ছ গ্লাস না হয়।
টেবিলের উপর প্রথমে পয়সাটাকে রাখো। তারপর গ্লাস দিয়ে পয়সাটাকে চাপা দাও।
এবার বন্ধুদের কাউকে বলো—গ্লাসটাকে একদম না ছুঁয়ে তলার পয়সাটাকে বের করে আনতে হবে।
বন্ধু শুনে বলবে অসম্ভব। চেষ্টা করে দেখলেও ব্যাপারটা অসম্ভবই হবে।
এবার তোমার দেখাবার পালা। খুব গম্ভীর মুখ করে বলো, ব্যাপারটা লজিক্যালি অসম্ভব, কিন্তু সম্ভব। এই বলে খুব আলতো ভঙ্গিতে দূর থেকে পয়সাটা তুলে নেবার অভিনয়

করো। হাতটা পকেটে নিয়ে যাও। তারপর বলো, পয়সাটা চলে এসেছে।
বন্ধুরা বিশ্বাস করবে না। এবার তাদের বলো, গ্লাসটা তুলে দ্যাখো।
তারা গ্লাস তুলবে। আর সেই সুযোগে সঙ্গে-সঙ্গে তুমি এবার সত্যি-সত্যি পয়সাটা হাতে তুলে নাও। তারা হইহই করে উঠবে। তাদের থামিয়ে বলো—গ্লাস আমি হাত দিয়ে ছুঁইনি। কিন্তু পয়সাটা আমার হাতে এসে গেছে। সুতরাং ব্যাপারটা অসম্ভব নয়।
বন্ধুরা আচমকা কেমন অপ্রস্তুত বোধ করে দ্যাখো।

মজারু

কত কথা

নতুন, নবীন, নলিন—এই তিনটি শব্দই দু'মুখো, অর্থাৎ ওলটালেও একই থাকে। সেটা অবশ্য সমস্যা নয়; কথা হল, এই শব্দ-তিনটির মধ্যে বেমানান কোন্‌টি?

২। নীচে চারটি শব্দ দেওয়া থাকল। তিন অক্ষরের এই শব্দগুলোর আগে একই অব্যয়-শব্দ বসিয়ে পাঁচ অক্ষরের চারটি শব্দ বানাতে হবে।
—জীবিকা
—সাগর
—নয়ন
—নগর

৩। বলো তো কোন কোন পোত আকাশে ওড়ে?

উত্তর : ১। 'নলিন' শব্দটি বেমানান, কারণ এটি বিশেষ্য। এর অর্থ পদ্মফুল। ২। উপজীবিকা, উপসাগর, উপনয়ন, উপনগর।
৩। কপোত (পায়রা) ও খপোত (উড়োজাহাজ) আকাশে ওড়ে।

কথক

ধাঁধানো ছবি

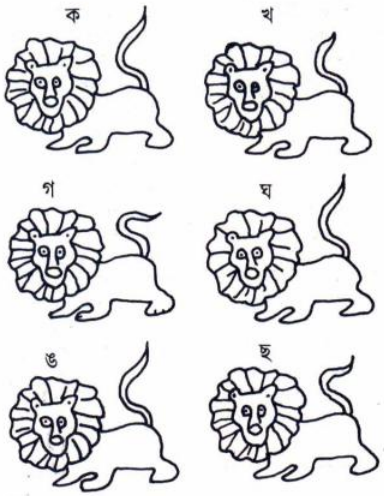

বনের রাজা অর্থাৎ পশুদের রাজা হল সিংহ। সেই পশুরাজ এবার উঠে এসেছে তোমার ছবির পাতায়। মোট ছ'টি সিংহের মধ্যে দুটি সিংহ হুবহু একরকম দেখতে। এখন বলো তো কোন দুটি সিংহ একরকম।

উত্তর : ক এবং ঙ নং।

চিত্রক

হাসিখুশি

টুকাই প্রথম দিন ইস্কুলে ভর্তি হবার পর বাড়িতে ফিরলে তার মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইস্কুলে তুমি কী শিখলে টুকাই ?"

টুকাই-এর উত্তর, "ওরা একদিনে তেমন কিছুই শেখালেন না মা, আমাকে আবার যেতে হবে।"

রাজু দৌড়ে এসে তার বাবাকে বলল, "বাবা, বাবা, খাবার ঘরে একটা কুচকুচে কালো বেড়াল বসে আছে।"

বাবা : "ভয় পেও না রাজু, কুচকুচে কালো বেড়াল দেখলে দিনটা খুব ভাল যায়।"

রাজু : "বাবা, বেড়ালটার দিনটা খুব ভালই গেছে, কারণ ও তোমার রাত্তিরের খাবারটা পুরোটাই খেয়ে ফেলেছে।"

বুবুন নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছিল, বুবুনের পিসি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কিসের ছবি বুবুন ?"

বুবুন : "আমি ভগবানের ছবি আঁকছি পিসি !"

পিসি : "ভগবানের সত্যিকারের চেহারা যে কী, তা কেউ জানে না !"

বুবুন : "আমার আঁকাটা শেষ হলেই সবাই তা জানতে পারবে।"

মজার খবর

অস্ট্রেলিয়ার জন ভিনসেন্ট গত বছর কাগজের প্লেন ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় পৃথিবীতে প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর তৈরি প্লেন ১০২ মিটার পর্যন্ত আকাশে উড়ে ছিল।

রুমানিয়ার এক শিক্ষক পিটার দোব্রতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্যাকটাস সংগ্রহকারীদের মধ্যে একজন। তাঁর কাছে চোদ্দ হাজারেরও বেশি বিভিন্ন প্রজাতির ক্যাকটাস আছে। কোনও ক্যাকটাস দোতলা বাড়ির সমান উঁচু, আবার কোনওটা আঙুলের নখের থেকেও ছোট।

রেন কারপেনটার নামে এক ব্যক্তি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল বা শব্দছক তৈরি করেছিলেন। ১২৫,০০০ শব্দের এই শব্দছক ২৭০ বর্গমিটার জুড়ে।

হরকরা

আঁকিবুকি

মিলিয়ে নাও

এবারে দ্যাখো বৃত্ত এবং ত্রিভুজ দিয়ে আঁকার পাতায় ফুটে উঠেছে কুকুরের ছবি। তোমরাও কি ঠিক এই ছবিটিই কল্পনা করেছিলে ? মিলিয়ে নাও।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিনটিন-অভিধান

কী বলা যাবে এই বইটাকে ? দারুণ একটা ক্রিসমাস-উপহার ? ভাষা-ল্যাবরেটরি ? শব্দের দেশে টিনটিনের নতুন অ্যাডভেঞ্চার ? যাই বলা হোক, বইটা যে ছোট-বড় সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বইটি বের করেছেন লন্ডনের হেরাপ-প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৮৯-এর ডিসেম্বরে। নাম 'টিনটিন ইলাসট্রেটেড ডিকশনারি', দাম ১২·৯৫ পাউন্ড।

হ্যাঁ, এটা একটা অভিধান। আরও ভাল করে বললে, এটা ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চ এই দু' ভাষার অভিধান। তবে, বিশেষভাবে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেই এটা ছাপা হয়েছে। পুরো অভিধানটাই লেখা টিনটিনের কমিকস্ বইগুলোকে ভিত্তি করে। অথচ, পাওয়া যাবে সব-কিছুই। নতুন পড়ুয়ারা প্রথম কয়েক বছর যেসব ইংরেজি বা ফরাসি শব্দের ব্যবহার শেখে, মোটামুটি সব কটিই এই অভিধানে রয়েছে। আছে প্রতিটি শব্দের অর্থ, প্রয়োগ-নির্দেশ, ব্যাকরণের খুঁটিনাটি, কথাবার্তায় কতটা প্রচলিত—সমস্তই। তারপর টিনটিনের এক-একটা গল্প ধরে তার রংবেরঙের পাখনা মেলা। তা-ও আবার দু' দিক থেকে। প্রথমে ইংরেজি ছবিতে গল্প, পাশে তার ফরাসি অনুবাদ, প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী, আবার ফরাসি ছবিতে গল্প, তার ইংরেজি অনুবাদ, টীকা-টিপ্পনী। ক্যাপ্টেন হ্যাডকের পাগলাটে মন্তব্য, কুটুসের দুষ্টুমিভরা ভাষা, প্রোফেসর ক্যালকুলাসের উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা, আর সঙ্গে তো আছেই টিনটিনের বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তার ফুলঝুরি—দারুণ-দারুণ অনুবাদও তার। এই অভিধান নিয়ে ও-দেশে নাকি কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে !

ওখানকার ভাষাতাত্ত্বিকরা বলছেন, এরকম ব্যবহারিক পদ্ধতিতে খুব তাড়াতাড়ি অন্য ভাষা আয়ত্তে আনতে পারে শিশুরা। যাই হোক, বাংলায় এরকম জমজমাট অভিধান বেরোলে কিন্তু বেশ হয় !

বিদেশী গল্পের অনুবাদ

রহস্য রোমাঞ্চ গল্প
এডগার অ্যালান পো
ভাষান্তর : হীরেন চট্টোপাধ্যায়
সাহা বুক স্টল
কলকাতা-৭৩
১২ টাকা

রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের লেখক হিসেবে এডগার অ্যালান পো'র খ্যাতি জগৎজোড়া। তাঁর কয়েকটি গল্প বেছে নিয়ে হীরেন চট্টোপাধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মোট পাঁচটি গল্প বইটিতে রয়েছে। কোনওটি আগাগোড়া জমজমাট রহস্যের, আবার কোনওটি-বা রোমাঞ্চকর। গল্পগুলির বিষয় চরিত্র স্থান চিন্তাধারা সবই বিদেশী। ঠিক যেরকমটি আমাদের দেশের রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পে মেলে না। সেইজন্যই পড়তে বেশি ভাল লাগে। সোনালি ছারপোকা নামের দীর্ঘ গল্পে রহস্যের জালে আটকা পড়ে তো হাঁসফাঁস করতে হয়। প্রতি লাইনে-লাইনে চমক। বুদ্ধির খেলা। দমবন্ধ করা উত্তেজনা। যথেষ্ট যত্ন এবং মনোযোগ দিয়ে হীরেন চট্টোপাধ্যায় গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন। কিন্তু অনুবাদ আরও

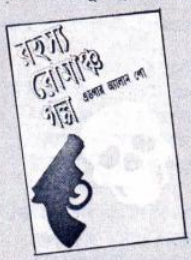

সরল এবং স্বচ্ছন্দ হলে ভাল হত। কারণ মাঝে-মাঝেই অনুবাদের জটিলতায় মূল গল্পের খেই হারিয়ে যায়। তবু সব মিলিয়ে এ একেবারে অন্য অনুভূতির রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প, নতুন স্বাদের।

অঞ্জন সিকদার

ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে

শতবর্ষ বা দ্বি-শতবর্ষ উদ্‌যাপন হতে দেখা যায় মাঝে-মাঝে। এই তো এখন, চারদিকে কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি। কিন্তু, পাঁচশো বছর আগেকার কোনও বই যদি হাতে আসে ! সে বই আবার যে-সে লোকের লেখা নয়, ১৪৯২-'৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাসের প্রথম অভিযানের ডায়েরি। ভ্রমণ অভিযানের এত রোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে, পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেয়। চারদিকে জল আর জল, ডাঙা দেখতে না পেয়ে সকলেই হতাশ, কলম্বাস মিথ্যে স্তোক দিয়ে ভোলাচ্ছেন তাঁর সহযোগীদের, ক্যাপ্টেনরা বিদ্রোহ করছে, শেষে স্পেনে পৌঁছে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা, কে বলবে গল্পকথা নয় ! বইয়ের নামটাও বেশ বড়—দি ডাইরিও অব ক্রিস্টোফার কলম্বাসেস ফার্স্ট ভয়েজ টু আমেরিকা—১৪৯২-১৪৯৩ খ্রিঃ। অনুবাদ করেছেন অলিভার ডান আর জেমস কেলি। জুনিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ওক্লা থেকে প্রকাশিত ৫০৪ পৃষ্ঠার এই বইয়ের দাম ৫৭·৫০ ডলার।

১৯৯২ সালে কলম্বাসকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে যে বিরাট প্রদর্শনীটি হবে তাতে মূল বইটি মানে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ১৪৯২-১৪৯৩ সালের অভিযানের লগ-বুকটি দেখতে পাওয়া যাবে।

অভীক মজুমদার

মুখে ফুটে ওঠে চরিত্র,
দেখলেই বোঝা যায়

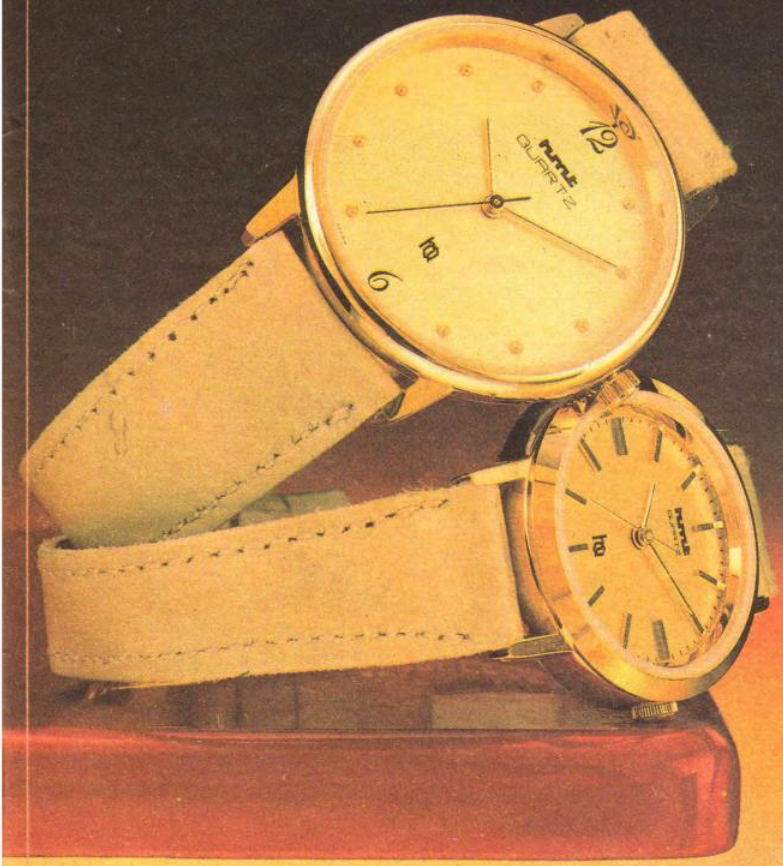

এদের পেছনে রয়েছে এইচ্ এম টির অভিজাত টেক্‌নলজি এবং বিক্রীর পর সেরা। সবচেয়ে সেরা, অন্যদের থেকে আলাদা, চরিত্র বলে।

hmt
QUARTZ

everest/589/473 BEN

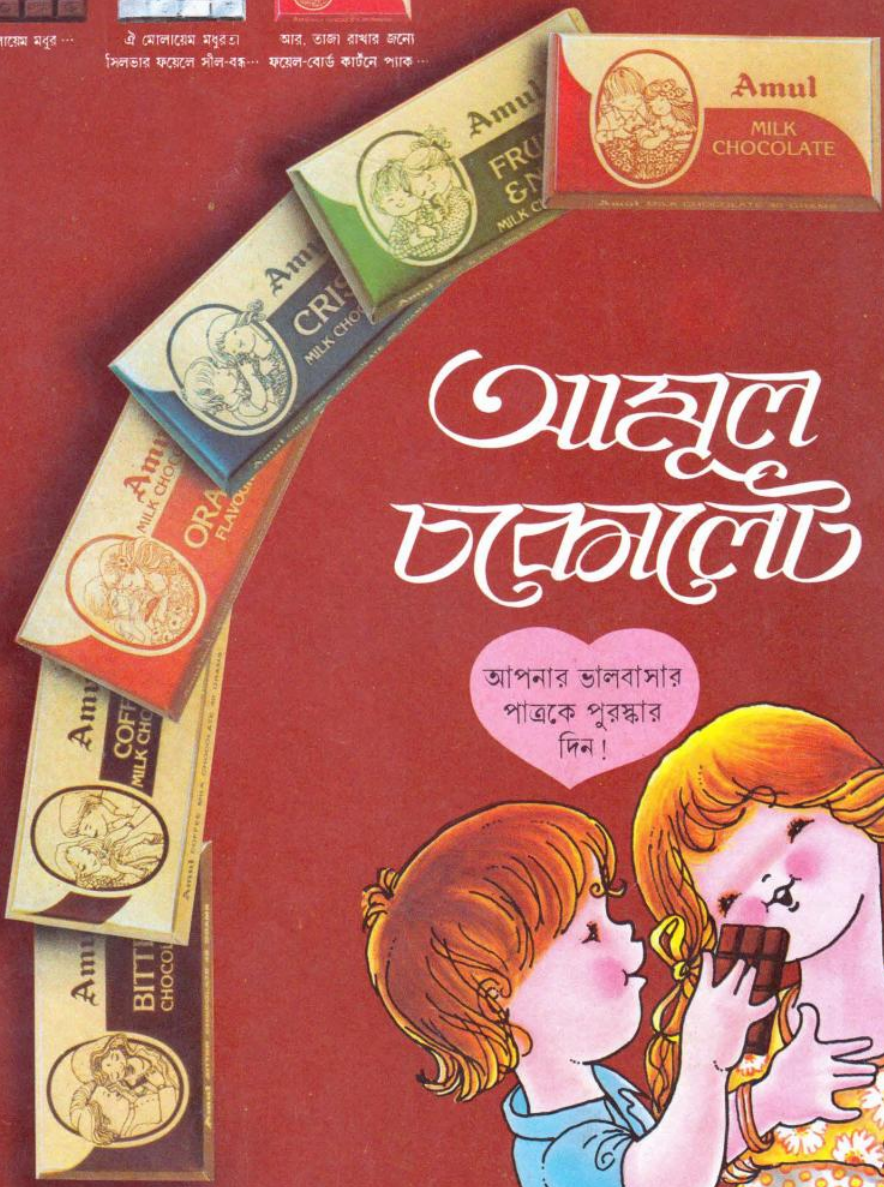

ANANDAMELA 24 REGD NO
WB/CC 264 MH BY SOUTH